মুনলাইট সোনাটা

অমর মিত্র



মুনলাইট সোনাটা
অমর মিত্র


মুনলাইট
সোনাটা
অমর মিত্র
মুনলাইট সোনাটা
অমর মিত্র

মু ন লা ই ট সো না টা

মুনলাইট সোনাটা

অমর মিত্র

অভিযান পাবলিশার্স

Moonlight Sonata
by Amar Mitra

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৩

অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে গোপা ঘোষ কর্তৃক বনমালিপুর বারাসাত কলকাতা-১২৪
(০৩৩-২২৫৭ ৩১৮৭/+৯১৮০১৭০৯০৬৫৫) থেকে প্রকাশিত ও
প্রিয়া অফসেট, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত।
E-mail : abhijan_publishers@rediffmail.com

গ্রাফিক্স সহায়তা : পার্থপ্রতিম দাস
অক্ষর বিন্যাস : সুভাষ ঘোষ, রূপালি কম্পিউটার
প্রুফ সংশোধন : রুম্পা দাস
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেকট্রনিক্স
বই বাঁধাই : রাজনারায়ণ রায়

অভিযান পাবলিশার্সের বিক্রয়কেন্দ্র
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
১০৫/১৩ দমদম রোড, শীল কলোনী, কলকাতা-৭৪

ISBN: 978-93-80197-10-4

সস্নেহে উৎসর্গ

দোলনচাঁপা চক্রবর্তী ও

শমীক ঘোষ

আমার দুই নবীন বন্ধুকে

এই লেখকের কয়েকটি বই

ধ্রুবপুত্র (সাহিত্য অকাদেমি ২০০৬)

অশ্বচরিত (বঙ্কিম পুরস্কার ২০০১)

ধনপতির চর

শূন্যের ঘর শূন্যের বাড়ি

ডানা নেই উড়ে যায়

প্রান্তরের অন্ধকার

নীল যমুনার জল

হে নবীন সন্ন্যাসী

ভুবন ডাঙা

শাদা মেঘ কালো মেঘ

সমাবেশ

অর্ধেক রাত্রি

শ্রেষ্ঠ গল্প

সেরা পঞ্চাশটি গল্প

প্রিয় পঞ্চাশটি গল্প ইত্যাদি

সূচিপত্র

মুনলাইট সোনাটা

এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ

মুনলাইট সোনাটা

মিস শ্রেয়া চৌধুরীকে পথ চিনিয়ে চিনিয়ে আসছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদার, ইয়েস ম্যাডাম, এই দিকে, মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাডাম, ওয়েলকাম টু আওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং।

মজুমদারের কথার তালে তালে পা ফেলছে জেলা শাসকের ভাগ্নী, বছর সাতাশের অহঙ্কারী যুবতি কন্যা। প্রকৃতির নিয়মে তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় সে অতিবাহিত করছিল তখন। ঈশ্বর তাকে তখন দু-হাত ভরে দিয়েছেন। সেই বয়সটা ছিল প্রকৃতির কাছ থেকে নেওয়ার। পেয়েছিলও সে, যেমন রূপ, তেমন মেধা। যৌবনে সে ঐশ্বর্যশালিনী। হাঁটা চলায় কী দর্প! ঘাড় ফিরিয়েও তাকায় না, পথের দু-পাশে কে আছে কে নেই, তা দেখতে। মনে হয় মাটির উপরে পা পড়ে না তার। বাতাসে ভাসে ফুলের গন্ধের মতো। গোপনে, পরম এক উদাসীনতায় দেখে নেয় কে বা কারা তার দিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আগুন আগুন! শিগগির সেই মেয়ে সিভিল সার্ভিসে যাবে, সে কেন মাথা নীচু করে হাঁটবে? আমার মনে আছে তার রূপ। বসন্ত দিনে রম রম করছিল শ্বাস প্রশ্বাস, নাকের পাটা ফুলছিল। আমাদের অচিনপুরের নিরর্থক বয়ে যাওয়া দিনে শ্রেয়া চৌধুরী এনেছিল উষ্ণ রঙিন বাতাস। আলোড়ন তুলেছিল বিবাহিত, অবিবাহিত, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ হয়ে আসা পুরোনো কেরানি থেকে সকলের ভিতর। ডি-গ্রুপ কর্মচারী থেকে সাব-ডেপুটি, ডেপুটি পর্যন্ত। বাংলোয় ফাইফরমাস খাটা দৈনিক বেতনের লোকটির ভিতরে পর্যন্ত।

আমাদের সেই অচিনপুরের কথা বলি। সেই যে সেই জাহ্নবী নদীর তীরের জেলা শহর। আমি আর সুনন্দা, জেলা শাসক লোকনাথ মল্লিক সায়েব, অতিরিক্ত জেলা শাসক গগন শ্রীবাস্তব সায়েব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদার, জেলা শাসকের ভাগ্নী মেধাবী সুন্দরী শ্রেয়া চৌধুরী, আমার বন্ধু, সাংবাদিক সুবিমল সেন — আমরা সবাই নানা দিক থেকে পৌঁছে গিয়েছিলাম সেই জেলা শহরে। নবীন বয়স, কখনও ভাবিনি বুড়ো হয়ে, ক্ষমতাহীন হয়ে বেঁচে থাকব সেই এম. পি. পার্থ সান্যালের মতো। যাঁকে আমরা সবাই, এমন কি জেলা শাসকও মান্য করতেন অসম্ভব। মান্যতা মানে তাঁর প্রতি আনুগত্য। তাঁর ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য। ক্ষমতাকে ভয়। কখনও কেউ কি ভাবতে পেরেছিল, ওই ছোটো-বড়ো পদে কত ক্ষমতা, আমার সব ক্ষমতা একদিন চঞ্চলা কমলার মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। কী সুন্দর বলতেন সেই জেলা শাসক মল্লিক সায়েব, পাওয়ার লাইজ ইন গভর্নমেন্ট অর্ডার, সার্কুলার, মেমোজ, কিপ দোজ পেপারস উইথ ইউ, এনজয় ইয়োর পাওয়ার, কাগজ কথা বলবে। আইন কথা বলবে। আইন তোমার ক্ষমতা, আইন তোমাকে রক্ষা করবে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের জন্য আইন, মানুষের স্বার্থে তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, দরকারে আইনের বাইরে গিয়ে ব্যতিক্রমী কিছুও করা যায় মানুষের স্বার্থে। আই ডু নট থিংক সো। আইন আইনের পথে চলবে, আইনের পথেই চলতে হবে মানুষকে। আইন প্রণয়ন করা হয়েছেই তো মনুষ্য সমাজকে শাসনের ভিতর নিয়ে আসার জন্য। শাসক কী দিয়ে শাসন করবে, আইন দিয়ে। সব ক্ষমতা আইনেই। জেলা শাসক বলতেন, দরকারে আইনের মোড়কে আইন ভাঙতে হয়, কখন তা করতে হয় তা আপনা আপনি বুঝে যায় একজন

প্রশাসক। কখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার উপরেই নির্ভর করে তাঁর সফলতা, ব্যর্থতা। প্রশাসককে রাজনৈতিক নেতার কথা মতো চলতে হয়, কিন্তু তিনি যদি পারেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিজের মতো করে প্রভাবিত করতে, তিনিই দক্ষ প্রশাসক। আসলে দেশটা তো প্রশাসকই চালান, তা আরম্ভ হয় ব্লক স্তর থেকে, ব্লক, মহকুমা, জেলা, ডিভিশন হয়ে গোটা রাজ্য। আমাদের কী সুন্দর বোঝাতেন আমাদের জেলা শাসক লোকনাথ মল্লিক।

ক্ষমতাবান জেলা শাসক। তাঁর কথায় গোটা কালেক্টরেট ওঠে বসে। জেলার দন্ডমুন্ডের কর্তা তিনি। আমাদের তখন নতুন চাকরি, তাঁর বেশ কয়েক বছর হয়েছে। তিনি প্রমোশনে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। ওর চেয়ে ভালো চাকরি আর নেই এদেশে। বিশুদ্ধ চাকরি। কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি। হাসতে হাসতে বলতেন বড়ো সায়েব, 'নো নো, জানতেন না উনি, এর চেয়ে বিশুদ্ধ চাকরি আছে আর?'

নেই। তা জানত মজুমদার। জানত বলে সে শ্রেয়া চৌধুরীর দায়িত্ব পেয়ে বর্তে গিয়েছিল। সকাল থেকে জেলা শাসকের ভাগ্নীর ফাই-ফরমাস খাটছে হাসি মুখে। সেই মেয়ে আই.এ.এস. হতে যাচ্ছে। ইন্টারভিউ পেয়েছে, মামার কাছে এসেছে সহবৎ শিক্ষা নিতে। চাকরির প্রাথমিক পাঠ নিতে। প্রশাসকের চাকরির অনেক রীতি নীতি আছে। অনেক রকম ভাব আর ভঙ্গী আছে, তা আয়ত্ত করতেই না তার আসা আমাদের সেই অচিনপুরে। আর মজুমদার তো বর্তে গিয়েছিল সেই যুবতির সেবা করতে পেরে। ধন্য হয়ে গিয়েছিল। সে জানত খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করছেন মিস চৌধুরী। প্রভুত্ব অর্জন করবেন মিস শ্রেয়া চৌধুরী। আমাদের ভিতরে আলোচনা হতো, মেয়েটি কেমন ডাকছে ওকে 'মজুমদার মজুমদার' করে। মজুমদারের বয়স চল্লিশ পার, সে সাতাশ। ডাক শুনলেই মজুমদার, ইয়েস ম্যাডাম, ইয়েস ম্যাডাম করে উঠে দাঁড়ায়। আমরা অন্য ডেপুটিরা দেখেছিলাম সেই দৃশ্য। আমাদের সঙ্গে মেধাবী, সুন্দরী, যৌবনমদমত্তা সেই শ্রেয়ার আলাপ করিয়েছিলেন জেলা শাসক এক সন্ধেয়। আমরা বসেছিলাম, মজুমদার কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও শ্রেয়ার চেয়ারের পিছনে, কখনও দূরে। তাকে 'মজুমদার তুমি' বলেন জেলা শাসক, শ্রেয়াও তাই বলল। আর তাতে মজুমদারের মুখ উদ্ভাসিত আলোয় ঝলমল করতে লাগল। শ্রেয়ার মুখের কাছে কান নিয়ে গেল, সে গোপনে তাকে কিছু বলল, তাতে, ইয়েস ম্যাডাম, ইয়েস ম্যাডাম করতে করতে মজুমদার তার চেয়ারে ফিরে গম্ভীর মুখে জেলা শাসকের দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার সহকর্মী শুভময় সেন আমাকে পরে বলেছিল, স্যানিটারি ন্যাপকিনের অর্ডার দিয়েছিল মেয়েটা, নাজিরখানা পে করবে, বড়ো সায়েবের ভাগ্নী বলে কথা, মজুমদার ডিয়েমের ঝাড়ুদার, বউ ভাগ্নীর শায়া ব্লাউজও কেচে দেয়, ওর জন্য এ জেলার ডেপুটিদের কেউ সম্মান করে না। চাকরিটাকে ছোটো করে দিয়েছে মজুমদার।

মজুমদার কথায় কথায় বলছিল, সবাই চায় ক্ষমতার সেবা করতে, কিন্তু পারে কে, সুযোগ পায় কে, ডিয়েমের ঝাড়ুদার সবাই, আমি লোকের কথায় ইয়ে করি, বসের ভালোবাসা ক'জন পায়, ওই চাকরি করতে পারবি সারা জীবনে, ওই ক্ষমতা?

সত্যই তো, প্রভুত্ব, দম্ভ, দর্প, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার প্রতিটি মুখ এই চাকরিতে। চাকরি নয়, এ হলো সত্যকারের প্রভুত্ব অর্জন। কিন্তু এও সত্য, পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোথাও নেই। প্রভুরও প্রভু থাকে। তাঁরও প্রভু থাকে। শেষ পর্যন্ত তা কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তা জানা নেই। এখন এই সব মনে হয়। মনে হয় প্রভুত্ব আর ক্ষমতার এক রূপ আছে, তাকে সম্ভ্রম করতে হয়, ভয় পেতে হয়। তা না হলে সে হীনবল হয়ে পড়ে। আর এই কারণে ক্ষমতাবানরা ক্ষমতা রক্ষায় মনোনিবেশ করেন সবচেয়ে বেশি। বিশেষত রাজনৈতিক প্রভুরা। তাঁরা অনাদিকালের কথা ভাবেন। তাঁরা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্য ক্ষমতার অলিন্দ রেখে যান। ক্ষমতাবান আমলারাও স্বপ্ন দ্যাখেন, তাঁর সন্তান তাঁরই রেখে যাওয়া চেয়ারে গিয়ে বসবে। মানুষ যা করে সারাজীবন ধরে তা শুধু তার নিজের জন্য নয়, বৈধ-অবৈধ উপায়ে যে সম্পদ তৈরি করে, তা তার উত্তরপুরুষের জন্য। সাত পুরুষের ব্যবস্থা করে যেতে পারলে উপরে গিয়ে তার আত্মা শান্তি পায়। একথা রাজনীতিক, আমলা, কেরানি — সকলের ক্ষেত্রে একই ভাবে সত্য।

জেলা শাসক যে ঘরে দরবার বসাতেন, তা ছিল মস্ত। তার ভিতরে চার-পাঁচটা ঘর ঢুকে যেত। জেলা শাসকের চেয়ারের পিছনের দেওয়ালে সেগুন কাঠের প্যানেলে পর পর জেলা শাসকদের নাম আর কার্যকালের বিবরণ। প্রথম তিনজন ছিলেন খাঁটি সায়েব। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় জেলা শাসক। আর আছে সেই প্যানেলের উপরে দুটি তলোয়ার আড়াআড়ি করে রাখা, তার উপরে যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ। বাংলো কী নিস্তব্ধ! বাংলোয় আসতে গেলে পুরোনো জেলখানার মস্ত প্রাচীরের গা ঘেঁষে আসতে হয়। বাংলোর মস্ত গেটে বন্দুকধারী, ঢুকে অনেকটা খালি জমি, তারপর আভিজাত্যের প্রতীক রাজপুরুষের সেই গৃহ, বসতবাটি। ঘাড় তুললে বড়ো ব্যালকনি, তার মাথায় কোনো ছাদ নেই। সেখানে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় জেলা শাসক সপরিবারে বিশ্রাম নেন। শীতের সকালে রোদ পোয়ান। বিঘে চার জমি নিয়ে গড়ে ওঠা বাংলোর প্রাচীরের গায়ে বহু প্রাচীন মেহগনি, শিরীষ। সব মিলিয়ে ওই নিস্তব্ধতায় এক কঠোরতাও টের পাওয়া যায়। ক্ষমতা কখনও কঠোরতা ব্যতীত হয় না। জেলা শাসকের বাংলোই ছিল ক্ষমতার সম্পূর্ণ এক চেহারা। রাজপুরুষের আবাস, তার ভিতরেই সমস্ত ক্ষমতা নিহিত।

সমস্তদিনের শেষে আমরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা তাঁর বাংলোর মস্ত চেম্বারে তিন সারি চেয়ারে সারি দিয়ে বসতাম। পদ মর্যাদা আর সিনিয়রিটি অনুযায়ী সামনের সারি, পরের সারি, শেষ সারি। এই গদি আঁটা সারি চেয়ারের দশ বারো ফুট পিছনে সোফা সেট, টি টেবল। সেই খুব দামী সোফা সেটের একটিতে এসে বসেন এম.পি। কখনও কোনো মন্ত্রী জেলা সফরে এলে তিনি বা তাঁর সঙ্গী কেউ। বাঁ-দিকের সিঙ্গল সোফায় ওই

মাপের ভি আই পি, লম্বা তিনজনের উপযোগী সোফায় তাঁর সঙ্গী, ডান দিকের সোফায় জেলা শাসক। আমি অনেকদিন দেখেছি জেলা শাসক বসেননি, দাঁড়িয়ে নোট নিচ্ছেন। মন্ত্রী, এম.পি. ব্যতীত ডিভিশনাল কমিশনার, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জাতীয় উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ এলে বসতেন, মিটিং করতেন। এই বাংলো ব্রিটিশদের নির্মাণ। সেই সব নির্মাণে ছিল রাজকীয় ঔদ্ধত্য। মস্ত উঁচু সিলিং, মস্ত বড়ো বড়ো ঘর। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি ছিল কাঠের। খুব চওড়া, লাল কার্পেটে মোড়া। দেওয়ালে নানা নিসর্গ-চিত্র। জেলার বড়ো ম্যাপ। মন্ত্রীর সঙ্গে জেলা শাসকের ফোটো। কোনো অনুষ্ঠান উদ্বোধনের ছবি। রবীন্দ্রনাথের ছবিও একটি রাখা হয়েছিল, কেন তা বুঝতে পারিনি। বাংলোয় জেলা শাসকের দরবারে, আমাদের সন্ধ্যার মিটিঙে কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় হয়নি। কখনও উঠলে সেই প্রসঙ্গ সরেও গেছে অচিরে। স্যার বলতেন, দুর্বৃত্ত কর্মচারীকে কীভাবে কোথায় শায়েস্তা করেছেন সেই কথা। কী ভাবে তাঁর অনুগত কর্মচারীকে বাঁচিয়েছেন নানা অপরাধের শাস্তি থেকে, সেই কথা। এক স্টেট সার্ভিসের অফিসার অফিসের ডি-গ্রুপ তরুণীকে মোলেস্ট করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল, তাকে কীভাবে তিনি বাঁচিয়েছিলেন সেই বৃত্তান্ত। তরুণীটিকে তিনি বদলি করে দিতে পেরেছিলেন ক্ষমতার জোরে। অথচ অপরাধ ছিল সত্য। ধর্ষিতা হয়েছিল তরুণীটি। সেই ঘটনা জেনেও ছিল সবাই। কেউ কিছু বলতে পারেনি। ডি. এম. যা বলবেন তাই হবে। কমিটি গড়ে দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ অফিসারটি তাঁর খুব অনুগত ছিল। তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। সেই তরুণীটি ছিল চূড়ান্ত সেক্সি, স্যারের গাড়িতে করে ফিরত। সবার আগে অফিসে এসে সবার শেষে যেত। কম বয়সী বিধবা। ফলে যা হওয়ার তা হয়েছিল। ঘি আর আগুন কাছাকাছি এলে এমনই হয়ে থাকে। সেই অভিযুক্ত ডেপুটির কোনো দোষ ছিল না। মতিভ্রমকে মতিভ্রম হিসেবেই দেখা উচিত।

মনে হয়েছিল ক্ষমতার অপব্যবহারই ক্ষমতার প্রকাশ। অপরাধীকে না বাঁচাতে পারলে কিসের ক্ষমতা? চুপ করে ছিলাম। মজুমদার মুগ্ধ দৃষ্টিতে জেলা শাসকের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাঝে মাঝে, বিবশ গলায় উচ্চারণ করছিল, স্যার .... স্যার ....। যেমন আমরা বলতাম উপরওয়ালার ফোন এলে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে।

শোনো তোমরা, শোনো, লাইফটাকে এনজয় করতে হলে, প্রশাসনকে ব্যবহার করতে শিখতে হবে তোমাকে। মনে রেখ, একদিন সব পাওয়ার হবে আমাদের, পোলিটিশিয়ানদের কাছ থেকে একদিন সব পাওয়ার আমরা কেড়ে নেবো। এখন আমরা চুপ করে আছি, ডে'জ উইল কাম সুন, সেদিন আমরা কথা বলব, যে ভাবে দেশ চলছে, চলতে পারে না, এর একটা বিহিত তো হবেই একদিন। ব্যুরোক্রেসিতে কারা আছে, ক্রিম অফ দ্য সোসাইটি, সব চেয়ে শিক্ষিত যুবকরা। তারাই এই সমাজের অভিজাত শ্রেণি। অভিজাতরা শাসন করলে শাসন ভালো হয়, সমাজ উন্নত হয়। আমি মনে করি না তার বাইরে কোথাও কিছু হয়েছে কোনো কালে। তুমি ভেবে দ্যাখো প্রলেতারিয়ান ডিকটেটরশিপ, চিনে নাকি তাই চলছে, আসলে

চলছে অভিজাত কম্যুনিস্টদের শাসন। গরিবের কাছে কোনোদিন ক্ষমতা যায় না। গরিব কখনও ক্ষমতাশালী হয় না।

শুনতে শুনতে তানিয়া সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিছু বলতে চাইলে জেলা শাসক বললেন, শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এইটাই রিয়ালিটি। যে কোনো শাসন দ্যাখো, ক্ষমতায় গেলে গরিব তো বড়োলোক হয়ে ওঠে, ট্রাজেডি এখানেই, গরিবমানুষ শাসন করবে, এটা কখনও সত্য হতে পারে না। গরিবিয়ানা কখনও পাওয়ারের সংস্পর্শে যেতে পারে না।

মজুমদার শুধু ঘাড় নেড়ে তার প্রভুকে সমর্থন জানাত। জেলা শাসকের প্রতিটি কথায় সে অভিভূত হয়ে পড়ত। সহকর্মী শুভময় সেন আমাকে বলত, দ্যাখ দ্যাখ, লেজ নাড়ছে কেমন।

হুঁ। আমি সাড়া দিয়ে চুপ করে যেতাম। ভয় হতো, মজুমদার সব জেনে যাবে। কী করে জেনে যায় মজুমদার, তা আমাদের মাথায় ঢুকত না। মজুমদার বলত, ক্ষমতার সঙ্গে থাকলে বোঝা যায় সব, সেই ক্ষমতা আছে ক্ষমতার।

কেউ কেউ বলত, 'মজুমদার হলো জেলাশাসকের স্পাই। গুপ্তচর। কোথায় কে কী বলছে তা মজুমদারই স্যারের কাছে পৌঁছে দেয়।'

কথাটা অসত্য মনে হত না। মজুমদারকে কখনও কখনও ভয়ই লাগত। অথচ সে প্রোমোটি অফিসার। সিনিয়রিটিতে আমাদের অনেক নীচে। কিন্তু সেবা-ধর্ম(!) তাকে সবার মাথায় নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল ধীরে ধীরে। উপরওয়ালার সেবা করেই যে ক্ষমতার ছিটোফোঁটা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় তা মজুমদার আমাদের প্রতি মুহূর্তে দেখিয়ে দিত। কখনও কখনও আমাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাত। শুভময় সেনই শুধু বলত, সারমেয় ল্যাজ নাড়ে আবার তেড়েও আসে, এ শুধু ল্যাজ নাড়তে শিখেছে।

জেলা শাসকের কথাগুলো কখনও ধ্রুব মনে হতো, কখনও মনে দ্বিধা আর প্রশ্নের জন্ম দিত। আমাদের এই জেলা শাসক মিঃ মল্লিক বলতেন, পাওয়ার অ্যান্ড পাওয়ার, একদিন পিপল বলবে, নো পোলিটিসিয়ান, নো পোলিটিকস। কিন্তু পাওয়ার তো কেউ না কেউ নেবে। কে নেবে? শোনো মজুমদার, পাওয়ার হচ্ছে বিউটিফুল ওম্যান, সি কান'ট লিভ অ্যালোন, সে কারও না কারওর কাছে থাকবেই, হু উইল এনজয় হার? ব্যুরোক্র্যাটস।

মজুমদার ঘাড় নেড়ে বলত, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার।

শুভময় সেন আমার কানে কানে চাপা গলায় বলত, পাওয়ার হল ওর ওই ভলাপচুয়াস ভাগ্নীটা, শ্রীবাস্তবটাকে ও-ই খেয়েছে। টাইগ্রেস। কোনো কোনো রমণী এমন হয়। গিলে খেয়ে নেয় পুরুষকে। দ্যাখ দুজনে কেমন উঠে গেল পর পর।

উঠে গেছে শ্রীবাস্তব আগে, তারপর শ্রেয়া। শ্রেয়া ছিল দেড় মাস। আমাদের সান্ধ্য সভায় তাকে ডেকে নিতেন স্যার মল্লিক। সে শুনবে কথাবার্তা, বুঝবে কীভাবে প্রশাসন চলে। তাকে সবই শেখাবে দেরাদুন ট্রেনিং সেন্টারে, কিন্তু তার আগে তো ইন্টারভিউ।

শুভময় বলত, ফুর্তি করতে এসেছে মেয়েটা, মামার বাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই।

আমাদের ভিতরে এই সব কথা হতো। তার ভিতরে কি আমাদের দীর্ঘশ্বাস থাকত না? এখন মনে হয় থাকত। হ্যাঁ, সেই গগন শ্রীবাস্তবও কম ছিল না। সেও সিভিল সার্ভিসের, অতিরিক্ত জেলা শাসক। তাকে গিলে নেবে কি শ্রেয়া চৌধুরী, দুজনেই যে দুজনকে গিলে ফেলার সামর্থ্য রাখত। সে-ই গগন ছিল ভীষণ পুরুষও। বলত, সে খাঁটি আর্য রক্ত বহন করছে তার ভিতরে। কার কাছে বলেছিল, 'ব্যুরোক্র্যাটস আর পিওর আরিয়া, দে হ্যাভ অ্যাবসলিউট পাওয়ার টু রুল দিজ কানট্রি।'

আর্যরাই পৃথিবী ভোগের অধিকারী। রমণী আর গোধনে তাদেরই অধিকার। গো-ধন এখন কাঞ্চন, ক্ষমতায় তা অধিকার করা সম্ভব। ক্ষমতাবান তার ক্ষমতাতেই অধিকার করে সব।

মল্লিক সায়েবও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথাই তো বলতেন। নব ভারতের আর্য ব্যুরোক্র্যাটরা।

তবে গগন শ্রীবাস্তবের মতো নিজেকেও তিনি আর্য রক্তের বলে দাবী করতেন না। তিনি ছিলেন সাদামাটা চেহারার মানুষ, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, গড় বাঙালির অধিক কিছু নন। মেধাবী ছিলেন, বুদ্ধিমান ছিলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অপরিমেয় ক্ষমতা ছিল তাঁর। স্টেট সার্ভিস থেকে সিভিল সার্ভিসে উন্নীত হয়েছিলেন। এখন মল্লিক সায়েবের কোনো খবর পাই না। শুনেছিলাম অবসরের পর তিনি কোনো একটা বড়ো কোম্পানির অ্যাডভাইসার ছিলেন। একবার ইলেকশনে দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন। আমি সমস্তজীবন আমার মতো ক্ষমতা এনজয় করেছি। যার যতটুকু ক্ষমতা তা ব্যবহার করেই সে জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারে। আমিও তো স্টেট সার্ভিসে ছিলাম। সরকারের কেরানিরও ক্ষমতা থাকে কম নয়। যে কেরানির যত বুদ্ধি সে তত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। যেমন ছিল আমাদের মজুমদার, প্রমোশনে প্রমোশনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জেলার কর্তা আর উপরওয়ালাদের সার্ভিস দিয়ে দিয়ে ক্ষমতা অসীম। মজুমদারই শেষ কথা। মজুমদারকে ধরলে ডি. এম, এ.ডি.এমরা সব কাজেই হঁযা করেন। মজুমদারকে আমরা ঈর্ষা করতাম। আড়ালে বলতাম, ডিয়েমের ঝাড়ুদার। মজুমদার তা জানত, হাসত। বলত, আমি জানি কী করছি, গভর্মেন্ট সার্ভেন্ট মানে উপরওয়ালার সার্ভেন্ট, এটা সকলেই জানে, কিন্তু সার্ভিস দেওয়ার ক্ষমতা সবার নেই, সায়েবের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই নেই।

সেই মজুমদার এখন কোথায় জানা নেই। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, রোগাটে গড়ন, ধূর্ত দুটি চোখ, সাজ-পোশাকে সবসময় ফিটফাট, শীতের সময় দামী স্যুট, গরমে দামী কাপড়ের হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার্স, দামী

শ্যু, তখনই বাটা কোম্পানির অ্যাম্বাস্যাডর পরত মজুমদার। ভোরবেলা থেকে তার কাজ আরম্ভ হতো। কালেক্টরেটের একটি গাড়ি তার সঙ্গে জুড়ে থাকত সব সময়। মজুমদার সেই গাড়িতে চেপে সায়েবদের ঘুম ঠিক হয়েছে কিনা সেই খোঁজ নিতে বাংলোয় হাজির। হাসি মুখ, সায়েবের গিন্নির অনুরোধ মতো বড়ো বড়ো কাঁকড়া নিয়ে এসেছে বাজার থেকে কিনে। কিন্তু দাম নেবে না। তখন সায়েব বলবেন, নাজিরখানা থেকে নিয়ে নিয়ো মজুমদার। বড়ো সায়েব বলেন। ঘাড় কাত করে মজুমদার। এবার সে যাবে মেজ সায়েব গগন শ্রীবাস্তবের বাড়ি।

"গুড মর্নিং স্যার, বলে দিয়েছিলাম সকালের ভিতর যেন আপনার বাংলোয় গরু নিয়ে এসে সামনে দুধ দুইয়ে দিয়ে যায়, বাচ্চার দুধ, ভেজাল হলে ফাটকে ভরে দেব।" বলতে বলতে মজুমদার হাসতে থাকে। মেজ সায়েব অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট গগন শ্রীবাস্তব, বিহারে বাড়ি, আর্যপুত্র। খাঁটি গোরুর দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছেন, ওই সব প্যাকেটের দুধ কেন তাঁর বাচ্চা খাবে? তা দুধের শিশুর দুধের জন্য একটি গোরু কিনে নেবেন বলেছিলেন, মজুমদার তা সংগ্রহ করে দেবে বলেছিল, কিন্তু সায়েবের সুন্দরী স্ত্রী না করেছেন, গরু রাখা যাবে না বাংলোর পিছনে। পরিবেশ নষ্ট হবে। অগত্যা সেই মজুমদারই ভরসা। সায়েবের একটিই সন্তান, তাঁর ইচ্ছা খাঁটি গোরুর দুধ খাওয়াবেন তার পুত্রকে, তা না হলে আর্য-রক্ত তৃপ্ত হয় না। মজুমদার ব্যবস্থা করেছে। ক্ষমতা অর্জনের একটি পথ মজুমদার আমাদের দেখিয়েছিল। আরও শিখিয়েছিল বড়ো সায়েবের ক্ষমতা বড়ো সায়েব কী ভাবে অধঃস্তন অফিসারকে ডেলিগেট করেন। বিলি করেন তাঁর ভার কমানোর জন্য। ক্ষমতা ভোগের নিয়ম হলো একটু একটু সুতো ছাড়া। সুতোর মূল তোমার কাছে রেখে, একটু ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার ক্ষমতা মূলের চেয়েও বেশি হয়ে যাবে।

২

মজুমদার একদিন এসে বলল, 'গতকাল বড়ো ম্যাডাম আমার বউকে একটি পারফিউম পাঠিয়েছে, কী সুগন্ধ তার!' বলতে মজুমদারের চোখমুখ উদ্ভাসিত। শুনে শুভময় সেন বলল,

'ওইটা তুমি গায়ে স্প্রে করো মজুমদার, আজ করেছ নাকি?'

না, ওটা মেয়েদের পারফিউম, আমার হবে না। মজুমদার বলেছে।

তোমারই হবে। শুভময় সেন বলেছিল।

তুমি জান না, আমার গায়ে ওই গন্ধ পেলে স্যার ধরতে পারবেন, ওইটা বড়ো ম্যাডামই গায়ে দেন, আমার বউকে দিয়েছে আমি কেন গায়ে দেব?

আসলে তোমার জন্যই দিয়েছে। শুভময় সেন বলেছে।

কী বলছ তুমি, এটা মেয়েদের।

ম্যাডাম তোমার জন্যই দিয়েছে।

না, না, না। মজুমদার তীব্র আপত্তি জানিয়েছে, তুমি জান না।

শুভময় সেন মাথা নেড়েছে, জানি, যা বলছি তা হতেই হবে।

অনেকটা কথাবার্তার পর মজুমদার টের পেল শুভময়ের ব্যঙ্গ। গম্ভীর হয়ে গেল। কথা বদলে দিলাম আমি। কিন্তু মজুমদার আর বসল না। সে আচমকা উঠে যেতেই শুভময় মন্তব্য করল, শালা, তোকেই দিয়েছে ম্যাডামের ঝি, কাজের মেয়ে-বউকে বাড়ির কর্ত্রী কি দেয় না, এরপর শাড়ি দেবে, ম্যাক্সি দেবে, ফেলে দেওয়া নাইটি দেবে, রাতে বেঁচে যাওয়া বিরিয়ানিও দেবে, তুই খেয়ে ধন্য করবি ওঁদের।

এখন মজুমদার কোথায়? আমার মতো সব ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়ে কি বাড়ির ব্যালকনিতে বসে থাকে দিনভর। নিঃঝুম নগরের পড়ন্ত বেলা চোখে নিয়ে দিন কাটায়? একা একা। দিন পার করে সন্ধ্যা, রাত্রি। জীবনে কত ক্ষমতা ভোগ করেছে সে তা বলতে থাকে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা বুড়োদের তাসের আসরে বসে? বলে নাকি তখন আমি পশ্চিম দিনাজপুরে, পশ্চিম ভেঙে উত্তর আর দক্ষিণ দিনাজপুর হয়নি, আমি নাজারত ডেপুটি কালেক্টর .... আঙুলে ঘিয়ের গন্ধ শোঁকে মজুমদার! ম্যাডাম মল্লিক, ডিয়েমের ওয়াইফ আমাকে কী ভালোই না বাসতেন, আমার স্ত্রীকে পারফিউম, শাড়ি, আমাকে পাঞ্জাবি .... বলে, তখন আমি অচিনপুর, মিস শ্রেয়া চৌধুরী এসেছিলেন বেড়াতে, তিনি এখন পটনায়, ইরিগেশনের ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি, তাঁর সব ভার ছিল আমার উপর ...., আমি তাকে শেখালাম কী করে প্রশাসন চলে, কী ভাবে ল অ্যান্ড অর্ডার মেইনটেইন করতে হয়।

এসব এখন আমার মনে হয়। একা ব্যালকনিতে বসে মজুমদারকেই মনে পড়ে বেশি।

আমার ছেলে আমেরিকায় সেটল করেছে। থাকে ক্যালিফর্নিয়া স্টেটের সান-দিয়েগো শহরে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সেই শহর। আমি ইন্টারনেটে দেখেছি চারশো বছর আগে স্পেনীয়রা প্রথম ওই উপকূলে জাহাজ নোঙর করে। ক্যালিফর্নিয়ার পুব দিকে সান-দিয়েগো। ছেলের সঙ্গে কোনো কোনো রোববার ইন্টারনেটে ফেসবুকে কথা হয়। ভিডিও চ্যাটে ওর ঘর দেখা যায়। ও আর বউমা দুজনে এঘর ওঘর করে, ল্যাপটপ নিয়ে। চোদ্দতলা থেকে নীচের শহর দেখা যায়। যদি আমি সকালের ভিতর থাকি, ওরা আগের দিন রাতে। দীপাবলীর আলোর মালায় সেজেছে সেই শহর। খোলা জানালা দিয়ে ওদের ঘরে প্যাসিফিকের বাতাস ঢোকে, কী সেই হাওয়া। আমাদের ঘরে এসেও ঢোকে যেন। তোলপাড় করে দেয় মন। আমি কি কখনও ভেবেছিলাম এই রকম। মেজমাসির বড়ো ছেলে সুবীরদা যখন চলে গেল লন্ডনে (আমরা বলতাম লন্ডন, ছেলে বলেছে ওটা হবে লানডান), কী রকম ছোটো না লেগেছিল নিজেকে। আমাদের সাতপুরুষের

কেউ বিদেশ যায়নি, যাবেও বলে মনে হয় না। সুবীরদা গিয়েছিল বিলেতের হাসপাতালে চাকরি করতে। ফিরেও ছিল বছর দুই পরে পাকাপাকি ভাবে। নিজের দেশ ছেড়ে মা বাবা ভাই বোনকে ছেড়ে বিদেশে মন বসেনি। বড়ো অফার পেয়ে ওদেশে থাকা সব্যস্ত করেও থাকেনি। সে ফিরে এলে আমার বাবা, সুবীরদার ছোটো মেসো বলেছিলেন, 'ঠিক করেনি সুবীর, বিলেতে থাকলে অনেক বড়ো হতে পারত। ওটা ইংরেজের দেশ, ওদেশে এখনও রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ আছেন। ওদের সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না একসময়, আবার ওদের সুদিন ফিরবে।'

সুবীরদা এসব কথা কানেই নেয়নি, তুচ্ছ করে দিয়েছিল সকলের মতামত। বলেছিল, আমি আমারটা ভালো বুঝি, কী করতে হবে, হবে না তাও জানি, কলেনিয়াল হ্যাং ওভার কাটেনি এদেশের মানুষের, পারলে আবার ওদের ডেকে আনে।

সে আমাদের ছোটোবেলার কথা। কত বয়স হবে তখন বারো তের। মনে হয়েছিল, সুবীরদার খুব অহংকার, বুঝবে পরে, আফশোশ করবে। বাবাই ঠিক কথা বলেছে। এখনো তাই মনে হয়। কিন্তু মন তো খারাপ হয়। কতদূরে ছেলেটা। আমাদেরও বয়স হচ্ছে। এখন ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে দিন কাটাবার সময়। কত আহ্লাদ করা যেত। যে বয়সের যা।

বাবা বলতেন, ওসব বড়ো বড়ো কথা, ও তো নকশালদের মতো কথা বলছে, ইন্ডিয়ানরা কি দেশ শাসন করতে পারে, ওদেরই আবার ডাকতে হবে তা জানে সায়েবরা, ওদের দেশে গুণীর কদর আছে। সুবীর খুব ভুল করল।

সেই সুবীরদা এখন বাঙ্গালুরু ছাড়িয়ে গিয়ে কর্নাটক আর মহারাষ্ট্রের সীমান্তে মহারাষ্ট্রের সেই লাতুর জেলার কিল্লারি গাঁয়ে চিকিৎসা করেন। কোন লাতুর জেলা? ১৮ বছর আগে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল যেখানে, সেই লাতুরের কথা বলছি। সে একটা কথা। আমার বন্ধু সুবিমল খবরের কাগজে আছে। সাংবাদিকতা তার কাজ। সে অযোধ্যায় গিয়েছিল ৯২-এর ডিসেম্বরে। তার রিপোর্ট ছিল অসম্ভব ভালো। সে লাতুর গিয়েছিল ১৯৯৩-এর অক্টোবরে। পুজোর ঠিক আগে আগে। লাতুরের রিপোর্টে সে এক বাঙালি ডাক্তারের কথা লিখেছিল, সুবীর ভদ্র। কর্নাটকের প্রত্যন্ত গাঁয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় চালান, পুরো ইউনিট নিয়ে ভূমিকম্প পীড়িত এলাকায়। আমি ওর লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়ে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম সুবিমলের সঙ্গে। সুবিমল আমার খোঁজ নিয়ে বলেছিল সে আসবে ওই জেলায় তার সাংবাদিকতার কাজেই। আমি তখন কলকাতা থেকে দূরে উত্তরবঙ্গের সেই জেলায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অনেক দপ্তরের ভার আমার উপর। জেলা শাসক মল্লিক সায়েব মধ্যবয়সী সিভিল সার্ভিসের অফিসার, প্রমোশনে আই.এ.এস। সেই মানুষটির অনেক গুণ। নিরামিষাশী। উত্তর-ভারতীয়রা যে বলে, 'মছলিখোর বঙ্গালি' কী করে হিন্দুত্ব রেখেছে তা তিনি সমর্থন করেন। সুবিমল আমার কোয়ার্টারে এসেছিল জেলা কভার করতে এসে। ওর জন্য ভালো

বাংলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। একদিন সন্ধেয় সেই বাংলোয় মদের আসর বসিয়েছিলাম। মজুমদার আমাকে সাহায্য করেছিল ভালো ব্র্যান্ডের হুইসকি উপহার দিয়ে। ও ছুঁয়ে দেখত না, বসে থাকত সামনে। শহরের সব চেয়ে বড়ো ডিলারকে বলে দিত কোন সায়েব কী চাইছেন, কী দিতে হবে, কখন দিতে হবে?

সুবিমল আমার কোয়ার্টারে এসে বলেছিল,মানুষটার জন্য গর্ব হয় বিপুল, মনে হল জীবনের একটা মানে খুঁজে পেয়েছেন ওখানকার 'ডাগদারসাব'। আরে আমাকে বলল, নিজে শুদ্ধ না থাকলে, মন পবিত্র না থাকলে নাড়িজ্ঞান হয় না। নাড়িজ্ঞান না থাকলে চিকিৎসা কী করবে ডাক্তার, এই রকম নাকি তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছামতী উপন্যাসে এক কবিরাজের মুখে শুনেছিলেন। তিনি নিজেকে শুদ্ধ রাখেন, অর্থের কথা ভাবেন না, কী রকম মানুষরে ভাই, ওদিকের মানুষের কাছে ভগবান।

আমি আর সুনন্দা অবাক হয়ে সেই রূপকথা শুনছিলাম। শুনতে শুনতে সুনন্দা বলেছিল, তুমি হাটেবাজারে বলে একটা সিনেমা দেখেছ সুবিমলদা, বনফুলের উপন্যাস, অশোককুমার, বৈজয়ন্তী মালা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।

কে দ্যাখেনি সেই সিনেমা, বনফুল নিজে ডাক্তার ছিলেন, ওই ডাক্তারকে উনি নিশ্চয় দেখেছিলেন। কিন্তু সিনেমার চেয়েও ওই ডাক্তারের জীবন আরো কালারফুল, বিলেত থেকে ফিরে এসেছিলেন গরিব দেশবাসীর চিকিৎসার করবেন বলে, মূলত শিশুদের দ্যাখেন, বড়োদেরও দেখতে হয়।

সুবিমল অনেক কথা বলেছিল সেই ডাক্তারকে নিয়ে। আমাকে তাঁর ফোন নম্বর দিয়েছিল সে-ই। সুবিমলকে নিয়ে আমি জেলা শাসকের কাছে গিয়েছিলাম। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সুবিমল ভূমিকম্প পীড়িত লাতুর জেলার কথা শুনিয়েছিল তাঁকে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কফি নিয়ে ঘন্টা দেড় আড্ডা হয়েছিল। নামী সংবাদপত্রের সাংবাদিক। তাকে তো খাতির করতে হয়। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জেলা উৎসবে। সেই উৎসব হত বর্ণাঢ্য। তার জন্য খরচও হতো দেদার। জেলার বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা অকৃপণ হাতে বাড়িয়ে দিতেন। শীত ওখানে চমৎকার। উৎসবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। কলকাতা থেকে ট্যুরিস্টের ভিড় হতো। আদিবাসী নৃত্য, ভাওয়াইয়া থেকে নানা লোক সংগীত, লালনের গান, রবীন্দ্রনাথের গান, শাস্ত্রীয় সংগীত, সব হত। চিত্রতারকাদের নিয়েও অনুষ্ঠান হতো। আগে অতটা বড়ো করে হত না। মল্লিক সায়েব জেলার ভার নেওয়া পর উৎসব বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু সত্য সন্ধানী সুবিমল অনাহারী গ্রাম নিয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট করেছিল। উদাসীন জেলা প্রশাসনের অজ্ঞাতে অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে। আশ্চর্য, সুবিমল যে এই খবর করতেই এসেছিল আমাদের জেলায় তা আমিও জানি না। আমি তাকে কত সাহায্য করলাম, মদ উপহার দিলাম, সবই তো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে, নাজিরখানা দিয়েছিল টাকা। সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরের কথা, আমাদের বিব্রত করে গেল। অনাহার যত না, বলল অনেক বেশি। এক বেলা, আধ-পেটা খাওয়া, না খাওয়া, উপোস, এসব তো আমাদের দেশের

মানুষের অভ্যাস, না খাওয়া মানুষ কোথায় নেই, কোন জেলায়? এটাকেই ওই সব মানুষ তাদের জীবনের অন্তর্গত বলে মেনে নিয়েছে।

'সাতপুরুষ ধরেই তারা না খেয়ে থাকে, তাতে কী হয়েছে? না খাওয়া তাদের অভ্যেস, সাংবাদিক হারামি খুঁচিয়ে ঘা করল।' কথাটা বলেছিলেন ডি.এম — মল্লিক সায়েব।

মল্লিক সায়েব আমাদের সকলের কর্তা। তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা শুনেছিলাম আমি মজুমদারে মুখে। এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বড়ো সায়েব, যে খিস্তি করতে তাঁর বাধেনি। এটা ঠিক করেনি সুবিমল। বিধানসভা অবধি গড়াল অনাহারের রিপোর্ট। টেলিভিশনে খবর হল। ক্ষতি আমার হল, তারপর থেকে মল্লিক সায়েবের ভালো নজর থেকে আমি সরে গেলাম। তাঁর স্থির বিশ্বাস সবটাই আমি জানতাম। আদিবাসীরা কবে খেতে পায়? খাওয়ার গল্প শুনেই তাদের দিন কাটে, তা কে না জানে। আর তারা না খায় তাই বা বলল কী করে, তারা বনের ফল-পাকুড়, কন্দমূল, সাপ-ব্যাঙ, পিঁপড়ের ডিমেই অভ্যস্ত, বিরিয়ানি দিলেও খাবে না।

এসব কতদিন আগের কথা। মল্লিক সায়েবকে আমি একটুও ভুলিনি। এখন এই প্রায় নির্জন বাড়িতে বসে চাকরিজীবন নিয়ে নানা কথা মনে পড়ে। তা ছাড়া কীই বা মনে থাকবে। জীবনের সঞ্চয় তো ওইটুকু। আমার জীবনের দুটি কাজ, একটি আমার সন্তানটিকে মনের মতো করে তৈরি করা, অন্যটি হল এই বাড়ি। সল্টলেক সিটিতে এই বাড়িটি করেছিলাম মনের মতো করে। বিধাননগরের চেয়ে সল্টলেক সিটি নামই আমার পছন্দ। ওয়াশিংটন সিটি — ওয়াশিংটন সিটি মনে হয়। কত কষ্ট করে এই বাড়ি করেছিলাম। জমি জোগাড় করেছিলাম পুরোনো সহকর্মী মজুমদার আর অফিসের এক অধঃস্তন কর্মচারীকে ধরে। তার ভগ্নিপতি সে বছর রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। আমাকে তাঁর কাছেই নিয়ে গিয়েছিল সে। বদলে তাকে অফিসের এমন ফাইল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার ভিতরে টাকা আছে। এ ব্যাপারে আমাকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। তাতে কী হয়েছে? ওই ফাইল যার হাতে যাবে, সেই টাকা নেবে, তাহলে ভবতোষ গাঙ্গুলী টাকা নিলে কী দোষ? কেউ না কেউ তো নেবেই। কিন্তু আগে টাকা নাকি ভাগ হতো, ভবতোষ সেইটা বন্ধ করে দিল। সে একাই নিতে লাগল। তখন ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। এক বছরে বেশি ওই ফাইল যেন না দেওয়া হয় কাউকে। বদলে বদলে সকলেই সুযোগ পাক। আমার বদলি হয়ে গেল সেই সময়। জমি পেয়ে তা রেজিষ্ট্রি করে পজেশনও পেয়ে গেছি।

সুতরাং বদলি। আমার বদলে যিনি এলেন তাকে আমি বলে এলাম ওই অর্থকরী ফাইল ঘুরিয়ে সকলের হাতে দিতে। সেই বাড়িতে আমরা এখন দুজন। আমি বুড়ো হয়েছি, আমার বউ বুড়ি হয়েছে। আগের মতো আর খাটতে পারে না। আগের মতো আর উৎসাহ প্রকাশ করতে পারে না। সারাজীবন ও-ই আমাকে চালিয়েছে, এখন বলে, কিছুই তার ভালো লাগে না। আমাদের একটি নাতনি হয়েছে, তার এখন বছর চার। রয়েছে সেই সাতসাগরের ওপারে। তাকে দেখছে এখন বউমার মা, বাবা, এরপর যাব আমরা। পালা করে

যাওয়া স্থির হয়েছে। অপেক্ষা করছি কবে যাব বিদেশে। কিন্তু আমার বউ বলছে, যাবে না। কেন যাবে না? ওর এখন কিছুই ইচ্ছে করে না। চুপচাপ বসে থাকে। এমনিতেই ও খুব খেয়ালি। ওর মন খারাপ অনেকদিন থেকে যায়। চুপচাপ থাকে, মাঝে মাঝে বলে ওঠে, এ জীবনের মানে কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে?

ও বলল, কিছু হয়নি।

তাহলে চুপ হয়ে গেলে কেন?

কী করব চুপ করে না থেকে?

কিছু একটা হয়েছে তোমার।

না কিছু হয়নি। বলে সুনন্দা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি ব্যালকনি থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। একটা বুড়ো মতো লোক আসছে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে। রোগা, মাথার চুল সাদা। জিনস আর রঙিন চেক শার্ট। এ পাড়ার লোক বলে মনে হয় না। বাড়ির নম্বর খুঁজছে মনে হয়। একটা লোককে জিজ্ঞেস করছে কিছু। খোঁজ নিচ্ছে কোনো বাড়ির। আমি দেখতে দেখতে ভাবি আমাদের বাড়ি এলে ভালো হয়। কতদিন আমাদের বাড়ি তেমন লোক আসে না। টেলিফোন হওয়ায় মানুষের যাওয়া আসা কমে গেছে। আমরাও তো তেমন একটা যাই না কোথাও। এখন মানুষের চলন কমে গেছে মনে হয়। টিভিও তার কারণ একটা। বেরোতে গিয়েও মানুষ ঘরে আটকে থাকে এই সব নিয়ে। টেলিভিশনের সিরিয়ালের চরিত্ররাই এখন আমাদের ঘরে এসে বসে। কথা বলে, গান গায়, কাঁদে হাসে, প্রেম-কলহও করে। আমরা তা নিবিষ্ট হয়ে দেখি। শেষ হলে বলি রূপসী আর একটু থেকে যাও। সে থাকে না, তখন অন্যরা আসে অন্য সংসারে অন্য গল্প নিয়ে। সেই গল্পের সঙ্গে আগের গল্পের আপাত কোনো মিল নেই, কিন্তু একই গল্প মনে হয় বারবার। তবে হ্যাঁ, এই সব গল্প কোন সংসারের গল্প তা ধরা যায় না। ধরা যায় না বলেই নিবিষ্ট হয়ে আমরা দেখি।

দোতলার এই ব্যালকনিতে বসে কতদূর দেখা যায়। প্লটটি একদম মনের মতো করে নির্বাচন। সামনেটা খোলা মাঠ, তার গা দিয়ে রাস্তা গেছে বাস রাস্তার দিকে। সুনন্দা কখনও এসে বসে, বেশিরভাগ সময় আমি একা। এই যে সুনন্দা ছিল, এখন উঠে গেছে বাগানের গাছে জল দেবে বলে। বাগানে নানারকম ফুল ফোটে, গাঁদা থেকে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, জিনিয়া, জুঁই, স্বর্ণচাঁপার গাছও আছে একটি। সিজিনের ফুল সিজিনে ফোটায় মালি। বনসাই করেছে বট, অশ্বত্থ আর গন্ধরাজের। বড়োকে ছোটো করে দিয়েছে। বড়ো যদি ছোটো হয়ে যায়, দেখতে বড়ো ভালো লাগে, এই এখন। মনে হয় ক্ষমতার ডানা ছেঁটে দিয়ে উৎসটাকে বন্দী করে ফেলেছি।

সুনন্দা নির্দেশ দেয়। নতুন নতুন ফুলের জন্য তার সঙ্গে কথা বলে। নিজে চলে যায় নার্সারিতে। সেদিন আমাদের গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বেরোয়, ভাড়াটে ড্রাইভার আসে। ফোন করলেই সে হাজির অন্য ডিউটিতে জড়িয়ে না গেলে। নার্সারির গাছের, লতাগুল্মের ভিতরে গিয়ে মনে হয় জীবন অনেক সতেজ ও সুন্দর। বেশ ভালো লাগে। আদর্শ দাম্পত্যের এক রূপ হলো সতেজ গাছ-গাছালি, আর নতুন ফোটা ফুল। তা আমাদের বাগানে কখনও কখনও দেখা যায় ক-দিনের জন্য। তখন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মন স্থির থাকে, চঞ্চল হয় না। অকারণে উদ্বিগ্ন হয় না। রাতে কোন ফুল ফুটল সেই কথা নিয়ে আমরা প্রাতঃভ্রমণে বের হই। আর সব বয়স্ক ভ্রমণকারীদের ফুল ফোটা খবর দিই। তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের বাগানে, টবে ফুল আসার খবর পাই। তখন ইমারতে ইমারতে ভরা শহর ঘুমিয়ে। পথের ধারের রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়ার রং ভাসানো দেখি। আয়ু বৃদ্ধির জন্য কত সময় হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি। এক একজনকে দেখে মনে হয় ভগবানের কাছে সার্ভিস এক্সটেনশনের প্রেয়ার দিচ্ছে। ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে যুক্ত-করে। কত সময় ধরে! হে সূর্য, হে দিনমণি, সব কাজ ফুরোলেও কত কাজ ফুরোয়নি এখনও, বেঁচে থাকতে দাও। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার চক্রবর্তীবাবুর কাজ কম করে আধ ঘন্টা সূর্য প্রণাম করে। সুগারে লোকটার শরীর শুকনো বাঁশের মতো হয়ে গেছে, কিছুতেই কিছু না হওয়ায়, আদি পিতা সূর্যের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। হাঁ করে প্রথম আলোকে গ্রহণ করেন তিনি। এর নাম অতি বেগুনি রশ্মিকে শরীরে প্রবেশ করানো। তাতে শরীর নিরোগ হয়! এক সাধুর কাছ থেকে এই নিদান পাওয়া। চক্রবর্তী লোকটা খুব দাপুটে অফিসার ছিল। পিটিয়ে একটা আসামীকে মেরেও ফেলেছিল শোনা যায়। আবার এক গোলমালে গিয়ে মরতে বসেছিল। তার গায়ে বালতি করে কেরোসিন ছুঁড়ে দিয়েছিল ক্ষিপ্ত জনতা। তারপর আগুন ছুড়তে আরম্ভ করেছিল। জিপ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল চক্রবর্তী। মাঝে মাঝে এসব কথা শোনায়। এসবই এখন সম্বল। বিরক্ত সুনন্দা বলে, 'জাবর কাটতে কাটতেই তোমাদের দিন যায়, শুনলে গা রি রি করে।'

সমস্ত জীবনের সঞ্চয় তো ওই স্মৃতি, ওই কথাই তো মানুষ বলবে এই বয়সে। আমি সুনন্দাকে বলেছি।

সত্যি, কিন্তু বলতে পারে না কেন ছোটোবেলার কথা, ছোটোবেলাটা কেমন কেটেছিল সেই সব কথা?

৩

মল্লিক সায়েব বলতেন, তিনি তাঁর চাকরিতে এসে, দশজনকে সাসপেন্ড করেছেন, একজনের চাকরি খেয়েছেন, সে কোর্টে গিয়েও সুবিধে করতে পারেনি।

কী হয়েছিল স্যার? মজুমদার নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

বদলি করা হয়েছিল, ডেপুটেশন দিতে এসে খারাপ কথা বলেছিল, নিউজ হয়েছিল তো।

আমি জানি। সেই ঘটনা ঘটেছিল দূরের জেলায়। সেখানেও মল্লিক সায়েব জেলা শাসকের দায়িত্বে ছিলেন। সরকার বিরোধী ইউনিয়নের নেতাকে জেলা সীমান্তে বদলি করে দেওয়ায় হয়েছিল বিপত্তি। তাদের হাতে নাকি নিগৃহিত হয়েছিলেন জেলা শাসক। তারপর এফ. আই. আর, গ্রেপ্তার, চাকরি থেকে বহিষ্কার। এই অ্যাকশনে গোটা জেলা কেঁপে উঠেছিল, বিরোধী ইউনিয়ন ভেঙে তছনছ। মল্লিক সায়েব হয়ে ওঠেন সরকারের এবং সরকারি দলের প্রিয়পাত্র। তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ক্রমশ। আইনি ক্ষমতার বাইরের ক্ষমতা।

বাবরি মসজিদ ভেঙে ঠিক করেছে রামভক্তরা এ বিষয়ে তাঁর মতামত খোলাখুলি। তা সন্ধ্যের আড্ডায় তিনি বলেন, অধীনস্ত ডেপুটিরা ঘাড় কাত করে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করে। এইটিই দস্তুর। তখন কালেক্টরেটের সদরে কোনো মুসলমান ডেপুটি ছিলেন না। তিন সাব-ডিভিসনে একজন। আমি চুপ করে থাকতাম। মনে হতো ঠিক নয়, এসব কথা বলা ঠিক নয়। কিন্তু আমি ওই কথার বিপরীতে কোনো কথা বলার সাহস রাখতাম না। আবার পক্ষেও কিছু বলতাম না। বুদ্ধিমান জেলা শাসক তা লক্ষ রাখতেন। আমি জানতাম জেলা শাসকের ভালোমন্দ লেখার উপর আমার চাকরির ভবিষ্যত। আমার প্রমোশন, আমার বদলি, আমার পোস্টিং — সব। মল্লিক সায়েব বলতেন, আমাদের গা থেকে মছলিখোর অপবাদটা মুছতে পারলে তবেই আমরা প্রকৃত ভারতীয় হতে পারব, ভারতীয় মানেই নিরামিষাশী।

বৈদিক মুনি ঋষিরা সোমরস আর গো-বৎস ভক্ষণ করতেন শুনেছি স্যার। আমি বলে ফেলেছিলাম আচমকা।

একদম মিথ্যে কথা। কে দেখেছে? এসব প্রচার আমাদের ক্ষতি করেছে।

মজুমদার ঘাড় নেড়ে বলেছিল, ইয়েস স্যার প্রচার, আমি তো চিকেন মাটন ছেড়ে দিয়েছি, মাছও ছাড়ব।

আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। স্যার কথা বলছেন, বলুন। তাঁরা দুই ভাই এক বোন, তিনি ছোটো, তাঁরা সকলেই প্রশাসনে আছেন। বড়ো ভাই ফরেন সার্ভিসে, তাঁরা ভাই-বোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে। বোন আই. এ. এস, বোনের হাজব্যান্ডও তাই। স্টেট সার্ভিসে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল প্রথম। কথায় আমি সাড়া দিতাম না বলে, তিনি আমাকেই শোনাতেন সব, ব্যুরোক্র্যাটরাই একদিন সব পাওয়ার ভোগ করবে, তারাই শাসন করবে। দেশটিকে চেনা যায় তার ব্যুরোক্রেসি দিয়ে।

ইয়েস স্যার।

অ্যাবসলিউট পাওয়ার পেলে আমরাই দেশটাকে ঠিকঠাক রাখতে পারব।

ইয়েস স্যার। মজুমদার বলত, হয়ে যাবে স্যার। পোলিটিসিয়ানদের কেউ বিশ্বাস করে না। পলিটিকস শুধু ভোট ওরিয়েন্টেড। লোকে বলে, পোলিটিসিয়ানদের দিন শেষ হয়ে যাবে শিগগির, পাঁচ বছর নয়, পঞ্চাশ-একশো বছরের জন্য।

তা ঠিক, কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, সময়ে ক্ষমতা চলে আসবে ঠিক।

ইয়েস স্যার, আমাদের ডিউটি আমাদের করতে হবে। মজুমদার হাত কচলে বলেছে।

মজুমদার, আমার ভাগ্নী আসবে, তুমি স্টেশনে যাবে রিসিভ করতে।

ম্যাডাম যাবেন নাকি স্যার?

জিজ্ঞেস করো ম্যাডামকে। আমার ভাগ্নী এবার বসেছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, র‍্যাঙ্ক করেছে নাইনটি এইট। এবার ইন্টারভিউ। আমি বলেছি রাজস্থান কিংবা পাঞ্জাব ক্যাডার অপশন দিতে। ওদিকে ব্যুরোক্রাটরা অনেক বেশি পাওয়ার এনজয় করে। আর দিল্লিটাও কাছে ওদিকের অফিসাররা পাওয়ার কী তা দেখতে পায়, পাওয়ারের খাঁটি চেহারা ওখানে গেলে টের পাওয়া যায়। তোমারই সব, ক্ষমতাকে ব্যবহার করো, এনজয় করো পাওয়ারটাকে।

ইয়েস স্যার। মজুমদার বলল, আপনার ফ্যামিলিই দেশ শাসন করছে।

আমাদের ফ্যামিলি ব্যুরোক্রেসিটা জানে।

ইয়েস স্যার।

তুমি জান না তোমার পাওয়ার কোথায়, কতটা পাওয়ার তুমি হোল্ড করো, জানলে তুমি ওইটাকে ব্যবহার করে আরো পাওয়ার অ্যাকোয়ার করতে পারবে।

মজুমদার বলল, জানি স্যার। রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে হোটেলের রিসেপশনে কার্ড শো করাতে, সে কী খাতির স্যার। আমাকে একটা গাড়িই দিয়ে দিল সব সময়ের জন্য।

আমরা জানতাম মজুমদার পারে। মধ্যপ্রদেশ গিয়ে সাগর জেলার কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বান্ধবগড় ফরেস্ট ঘোরার জন্য সরকারি গাড়ি অ্যালট করে নিয়েছিল। কালেক্টরের ঘরে ঢুকে এমন স্যার স্যার করতে লাগল, তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই মানুষটি পরে ইলেকশনের অবজার্ভার হয়ে পাশের জেলায় এলে মজুমদার সাময়িক বদলি নিয়ে সেই জেলায় চলে গিয়েছিল। ইলেকশনের সময় এমন হয়। জেলার পুরোনো অফিসারদের বদলি করে দেওয়া হয় কমিশনের আদেশে। মজুমদার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে দামি সিল্ক। আমাদের শহরের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেওয়া। সেই সায়েবের সঙ্গে তাঁর গৃহিনীও এসেছিলেন।

সুনন্দা ফিরল ব্যালকনিতে, বলল, ভালো লাগছে না।

জল দেওয়া হয়ে গেল?

মালি ছেলেটা কাল সকালে আসবে, আজ না দিলেও হবে।

একটা দিন শুকিয়ে থাকবে?

থাকুক। গাছ-টাছ আমি রাখতে পারব না। আমার ভালো লাগছে না। সুনন্দার গলায় বিরক্তি।

কেন কী হল?

কিছু হয়নি, আমার ভালো লাগছে না।

কতবার বলেছে ছেলে-বউ, চলো ঘুরে আসি।

সুনন্দা চুপ করে থাকে। আমি বললাম, গান নিয়ে বসতে পারো তো।

কী জানি কেন ভালো লাগে না, ওই একটা লোককে দেখছ।

হুঁ, কত লোক তো রয়েছে, কোনজন?

এদিকে আসছে, ও কে?

কী করে জানব কে, আমাদের বাড়ি তো আসছে না।

আসতেও তো পারে। সুনন্দা বলল, চেনা মনে হয় যেন।

আমি তো চিনতে পারছি না।

দেখ, আমাদের বাড়িই আসবে।

আমি জানি আমাদের বাড়ি আসবে না, আমাদের বাড়ি অনেকদিন কেউ আসে না। বউমার বাপের বাড়ি বর্ধমানে, কলকাতায় এলে আসেন তাঁরা কখনও সখনও। আসলে মেয়ে থাকলে আসতেন, মেয়ে নেই কার কাছে আসবেন? তাঁরাও একা হয়ে গেছেন। তবে ওটা জেলা শহর। ওই শহরের আদি বাসিন্দা তাঁরা। আত্মীয়-স্বজন সব আশপাশে। বিশ মাইল দূরে দামোদরের ওপারে তাঁদের গ্রাম, গ্রামেও যাওয়া আসা আছে। আমাদের গ্রাম নেই। আছে এই নতুন শহর, পঞ্চাশ বছরও বয়স হয়নি যার। এই শহর এখনো অচেনা হয়ে আছে আমাদের কাছে। সুনন্দা এই ব্যালকনিতে বসে দূরের পথচারী দেখে প্রায়ই কল্পনা করে আমাদের বাড়ি আসছে কেউ। কিন্তু কল্পনা একবারও সত্য হয়ে ওঠেনি এখনও।

জেলা শাসকের ভাগ্নী, বছর ২৭-২৮-এর শ্রেয়া চৌধুরীকে রিসিভ করতে মজুমদার গিয়েছিল। সঙ্গে দু'জন অর্ডারলি। জেলা শাসকের ভাগ্নী শ্রেয়া রূপবতী, ক'দিন বাদেই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন রাষ্ট্রের কাছ থেকে, তাকে মজুমদার নিজের হেপাজতে নিয়ে নিল। ম্যাডামের দেখাশুনো করবে সে। ম্যাডামকে জেলাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে। অর্ডারলি দুজন, যাদব আর মাধবকেও মজুমদার তার হেপাজতে

নিয়ে নিয়েছিল ছোটো ম্যাডামের খিদমত খাটার জন্য। শ্রেয়া চৌধুরী যখন বিশ্রাম নেন মজুমদার তার চেম্বারে আসে। তার চেম্বারে আমরা ভিড় করি। মজুমদারের ভাগ্য কী। এই ভাগ্য সে নিজেই অর্জন করেছিল। অমন সুন্দরী যুবতির বডি গার্ড হতে পারা চাড্ডিখানি কথা নয়। কেউ কেউ বলতে শুরু করল, যতক্ষণ ছোটো ম্যাডাম না ঘুমোবেন, মজুমদার ডিউটি দিয়ে যাবে।

আমি তাকে দেখেছিলাম দূর থেকে। মাথায় মজুমদারের চেয়ে উঁচু, পাঁচফুট সাত ইঞ্চির মতো হবে, মাজা মাজা গায়ের রঙে আশ্চর্য লাবণ্য, মাথাভরা চুল, বেতস গাছের মতো টান টান দেহলতা, উদ্ধত যৌবনে আভিজাত্য ছিল, ছিল ছোটো নদীর বহমানতা। হালকা নীল শাড়ি, হালকা নীল ব্লাউজ। সে উঠল গাড়ির পিছনে, সঙ্গে বড়ো ম্যাডাম, মিসেস মল্লিক। মজুমদার ড্রাইভারের পাশে। একদিন দেখলাম গাড়ির পিছন থেকে নামছে শ্রেয়া চৌধুরী একা। মজুমদার ড্রাইভারের পাশ থেকে। জেলা কালেক্টর — ডি. এম-এর বাংলো কালেক্টরের অফিসের লাগোয়া। তবে প্রাচীরে ঘেরা। বড়ো গেটের মুখে সেন্ট্রি রাইফেল উঁচিয়ে। ভিতরে টেনিস কোর্ট, বাগান, প্রাচীরের গা ঘেঁষে একশো বছর পার করা বুড়ো শিরীষ, পিপুল, কদম, মেহগনি, অশ্বত্থ। কয়েক কাঠার সব্জি-খেত। তাতে শীতের সময় শখের ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদি হয়। সব ব্রিটিশের রেখে যাওয়া দর্পের চিহ্ন। ব্রিটিশের যে যে উত্তরাধিকার আমরা সযত্নে রক্ষা করছি, তা হল প্রশাসনিক রীতিনীতি, দেশ শাসনের আইন-কানুন। যে আইনে ব্রিটিশ সরকার এ-দেশ শাসন করত, সেই আইনই বলবৎ রয়েছে স্বাধীন দেশে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম শ্রেয়া চৌধুরী আমাদের অফিসের দিকেই আসছেন। তাকে পথ চিনিয়ে চিনিয়ে আসছে মজুমদার, 'ইয়েস ম্যাডাম, এই দিকে, এই দিকে, এমন হতে পারে আপনি এলেন আমাদের গার্জেন হয়ে, যেমন আছেন বড়ো সায়েব, মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাডাম।'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম এই কথা বলতে বলতে মজুমদার শ্রেয়া চৌধুরীকে এ.ডি.এম-মিঃ গগন শ্রীবাস্তবের চেম্বারে নিয়ে গেল। শ্রীবাস্তব সেই মানুষটি যার বাংলোয় খাঁটি গোরুর দুধ পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেছে মজুমদার। ইউ.পি.-বিহার সীমান্তের ছেলে মিঃ শ্রীবাস্তবের ব্যবহার ভালো নয়। আমাদের তুচ্ছ মনে করেন। ভিতরে মিস শ্রেয়া চৌধুরীকে রেখে মজুমদার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। পায়চারি করতে লাগল। ঘড়ি দেখতে লাগল। রুমালে ঘাম মুছতে লাগল।

আমি ডাক দিলাম, মজুমদার, আমাদের দিকে একটু তাকাও।

মজুমদার এগিয়ে এল, ম্যাডাম বেরোলে আমাকে খুঁজবেন।

আরে শ্রীবাস্তব সায়েব তোমার ম্যাডামকে এখন ছাড়বে না। বলল শুভময় সেন, আমার চেম্বারে সে এসেছিল হয়তো শ্রেয়াকে এই বিল্ডিংয়ে ঢুকতে দেখে।

মজুমদার ঘড়ি দেখল। বিড়বিড় করল, দু-টোয় লাঞ্চ।

এখনও অনেক দেরি, তুমি চঞ্চল হচ্ছ কেন?

মজুমদার চুপ করে থাকে। তখন আগস্ট মাস। বর্ষা কদিন বন্ধ। একটা গুমোট ভাব চারদিকে। মজুমদারকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, শ্রীবাস্তবের মিসেস তো পটনা।

হ্যাঁ। মজুমদারে কণ্ঠস্বর ম্রিয়মান।

দেখ, বড়োসায়েব যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালন করো ঠিকঠাক করে। শুভময় সেন বলল গম্ভীর গলায়, অফিসটা বৃন্দাবন হয়ে গেল, বেশ বেশ!

মজুমদার চুপ। গগন শ্রীবাস্তব ছ-ফুট উঁচু, মস্ত দেহ তার। ঈষৎ লাল চোখ দুটি বনবন করে ঘুরছে সব সময়। মহিলা অফিসার তানিয়া সেন তার ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল আমার কাছে, নতুন এ.ডি.এম-এর চোখ ভালো নয়, লোকটার কথাও ভালো না।

কেন কী হল? শুভময় সেন জিজ্ঞেস করেছিল।

ফাইল নিয়ে গেলে আটকে রাখে, আবোলতাবোল গল্প জোড়ে।

তোমাকে তো ঘন ঘন ডেকে পাঠায়। শুভময় বলে।

হ্যাঁ, আমি ফাইল পাঠিয়ে দিই, যাই না। কিন্তু ফাইলে যদি বারবার স্পিক লেখে, যেতে হবে। অথচ ফাইলের কথা না বলে বিচিত্র সব কথা বলে।

কী কথা?

তানিয়া বলেছিল, বলা যাবে না।

ডি. এম. সায়েবকে বলো, আমরা সবাই যাব। শুভময় প্রস্তাব দিল।

না, বড়ো সায়েব ওঁকেই সাপোর্ট করবেন, আমি বদলি নেব, আর এ সব বিষয় পাঁচজনে জানলে মেয়েদের দোষই দ্যাখে।

তানিয়া জেলা থেকে বদলি হয়ে গেল তারপর। গগন শ্রীবাস্তব স্পিক করতে বললেও সে আর যেত না তার চেম্বারে। তখন মজুমদার তানিয়াকেই দোষ দিয়েছিল, সায়েব ডাকলে যেতেই হবে। সায়েব তোমাকে নিয়ে ব্লক ভিজিটে যাবেন, তুমি যাবে না কেন? এ তো ইন-সাবর্ডিনেশন, আমি তো যাই সায়েবের সঙ্গে এখন, আমার আলাদা গাড়ি।

কতদিন আগের কথা এসব। সব কেমন ঠিকঠাক মনে আছে। মনে করতে ভালো লাগে। সুনন্দা যে বলেছিল শৈশবের কথা মনে নিয়ে আসতে, তা কেন আসে না জানি না। মনে আসে মজুমদার, শ্রেয়া চৌধুরী, শুভময় সেন, মল্লিক সায়েবদের কথা। এসব তো অনতি-অতীত।

মজুমদার একটু পরে বলেছিল, ম্যাম নিজেই তো বললেন মিঃ শ্রীবাস্তবের কাছে যাবেন, বড়ো সায়েবের সামনেই তো বললেন, সায়েব বললেন নিয়ে আসতে।

মিস শ্রেয়া চৌধুরী বেরিয়ে এলেন একঘণ্টা বাদে। ছুটে গেল মজুমদার। তরুণীর চোখমুখ আনন্দ আর তৃপ্তিতে ঝলমল করছিল। হাসি হাসি মুখখানি।

শুভময় সেন বলল, স্যাটিসফায়েড।

এরপর নিয়ম করে প্রতিটি দিন তাকে নিয়ে আসতে লাগল মজুমদার। তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে মজুমদার আমার ঘরে এসে বসে থাকে।

শুভময় সেন একদিন বলল, বড়ো বড়ো সায়েবদের বড়ো বড়ো ব্যাপার, তুমি না বড়ো সায়েবের রোষে পড়ে যাও মজুমদার, তুমি তোমার যে ডিউটি নিয়েছ, তা খুব রিসকি, এ.ডি.এম-এর চেম্বারে আচমকা ঢুকে পড়তে পারবে, স্যারের ভাগ্নী কী করে পটনাই ষাঁড়টাকে ধরল এসেই, এঁর সঙ্গে এত সময়?

বাদ দাও ওসব কথা, সায়েবদের কথা নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।

আরে আচমকা ঢুকে পড়ো চেম্বারে।

উনি পছন্দ করবেন না, ইন্টারকমে যোগাযোগ করার অর্ডার আছে।

কথা উঠবে মজুমদার, তানিয়া সেনকে ঘরে ডেকে কাজের অছিলায় আটকে রাখত শ্রীবাস্তব সায়েব, তোমার মনে নেই, অশ্লীল গল্প জুড়ত, তানিয়া বলেনি? আমি বললাম।

মজুমদার বলল, সায়েব যা বলবে, তা আমাকে করতে হবে বাসু। উনি ক'দিন বাদেই জয়েন করবেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, তখন কী হবে?

কী হবে মজুমদার?

মজুমদার বলল, তুমি বুঝতে পারছ না বাসু। উনি অপশন দিয়ে এই স্টেটেও আসতে পারেন। পারেন কিনা? তখন আমি ওর অধীনে চলে যাব।

তাতে হবে কী, উনি কি স্যালারি বাড়িয়ে দেবেন, না অ্যাডিশনাল ইনক্রিমেন্ট পাইয়ে দেবেন? শুভময় জিজ্ঞেস করেছিল।

মজুমদার এড়িয়ে গিয়ে বলল, ওই উনি বেরোলেন, উনি ইন্টারভিউ-এর জন্য রেডি হচ্ছেন, ওঁর কাছে সেই কারণেই আসেন, শ্রীবাস্তব সায়েবের র‍্যাঙ্ক ছিল ঊনআশী।

ছোটো শহর। এ শহরে গোপন কিছু থাকে না। অফিসে ফিসফাস আরম্ভ হয়ে গেল। শ্রীবাস্তবের বাংলোর বারান্দায় বসে থাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদার, ভিতরে ডি. এম-এর ভাগ্নী আর আর পট্টলিপুত্তরের আর্যপুত্র। আমরা চুপচাপ। বড়ো সায়েবের কানে গেলে অনর্থ হবে। মজুমদারের চাকরির ক্ষতি হয়ে যাবে। তোমাকে বলেছিল, ভাগ্নীর দেহরক্ষী হতে, তুমি তাকে কার কাছে ঠেলে দিয়েছ? শ্রীবাস্তব মেয়েখোর আর সে মেয়েই বা কী, ওর পাল্লায় গিয়ে পড়ল, বিবাহিত পুরুষ, এ নিয়ে সমস্যা হতে পারে।

মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, সায়েব ম্যামদের ব্যাপার তারা বুঝবেন, আমার ডিউটি আমি করব বাসু।

জেলা শাসক 'বাসু' বলেন, তাই মজুমদারও। আমি বললাম, তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ। ও মেয়ে ফুর্তি করে তোমার নামে দোষ দেবে, তুমিই তাকে নিয়ে গেছ ওর কাছে। শ্রীবাস্তব বড়ো অফিসার, মদ আর মেয়েমানুষে ওর খুব রুচি, ওর কিছু হবে না। ওদের কিছু হয় না। ফাঁসবে তুমি আঁচল না ছুঁয়েও।

মজুমদার গোমড়া হয়ে থাকল, জবাব দিল না।

শুভময় সেন বলল, তোমার নার্সিং সার্ভিসে গেলেই ঠিক হত।

কথাটা গায়ে মাখে না মজুমদার। কোনো অপমানই গায়ে মাখে না। প্রতিক্রিয়া জানায় না। আসলে সে ছিল 'কুল', প্রকৃত অর্থেই তা। কিন্তু সে মনে রাখত সব। সময়ে এলে শোধ নিত। শুভময় সেন আর আমি কেউ-ই বাদ যাইনি। আমাদের বিরুদ্ধে এনকোয়্যারি করে রিপোর্ট দিয়েছিল মজুমদারই। সে ছিল শাণিত বুদ্ধির মানুষ। কয়েকদিন বাদেই হঠাৎ ছুটি নিয়ে লোকাল নার্সিং হোমে ভরতি হয়ে গেল। মজুমদারের চেনা ডাক্তাররা বলল, সত্যি মজুমদার, সায়েবের হার্টের দপদপানি বেড়ে গেছে, সাতদিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। জেলা শাসক তার খোঁজ নিলেন, বুঝেছিলেন নিশ্চয় সবটা। তাঁর কানে কি যায়নি? এরপর শ্রেয়া চৌধুরী ফিরে গেলেন জীবনের পাঠ নিয়ে। মজুমদার নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেল আর ক-দিন বাদে। তাঁর আসা যত উচ্চকিত ছিল, যাওয়া ছিল নিঃশব্দে। শুনছিলাম শ্রীবাস্তব সেই সময় আচমকা পটনা চলে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে ডাক এসেছিল মিসেসের। তাঁর কাছে কি খবর চলে গিয়েছিল? তিনি তো তাঁর কামুক স্বামীটিকে চিনতেন। আর তার তীব্রতা হয়তো পছন্দও করতেন। কিন্তু স্বামী অন্য নারীতে মত্ত হলে তিনি কী করে স্থির থাকবেন? ক-দিনের ভিতরে বউ বাচ্চা নিয়ে ফিরেছিল শ্রীবাস্তব। মনে হয় খবরই পেয়েছিল তার বউ।

শ্রীবাস্তব মহকুমা ভিজিটে গেলে কী করে তা জেলায় কি অজানা ছিল? আর্যপুত্র শ্রীবাস্তবই ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে জানত। শ্রীবাস্তব সঙ্গে নিয়ে যেত মজুমদারকে। ডাক বাংলোর কেয়ার টেকারকে বলে

সায়েবের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করত মজুমদার। এসব খবর শুভময় সেন বলাবলি করত। বলত, মজুমদারটা মেয়েমানুষের দালালি করে সায়েবের সঙ্গে গিয়ে।

না না, এসব কথা বলা ঠিক নয়, ওকে নিয়ে যায় সায়েব, তাই যায়। আমি মজুমদারকে আড়াল করতে গিয়েও পারি না। শুভময় সেন বলত, ওকে দরাদরি করতে নিয়ে যায় শ্রীবাস্তব।

তখন চুপ করে থাকা ব্যতীত উপায় ছিল না। কথায় কথা বাড়ে। কারো কানে গেলে আমার বিপদ হবে। সন্দেহ হত, আবার মনে হত তা অমূলক। শ্রীবাস্তবের বউকে আমি তো দেখেছি। তার ভিতরে বন্য সৌন্দর্য ছিল। সায়েবের বউ কি কোনো আন্দাজই করতে পারে না? সব জেনেও কি স্বামীর গা ছুঁয়ে থাকে, আহ্লাদে ডগমগ করে। সে তার স্বামীতে ছিল মুগ্ধ। আমরা দেখেছি তা। কোনো অনুষ্ঠানে এলে তার হাতই ছাড়ত না প্রায়।

শুভময় সেন বলেছিল, তার স্বামী যদি গাঁয়ের গরিব মেয়েদের ইজ্জত লুট করে, তাতে তার কিছু যায় আসে না। পুরুষ মানুষ তো তা করবেই। গরিব আদমির জন্মই তাদের সেবা করতে। কিন্তু স্বামী যদি ইজ্জতঅলা মেয়ে ধরে তখন সে ক্ষিপ্ত। সেখানে তার অধিকারে টান পড়ে। তাই ফিরে এসেছিল সে। শ্রেয়া চৌধুরী বা তানিয়া সেন তার অধিকার হরণ করবে তা সে মেনে নেবে না। তখন বাঘিনীর রোষ জাগে তার ভিতর। কিন্তু গাঁয়ের চাষার মেয়েকে স্বামী ভোগ করলে তার ভিতরে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। তাদের ভোগ না করলে কিসের ক্ষমতা! কিসের পুরুষ! গন্ধি লেড়কিগুলো আছেই তো ওই করতে। হয়তো দেখা যাবে বড়ো ভূ-স্বামীর কন্যা সে। শ্রীবাস্তবকে বিশ-তিরিশ লাখ বর পণ দিয়েছে তার বাবা। বাবার আছে তিনটে পোষা মেয়েমানুষ। কী সুন্দর বলত শুভময়। সে আসলে ডায়েরি লিখত গোপনে। বিয়ে করেনি, একা থাকত। হয়তো অনেক কথাই বানাত নিজের মতো করে। বলত, ফিউডাল সোসাইটির মানসিকতা এমনই হয়। মাঝে মাঝে শুভময় বাড়ি যেত। ভাইপো ভাইঝিই ছিল তার প্রাণ।

শুভময় বলত, শ্রীবাস্তব তাকে তৃপ্ত করেছে, সন্তান দিয়েছে, তাও আবার পুত্র সন্তান, আর সেই কারণেই দিয়েছে সামাজিক ইজ্জত, মোটা মোটা গয়না, আর কী চাই? স্বামী যদি দশটা গাঁয়ের মেয়ের ইজ্জত নেয়, তার কী? পুরুষের সেই অধিকার আছে, তাতে পুরুষের ক্ষমতা প্রমাণ হয়। লেকিন, ওই চৌডরি! কভি নেহি। গরগর করতে করতে সে ফিরে এল যখন 'চৌডরি' উধাও। না হলে বিচিত্র এক দৃশ্য নির্মাণ হতো নিশ্চয়।

৪

সুনন্দা বলল, তোমার সেই সুবীরদা কোথায়?

কী করে জানব?

আমরা যদি অমনি হতে পারতাম! পারতে তুমি?

আমি বললাম, যে যেমন ভাবে জীবন কাটায়, আমি মনে করি না ওই জীবন খুব আনন্দের, সুবীরদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই করল না, আমাদের ছেলেও তো সান-দিয়েগোতে থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।

ছেলের বিয়ের সময় অনেক কষ্টে ফোন নম্বর জোগাড় করে এক রাতে ফোন করেছিলাম সুবীর ভদ্রকে। কথা বলা যায়নি। রোগীর বাড়িতে বসে আছেন তখন। ধরেছিলেন এক মহিলা, খুব সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয়। ওই টানে ইংরেজিতে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে। বলতে তিনি জানালেন ডক্টরবাবু পেশেন্টের বাড়ি, ফিরলে সব বলা হবে, ইফ হি লাইকস, রিং ব্যাক করবেন আপনাকে।

বলতে বলতে ফোন কেটে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর অবশ্য ফোন আর আসেনি। সুবীরদা হয়ত শুনে খুশি হননি যে আমার ছেলে অভিরূপ ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে থাকে। মামা মাসিদের পরিবারের ভিতর সুবীর সরকার সবচেয়ে মেধাবী, সেই প্রথম বিদেশ যাত্রা করেছিল। তারপর শুনেছিলাম বড়ো মাসির নাতনি গেছে। ওদের সঙ্গে আমার তেমন যোগযোগ নেই।

যাক এসব কথা কি আর নতুন? এ তো সব পরিবারে আছে। মেসো আক্ষেপ করতেন, সুবীর অত মেধাবী হয়েও শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে এল। আরও দুঃখের কথা, পড়ে থাকল কর্ণাটকের মফসসলে। আমার ছেলের বিদেশ যাওয়া যখন সেটল হল, মেসো আমাকে বলেছিলেন, যেন ফিরে না আসে। এ-দেশে থেকে কারওর কিছু হবে না। জীবনকে যদি ভোগ করতে হয় ওই আমেরিকা ইংল্যান্ডে যেতে হয়। সত্যিই তো, আমরা কী করলাম এ জীবনে? যা আনন্দ তা যেন ছেলেকে দিয়েই পূরণ করে নেব। ওকে বিদেশ পাঠাব, এ আমাদের পণ ছিল। দুজনেই ত্যাগ করেছি অনেক কিছু। আমার বউ-এর গলায় কতটা না গান ছিল, সে ছেড়েই দিল সব।

আমেরিকা থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। খুব ধুম হয়েছিল তখন। বিনা পণে ছেলের বিয়ে দিয়েছি। বিয়েতে কোনো উপহার নিইনি। লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদই ছিল প্রার্থনীয়। লোকে ধন্য ধন্য করেছিল। ছেলে যেমন আমার একটি, বউমাও বাপ-মার এক মেয়ে। গান জানা মেয়ে। ওদেশের বঙ্গ সম্মেলনে গায় শুনেছি। প্রশংসাও পায়। আমরা যা করেছি, সব পাবে তারা। মানুষ শুধু নিজের সুখের জন্য জীবনপাত করে না, তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, সাতপুরুষ যাতে সুখে থাকে তার ব্যবস্থাও পারলে করে রাখে। সাত পুরুষের জন্য টাকা পয়সা, ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে যায়। তবে আমরা আর কী দেব ওদের। আছে যে ঢের। এর ভিতরে যা সঞ্চয়, তা আমাদের সারাজীবনে হয়নি।

আজকাল সুনন্দার সঙ্গে তেমন কিছু কথা হয় না। সেও বলে না, আমিও বলি না। সে টিভির সামনে বসে থাকে, আমিও। নানা রকম উত্তেজক খবর আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। ভোটের আগে, ভোটে কী হতে পারে তা নিয়ে আমরা খুব মগ্ন থাকতাম। যে যে চ্যানেলে পার্টি নিয়ে খুব কোঁদল হতো সেই সেই চ্যানেল নিয়ে পড়ে থাকতাম। বউ অবশ্য এরই ভিতর একটা গানের চ্যানেলেও শিফট করত। রবীন্দ্রসংগীত শুনত অনেক সময় ধরে। তখন আমি বিরক্ত হতাম। আমি আমাদের নিস্তব্ধ নিরুত্তাপ জীবনে টেলিভিশনের ওই সব কোঁদল, খুনজখমের বিবরণে একটু উত্তাপ আসত। আমি আমার উত্তেজনা প্রকাশ করতাম, বউ চুপ করে থাকত। কখনও কখনও ও উত্তেজিত হয়ে যে উঠত না, তা নয়। সেই যে এক বিডিওর মৃত্যু নিয়ে নানা মত, উপরওয়ালার চাপে সে আত্মহত্যা করেছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছে, এ নিয়ে আমাদের দুজনের ভিতরে মতানৈক্য প্রবল। তার মত হল, যাই হোক, ওই সৎ বিডিওকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যার দায় ওর উপরওয়ালা এড়াতে পারেন না। আমার মত তার বিপরীত। আমি সেই বড়ো কর্তা প্রশাসনের পক্ষে। বিডিও ছেলেটির উচিত ছিল বড়ো কর্তার মত অনুসরণ করা। আমার জীবনে কি আমি সব কাজ ঠিকঠাক করেছি, জানি করিনি। তাতে কি আমি বেঁচে নেই?

বিডিও তো অন্যায় না করেই মরেছে। আমার বউ সুনন্দা বলে।

তা হলে অন্যায়টা করতেই পারত। আমি বলি, এ জীবনটা শেষ করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমার কথায় সুনন্দা রেগে যায়, বলে, সবাই তোমার সেই মজুমদার হতে পারে না, তুমি পেরেছিলে?

এই ভাবে আমাদের দিন যায়। এমনও হয় অনেকটা সময় আমরা বসে আছি একা। কেউ কোনো কথা বলছি না। টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছি, কিছুই দেখছি না। সুনন্দা চ্যানেলের পর চ্যানেল সার্ফ করে যাচ্ছে। কোথাও স্থির হয়ে থাকছে না। আমি উঠি, ব্যালকনির অন্ধকারে যাই, ফিরে আসি। টেলিভিশনে কোনো শব্দ নেই। তখন আমাদের ঘরে বোবা মানুষে কথা বলে, গান গায় নৈঃশব্দের ভাষায়।

সেই লোকটা আমার বাড়ির কাছে। কেমন চেনা লাগছে। হাঁটার ভঙ্গী চেনা। কে যেন, কার কথা মনে পড়ছে যেন। না সে হবে কী করে? আমি উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। অনেকদিন বাদে আমাদের বাড়িতে একটা লোক এল মনে হচ্ছে। না হতেও পারে। এই সেদিন বৈশাখী নামের আবাসন থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল, তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল অনুপম, আমার সহকর্মী। এগোতে গিয়েই মনে পড়ে গেল অনুপম সুর বছর খানেক আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমার চেয়ে বছর সাত-আট ছোটো ছিল ও। হৈ হৈ করে বাঁচতে ভালোবাসত। চমৎকার ছিল গানের গলা, গাইত কিশোর কুমারের গান। গাতা রাহে মেরে দিল, ... কী টান না দিতে পারত অনুপম, সুনন্দা ওর সঙ্গে গলা মেলাত। রফি আর লতা। একদিন হলো গাইড সিনেমার সব গান, রফি, কিশোর, ... ওহ কৌন হে তেরা মুসাফির, জায়েগা কাঁহা — শচীনদেবও গাওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজ পড়ে বুঝেছিলাম সেই অনুপম, বারাসতে

অতিরিক্ত জেলা শাসক হয়েছিল। আমি সুনন্দাকে খবরটা দিইনি। কাগজটাই সরিয়ে রেখেছিলাম। টিভির চ্যানেল বদল করে দিয়েছিলাম। কেন তা আমি জানি না।

একদিন বিকেলে ব্যালকনিতে বসে দেখলাম লোকটি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, লোকটা আমাদের বাড়িই এসেছে। প্রায় বুড়ো, কিন্তু ঠাঁটে-বাটে বেশ। মাথার চুল ঘন কালো, ডাই করা বোঝায় যায়, জিনস, চেক হাওয়াই শার্ট, পায়ে দামি শু্য। পকেট থেকে উঁকি মারছিল দামি সিগারেটের প্যাকেট। তাকে চিনলাম, তুমি মজুমদার না?

তখন বেলা পাঁচটার মতো। গ্রীষ্মের দিন তাই রোদ বেশ। মজুমদার বলল, আমাকে যে চিনতে পারবে তা ভাবিনি। অচিনপুরে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম।

হ্যাঁ, মেদিনীপুরেও, এস ভিতরে এস।

মেদিনীপুরে আপনি ডেপুটি, আমি জয়েন্ট বিডিও।

অচিনপুরে তুমি ডি.এম.-এর কনফিডেনসিয়াল অ্যাসিস্টান্ট। আমি বললাম।

মজুমদার হাসে, ডাক দেয়, ম্যাডাম কেমন আছেন, আপনার ছেলে তো আমেরিকায়, জানতাম এদেশে থাকার নয়, আমার জামাই থাকে ইংল্যান্ড।

নিচে বসার ঘর। অতিথির জন্য সুন্দর করে সাজান। নরম গদিতে বসতে বসতে মজুমদার বলল, ঠিকানাটা ছিল তোমার ছেলের বিয়ের কার্ডে, বিয়েতে আসতে পারিনি, কার্ডটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম বলে আসতে পারলাম। দাদা, ম্যাডাম এখনও গান করেন?

তুমি রিটায়ার করে গেছ?

রি-এমপ্লয়মেন্টে আছি, যতদিন পারি করব, করব নাই বা কেন?

তা ঠিক, আমার আর ইচ্ছে করল না।

আমি তিন মাস বসে ছিলাম, বসে বসে হাঁপিয়ে উঠলাম। বুঝলাম পারব না। এত বছর চাকরি করলাম, এত চেনা, চিফ সেক্রেটারি পর্যন্ত, আমি তো সবাইকে সার্ভিস দিয়েছি, সবাই আমাকে লাইক করতেন, শেষে কিনা মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার। আমি করিনি, পরে ভালো অ্যাসাইনমেন্ট পেলাম, করছি।

ঠিক সেই রকম রয়েছে মজুমদার। তার বৃত্তান্ত বেশ লাগছে। বহুদিন বাদে সেই অফিস, উপরওয়ালা, অধঃস্তন কর্মচারী, নানা প্রসঙ্গ ভেসে আসতে লাগল। পুরোনো কথার স্বাদ আলাদা। ভালোই লাগছে। সুনন্দা

একটু বসে, চা দিয়ে কিচেনে ঢুকে গেছে। বহুদিন বাদে মজুমদার এসেছে, তাকে কিছু ভালোমন্দ খাওয়াবে। আমি মজুমদারকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, সেই শ্রেয়া ম্যাডামকে মনে আছে বাসু তোমার?

মুখ টিপে হাসলাম, বললাম, মজুমদার, তুমি শ্রীবাস্তবকে সুযোগ করে দিলে।

মজুমদার বলল, ম্যাম এখন দিল্লিতে, হোম মিনিস্ট্রিতে। সেইবারেই আই.এ.এস হয়েছিল, আমার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ আছে।

তুমি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ মজুমদার, শ্রীবাস্তব কোথায়?

গগন সাব পটনায়, যোগাযোগ আছে। গিয়েছিলাম দেখা করতে, আমাকে পটনায় চাকরি দিচ্ছিলেন, ভালো সুযোগ ছিল। কিন্তু শেষ অবধি না করলাম। স্যার বলেছেন যখন প্রয়োজন জানাতে। কলকাতায় এলে আমিই সব হাউস, গাড়ি থেকে সব ব্যবস্থা করে দিই।

কী ব্যবস্থা?

উনি যা চান। মজুমদার হাসল।

এখনো দরকার হয়? আমি জিজ্ঞেস করি।

আর্য রক্ত না, আর হলো কি ওঁর ওয়াইফ...। থেমে যায় মজুমদার। কথাটা সম্পূর্ণ করল না, জিজ্ঞেস করলাম, মজুমদার ব্যাপারটা মল্লিক সায়েবের কানে গিয়েছিল?

মজুমদার বলল, কী কানে যাবে বলতো?

ওঁর ভাগ্নী আর শ্রীবাস্তব?

মজুমদার হাসে। বলে, তুমি ভোলোনি তো।

না, কিছু কিছু কথা মন থেকে সরে যায় না।

তুমি কি সব শুনতে চাও? মজুমদার বলল।

এখন শুনলে কী হবে, হাই প্রোফাইল পার্সন, ওদের কত ক্ষমতা, ওদের কাছে ওসব কিছুই না। লাইফটাকে পাওয়ার দিয়ে এনজয় করতে জানে ওরা। কিন্তু একেই কি ভোগ করা বলে?

তাহলে কাকে ভোগ করা বলে? মজুমদার বলল।

আমি চুপ করে থাকি।

যে ভোগ করছে সে জানে কী ভাবে ভোগ করতে হয়। আরে এসব ওঁদের কাছে জাস্ট এনজয়মেন্ট, ফান। আর শ্রীবাস্তব সায়েবের আর্য রক্ত, তার তেজ কি কম হতে পারে? ওঁর কাছে সবটাই স্বাভাবিক, আরে আর্যরা তো রমনী লুট করত, আগের দিনের সুলতান বাদশাদের ভিতরও ওই রক্ত ছিল, হারেমের কথা শোনোনি? আর মেয়েটাও ছিল ওর যোগ্য, অমনি হয়, তারপর হয়ত ওদের দেখা হয়নি, দেখা হলেও হাই-হ্যালোতেই শেষ।

যোগাযোগ আছে তোমার?

হ্যাঁ, শ্রীবাস্তব সায়েবের ছেলে খুব ব্রিলিয়ান্ট। ওকে আই.এ.এস. করবেন।

তাই তো হবে, বংশপরম্পরায় শাসনের একটা মোহ থাকে।

সায়েবের বাবা বিহার স্টেট সার্ভিসে ছিলেন।

তুমি শ্রীবাস্তবকে যা দিয়েছিলে, সে তোমাকে মনে রাখবেই।

দুজনকেই দিয়েছিলাম সুযোগ করে, তবে সকলের মনে থাকে না, আর আমি তো ছিলাম পাহারাদার, ওরা দুজনেই যখন তা চাইছিলেন, আমি কী করব বাসু?

বড়ো সায়েব তোমাকে জিজ্ঞেস করেননি?

মজুমদার মাথা নাড়ে, বলতে থাকে, বড়ো সায়েব এতে মাথা দেননি। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করতে, শুনেছি, দুজনেই অস্বীকার করেছিল। গগন শ্রীবাস্তব ওকে ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরি করেছিল। এতে সন্দেহের কী আছে? বাসু জগৎটাকে তুমি জানলে না, এসব কিছু না। আমার সামনে ওঁরা বনবাংলোয় সমস্ত দুপুর, আমি অন্য ঘরে বসে আছি। মেয়েটি আর সায়েব হাসতে হাসতে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, ইন ফ্যাক্ট শ্রীবাস্তব সায়েব-ই ওকে টেনে নিয়ে ঢুকেছে বাংলোর নিঃঝুমতার ভিতর। আর সেই মেয়ে যেন খাঁচা ছাড়া পাখি, পাহাড়ি ময়না।

তোমার খারাপ লাগেনি?

খারাপ লাগবে কেন? আমি সামান্য মানুষ, জয়েন্ট বিডিও তে ঘষে ঘষে শেষে প্রমোশনে ডেপুটি। তবে আমি ছ'মাস ব্লক করেছি, উঠে এসেছিলাম মল্লিক সায়েব, আমাদের ডি. এম-এর সুপারিশে, গগন শ্রীবাস্তব তখন প্রথম এসেছে। আমি বুঝেছিলাম নিরাপত্তা আর ক্ষমতার জন্য ক্ষমতাধারীর ছায়ায় থাকতে হয়। তুমি কি ভাবতে আমি বলতে পারব না বাসু, কিন্তু আমি জানতাম প্রাইমারি টিচারের ছেলেকে আরো আরো উপরে উঠতে হবে, আরো সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বাবাকে এক এস. ডি. ও-র রক্ষী ঘাড় ধরে চেম্বার থেকে

বের করে দিয়েছিল। বাবা বাড়ি এসে বিষ খান, তুমি কি এসব জানো বাসু, প্রশাসন নির্মম হয় ক্ষমতাকে জাহির করতে, ধরে রাখতে।

পরিবেশ থমথমে হয়ে গেল। মজুমদার এত বছর বাদে এল কেন তা আমি ধরতে পারছি না। শুধুই দেখা করতে? পুরোনো কথা বলাবলি করতে? যে কারণেই আসুক মজুমদার, সে-ই বলবে। ও বিষয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। সুনন্দা এল, বলল, আপনি কি ড্রিঙ্কস নেবেন?

ম্যাডাম আমার বন্ধ।

ছেলে এনেছিল, ও একা বলে খায়নি।

আমি বসে আছি, বাসু নিক, আপনি নিন।

সুনন্দা হাসে, আমার গা গুলোয়, পারব না।

তাহলে থাক, আমাকে বারণ করেছে, এক ড্রপও লিভারের পক্ষে বিপজ্জনক।

আপনি কি খেতেন?

মজুমদার বলল, সায়েবরা বসলে আমাকে থাকতে হত, বসলে আমাকেও নিতে হত। তবে কি, আসলে যাঁরা খেলেন, তাঁদের কিছু হল না, প্রায় না খেয়েই আমার হেপাটাইটিস। দিল্লির এইমস-এ ছিলাম একমাস, ম্যাডাম শ্রেয়া চৌধুরী সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওর জন্য বেঁচে গেছি। ভাজাভুজি খাই না, আপনি ভাববেন না, বসুন।

না আপনারা গল্প করুন, বউমা অন-লাইন আসবে একটু পরেই, উপরে যাই। বলতে বলতে সুনন্দা উঠে গেল। মজুমদার বিড়বিড় করল, আসলে ওসব সায়েবদের জন্য তৈরি, আমাদের কি সহ্য হয় বাসু? বনবাংলোয় ওঁরা পাশের ঘরে, আমাকে হঠাৎ ডাকলেন শ্রীবাস্তব সায়েব, মজুমদার, এই মুজুমডার, হ্যোয়ার আর ইউ মুজুমডার।

মজুমদারের তখন ঝিমুনি এসেছিল ভরা ভাদ্রের দুপুরে। নিঃঝুম বনবাংলো। লাঞ্চ প্যাকেট তার সামনের টিপয়ে। সায়েব ম্যাডাম ড্রিঙ্ক করে খাবেন। বড়ো একটি হুইস্কির বোতল সায়েবের হুকুমে এনেছে মজুমদার। তাঁরা দুজনে পাশের ঘরে। বনবাংলোর কর্মী বুড়ো সব ব্যবস্থা করে দূরে কোথাও আছে। হাঁক দিলেই সে এসে পড়বে। কোথায় কোন গাছের পাতার আড়ালে বসে একটা কুবো পাখি কুব কুব ডেকেই যাচ্ছিল কখন থেকে। মাঝে মাঝে সেই পাখি চুপ। হয়তো তার ভিতরেও ভয় ঢুকেছিল। মজুমদার ডাক শুনেই উঠে বসেছে। তার ঘর থেকে বেরিয়ে সায়েব ম্যাডামের ঘরের দরজায়, চাপা গলায় বলল, ইয়েস স্যার, কিছু বলছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি তো সিওর, তুমি দরজায় থাকবে মুজুমডার, কেউ যদি চলে আসে। জড়ানো গলায় বলে শ্রীবাস্তব। নেশায় টলটল করছিল ঘরের নারী পুরুষ, চাপা গলায় হাসছিল শ্রেয়া চৌধুরী, ওহ, নটি, ওয়াট আর য়্যু ডুয়িং, লেট হিম গো।

কথাটা কানে আসতে মজুমদার সাহস পেয়ে বলেছিল, আসবে না স্যার, নো ওয়ান ইজ পারমিটেড টু কাম হিয়ার নাউ।

আয় নো ইট মুজুমডার, লেকিন তুম রহোগে, বাহারমে খাড়া রহো।

আমি পাশের ঘরে আছি স্যার, আপনারা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিন।

নো মুজুমডার, ওপেন থাকবে ডোর, তুমি গার্ড দিবে।

নো গগন, ক্লোজ দ্য ডোর। চাপা গলায় বলল শ্রেয়া চৌধুরী, হাই সুপারম্যান, দরোয়াজা বন্ধ করো।

নো, মায় লাভ, সুইটি, হা হা হা, ইটস মায় অর্ডার, য়্যু আর গোয়িং টু গেট দ্য পাওয়ার অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সি, হাও দ্য পাওয়ার ক্যান বি এনজয়েড। ডার্লিং, মেরা পাওয়ার তো টু হানড্রেড হর্স পাওয়ার, গেট রেডি।

ওহ, মেরি জান, প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর। মজুমদারকে সরিয়ে দাও।

নো সুইটি, মজুমদার গার্ড দিবে, হি ইজ আ লয়াল অফিসার, সে জানে কী ভাবে অর্ডার ক্যারি আউট করতে হয়।

মায় লাভ, প্লিইজ।

নো সুইটি।

তুমকো করনাই হোগা গগন, ইয়ে মেরা অর্ডার, গো অ্যান্ড ক্লোজ দ্য ডোর, আয় নিড আ প্রাইভেসি, ডু ইট ম্যান।

হা হা করে হাসে শ্রীবাস্তব, বলে, তুমি তো মল্লিক সায়েবের রিলেটিভ হচ্ছো। পাওয়ার তোমার আঙ্কেল ভালো বোঝে। বাট, আওয়ার প্রোমোটি কালেক্টর একটা ইডিয়ট, না হলে তোমাকে ইন্টারভিউ-এর টিপস নিতে আমার কাছে পাঠায়, আমি তোমাকে খেয়ে নেব।

কাম অন গগন, কে কাকে খায় দেখি।

হা হা হা, হাসতে হাসতে শ্রীবাস্তব ওঠে, তার পায়ের চটির ফটফট শুনতে পায় মজুমদার। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করে। কিন্তু শ্রীবাস্তব আসে না। টয়লেটে ফ্লাসের শব্দ শোনে। লোকটা বেরিয়েছে টয়লেট থেকে। আসছে দরজার দিকে। বিড়বিড় করছে, ওহ মুজুমডার, তবু তুমি বাইরে থাকবে, চেয়ার নিয়ে দরজার বাইরে বসো, তোমার ডিউটি তুমি করবে আমি দরওয়াজা বন্ধ করি বা না করি।

ইয়েস স্যার!

ক্লোজ দ্য ডোর মায় লাভ, তুমি বাহারমে ওয়েট করো মজুমদার স্যার, ডু ইট মজুমদার সাহাব। খিলখিল হাসি উড়ে এল ঘরের ভিতর থেকে, ইউ আর আ নাইস পার্সন মজুমদার আঙ্কেল। ইউ উইল গেট রিওয়ার্ড ফর দিজ সার্ভিস, আমি তোমার কালেক্টরকে বলে যাব।

দূর থেকে ভেসে আসা কথাগুলি শুনে মজুমদার কৃতজ্ঞতায় নুয়ে গিয়েছিল। মিস চৌধুরী বলে গেলে সে আরও ক্ষমতা পাবে। সে ক্ষমতার কাঙাল। ভালোবাসে ক্ষমতার গায়ে গা ঘষতে। নিজেকে তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে ক্ষমতার বাতাস গায়ে লাগাতে চায়, বলল, থ্যাঙ্কিউ ম্যাম, সো গ্রেটফুল টু ইউ।

মোস্ট ওয়েলকাম আঙ্কেল, তোমার পুরো নামটা কি? শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল ভিতর থেকে।

জগবন্ধু মজুমদার ম্যাম।

ওয়েল জগবন্ধু, আমি তোমাকে আরো পাওয়ার দিয়ে যাব। বলে খিল খিল করে হাসতে লাগল শ্রেয়া চৌধুরী, জ গ ব ন ন ধুউউউ, আমাদের ড্রাইভারের নাম, সে খুব ভালো ছেলে। আই লাইক ইউ জগবন্ধু, যা বলব তাই করে দেবে তো?

আয়াম অ্যাট ইয়োর সার্ভিস ম্যাম। বিগলিত গলা মজুমদারের।

ওহ, নাইস, নাইস! আড়াল থেকে কথা ভেসে এল, ওক্কে জগু তুমি রেস্ট নাও।

নো রেস্ট, শুন মুজুমডার, আমি চাই অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি মুজুমডার আমাদের গার্ড দিবে, হি ইজ দ্য মোস্ট কমপিটেন্ট পারসন টু ডু দিজ টাইপ অব জব। জড়ানো গলা গগন শ্রীবাস্তবের, আমি তো মুজুমডারকে নিয়েই ব্লক ভিজিট করি, হি ক্যান ম্যানেজ এভরিথিং।

মজুমদারের এক মুহূর্তের জন্য মনে হল ভিতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজের স্বভাবে ফিরে আসে মজুমদার। পাথরের স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তখন বছর তিরিশের শ্রীবাস্তব দরজায় এসে গেছে। তার অনাবৃত ফর্শা রঙের ভিতর লালচে ভাব। ছ-ফুটের উপর লম্বা সেই গগন সায়েবের দানবের মতো শরীর। কোমরে একটি ঘন নীল রঙের ফ্রেঞ্চি। তার নীচে পৌরুষ দপদপ করছিল। সায়েবকে ওই অবস্থায় দেখে কুঁকড়ে গেল মজুমদার। মনে হল গগন সায়েব যদি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাংলো থেকে বের করে

দেয়! বিপরীত সম্ভাবনাই মনের ভিতরে জেগে উঠল। সায়েব যদি তাকে কান ধরে উঠবস করতে বলে পাওয়ার শো করাতে, যদি তাকে অর্ডার করে শ্রেয়া চৌধুরীর বিছানায় উঠতে, সে কি পারবে? পারবে না। ভয়ে কুঁকড়ে যাবে, মরেই যাবে। এই সায়েব তা করতেই পারে। অন্তত তাকে উঠবস করতে বলতেই পারে ফুর্তির চূড়োয় উঠতে। মানুষের ফুর্তির কত না রকম আছে। কেউ মানুষকে বিড়ম্বিত করে আনন্দ পায়। গগন শ্রীবাস্তব সেই রকম। সাধারণ মানুষ, অধীনস্ত কর্মচারী, অফিসারকে মানুষ বলে মনে করে না। মনে করে সকলেই দ্রাবিড়, সে একা আর্যপুরুষ, সে জন্মেছেই তাদের শাসন করতে। সব কিছু অধিকার করতে।

শ্রীবাস্তব তাকে দেখল পর্দার সরিয়ে, চাপা গলায় বলল, গুড বয়, খাড়া রহো মুজুমডার, দরোয়াজা বন্ধ করে দিচ্ছি। কোথাও যাবে না, চুপচাপ খাড়া রহো।

ইয়েস স্যার।

গুড বয়। বলে তার চেয়ে দশ-বারো বছরের কম বয়সী গগন শ্রীবাস্তব দরজা বন্ধ করল। মজুমদার কী করবে বুঝতে পারল না। তার ঘরে গিয়ে বসবে, নাকি দরজার কাছে থাকবে? নেশা হয়ে গেলে শ্রীবাস্তব কখনও হিংস্র হয়ে ওঠে, কখনও খুব নরম। আজ কী হবে তা জানে না মজুমদার। সে ওই ঘরে, আর ধূর্ত শ্রীবাস্তব যদি দরজা খুলে পরখ করে মজুমদার আছে কি না, তখন তো না পেলে সে মনে করবে, তার আদেশ অমান্য করেছে মজুমদার। শ্রীবাস্তব ভিজিটে গিয়ে পাবলিকের কাছে খোঁজ নেয় বিডিও কেমন, ঠিক কাজ করছে কিনা। সব ব্লকে তার পেটোয়া স্টাফ আছে, তারা খবর দেয়, তাদের কথা বিশ্বাস করে বিডিওকে হেনস্থা করে শ্রীবাস্তব। তবে সকলকে নয়। যেগুলি নরম প্রকৃতির, যেগুলি সৎ, তাদের। নেশার ঘোরে তাকে হেনস্থা করতে পারে শ্রীবাস্তব। তার কারণে সে সায়েবের কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তা হবে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। সে কী করছে তা জানবে কী করে আর সবাই। দাঁড়িয়েই থাকবে।

মজুমদার দাঁড়িয়ে থাকল। তার শীত করে এল। ভয় করছিল। কিন্তু সে নড়ছিল না। শ্রীবাস্তব খুব রাগী তরুণ। তার কথায় না বলায় এক ডি-গ্রুপ কর্মচারীর গালে চড়। পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে কালেক্টরেটে গোলমাল হয়েছিল, কিন্তু তার কোনো দোষ পায়নি প্রশাসন। ক্ষমতার পাশে ক্ষমতাই থাকে। তা না হলে ক্ষমতাবান দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই কর্মচারী বদলি হয়ে গিয়েছিল দূরের ব্লকে। সোশ্যাল ওয়েল-ফেয়ার অফিসার তানিয়া সেন নিজেই ছোটাছুটি করে বদলি নিয়ে চলে গেছে জেলার বাইরে। শ্রীবাস্তব তার গায়ে হাত দিতে গিয়েছিল। কালেক্টরেটে গুঞ্জন উঠেও থেমে গিয়েছিল।

মজুমদার শুনতে পাচ্ছিল শীৎকার ধ্বনি। ভিতরে তখন শঙ্খ লেগেছে সাপ আর সাপিনীতে। ঝটপট আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল সেগুন কাঠের দরজা ভেদ করে। চাপা কণ্ঠস্বর, নারীকণ্ঠের প্রবল-উল্লাস-ধ্বনি। পৌরুষের রোষ। পুরুষের রোষ মানে অশ্লীল শব্দ। আর সেই শব্দে কল্লোলিত হয়ে উঠছিল যুবতি। তার সুরেলা কণ্ঠেও বেজে উঠছিল পালটা রোষ। মজুমদার বিবাহিত। মজুমদার একটি কন্যার পিতা। মজুমদারের

যৌবন ফুরোয়নি। স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর কথা সে ভাবেওনি কোনোদিন। ভাবতে ভয় করে। তার তখনও নিয়মিত স্ত্রী সংসর্গ হয়। কিন্তু ওভাবে হয় কি? সে তো এক আভ্যাসিক ক্রিয়া। ওভাবে যে হতে পারে তা সে জানল তখনই। সে বিস্মিত হয়ে কাঁপছিল। বড়ো সায়েব, ডি. এম-এর কথা মনে পড়ছিল। পাওয়ার, পাওয়ার ছাড়া জীবনকে এনজয় করা যায় না মজুমদার, শুনছ।

ইয়েস স্যার।

পাওয়ারকে কখনও ফিল করেছ?

নো স্যার।

পাওয়ারকে চিনতে হয়, সে যে চমকে দাঁড়ায় লুকিয়ে বেড়ায়, যায় না তারে ধরা, সোনার হরিণ, সে যে তোমার কাছে ধরা দিয়েছে তা বুঝতেই তোমর জীবন কেটে যাবে।

ইয়েস স্যার।

পাওয়ারকে ধরে রাখতে হয় মজুমদার।

হ্যাঁ স্যার।

তুমি কথা বলছ না কেন মজুমদার?

বলছি তো।

সায়েবের নেশা হলে তাকে পাওয়ারের কথা শোনায়। মজুমদারের মনে হচ্ছিল ক্ষমতার একটা রূপ সে দেখতে পাচ্ছে। বিমূর্ত ক্ষমতার আদল সে আন্দাজ করতে পারছে। ক্ষমতার নানা চেহারা, তার একটির কাছাকাছি হয়ে সে কাঁপছিল। বড়ো সায়েবও এই পাওয়ারকে চেনেনি। ক্ষমতার পৌরুষকে কেউ কোনোদিন ছুঁতেও পারবে বলে সন্দেহ হয়। মজুমদার নিজে তো নয়ই। তার বউটি ভয়ে উন্মাদিনী হয়ে যাবে, কেন্নোর মতো গুটিয়ে যাবে। ক্ষমতাবান ব্যতীত যৌনতাকে উপভোগ করবে কে? উপভোগ করার সাহস হবে কার? রতি রহস্যকেও জানা যায় পাওয়ার দিয়ে। পাওয়ার ব্যতীত যৌনতা ভিজে ব্লটিং। যৌনতা ক্ষমতার অধীন। কামদেব ক্ষমতাশালীর অনুগত। তার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেন। পৃথিবীতে যৌনতাই সেরা পণ্য। যৌনতাই ভোগের শ্রেষ্ঠ উপায়, তা টের পায় মজুমদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সময় গলে গলে পড়ে। ঘড়ির কাঁটা লম্বা হতে হতে বর্শার ফলা হয়ে যায়। মজুমদার দাঁড়িয়ে থাকে।

সেই সময় বনবাংলোর কর্মচারী বুড়োর বুড়ি-বউ বাইরের দীর্ঘ করিডোরের সিঁড়িতে। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল দূর থেকে। সে দরজার গোড়া থেকে সরে এসে বড়ো হলঘরটি পার হয়ে মোটা কার্পেটে নিঃশব্দে হেঁটে বাইরে এল। নেমে গেল সিঁড়ির একটি ধাপে, কপট চোখ রাঙালো, জিজ্ঞেস করল, কী চাই, এখন এখানে কেন, বারণ করিনি?

বুড়ি তার সমস্ত প্রাচীনতা নিয়ে হাঁ করে তাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত, কী এক অবিশ্বাস জেগে উঠল তার ঘোলাটে চোখে। চামড়া কোঁচকানো মুখ ময়লা আঁচলে ঢাকল, তারপর বিনবিনে গলায় বলল, হুজুর, আমার সব্বোনাশ হঁই গিছে, তুমি আস।

মজুমদার নীচে নেমে এল, সব্বোনাশ আর সময় পেলে না, পরে এস, বেরবার সময়।

হুজুর! বুড়ি চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, আমার কী হল!

বড়ো সায়েব-ম্যাডাম রেগে যাবে, পরে এস।

বুড়ি কেঁদে ওঠে বিনবিন শব্দে, বলল, আমার বুড়া থির হয়ে গেল হুজুর, বসে বসেই চোখ বন্ধ করল, হুজুর দেখে যাও।

হাসপাতাল নিয়ে যাও। মজুমদারের গলায় দার্ঢ্য এল। ধমকে উঠল বুড়িকে। সে বুড়ির সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। শোনার মন ছিল না, কান ছিল বাংলোর দরজায়। তাঁদের উল্লাস থেমে গেছে, তৃপ্ত নারী-পুরুষ এখন নিঃশ্বাস ফেলছে ধীরে ধীরে। বেরোনোর সময় হল।

বুড়ি মৃদুস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করল, হুজুর, আমার বুড়া কথা বলছে না। হা ভগবান, বুড়া কথা বলতে বলতে পড়ে গেল মেঝেয়, চোখ খুলছে না।

বাংলোর পিছন দিকে অনেকটা দূরে প্রাচীরের গা ঘেষে তাদের ভাঙাচোরা বাড়ি। আউট-হাউসের মতো। তারা দাঁড়িয়ে বাংলোর সামনে। বাংলোকে বেড় দিয়ে ওদের বসতবাটিতে যেতে হবে। ওদিকটায় অনেক গাছ-গাছালি, পাঁচিলের বাইরে বড়ো একটা শিরিষ গাছ। তার ছায়া পড়ে থাকে বাড়িটির উপর। ছায়া অন্ধকারে বসে থাকে বুড়ো-বুড়ি।

কী হলো সেই বুড়োর? বুড়োই তো বাংলোর দরজা খুলে, ঘর পরিষ্কার করে, মুরগি কেটে রেঁধে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আগের দিন খবর দেওয়া হয়েছিল বিডিওর চৌকিদারকে দিয়ে। সবকিছু সাজানো ছিল। বিছানার চাদর বদলানো ছিল, ঘরে ধুপ জ্বালানো ছিল, জল আর গ্লাস ছিল। সব গুছিয়ে বুড়ো অপেক্ষা করছিল সায়েবদের জন্য। তারা এসে গেলে সায়েব-ম্যাডাম তাদের জন্য রাখা সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে বুড়োই কয়েকবার ঢুকেছে এটা ওটা নিয়ে। তারপর তাকে বলে চলে গেল। বুড়োকে আগেও অনেকবার

দেখেছে মজুমদার। কথা বলে না বিশেষ। এবার তাকে দেখছিল বিস্ময়ের চোখে। বাংলোয় মেম সায়েব আর সায়েবরা ফুর্তির জন্যই আসে। যে ফুর্তি করবে, সে আসে। তবে এই সায়েব কি করতে এল? সে বিড়বিড় করে বলেছিল, মোরে তো চোকিদার কহে নাই।

অবাক হয়ে মজুমদার তাকে দেখছিল, বলেছিল, এই যে বললে চৌকিদার খবর দিয়ে গেছে সকালে।

হুজুরের কথা তো কহে নাই।

কার কথা বলেছিল?

বুড়ো বলেছিল, মে'ছেলে না নিয়ে আসবে হুজুর, মোরে তা বললে আমি গাঁ থেকে আনা করাতাম, বেশি দামও লাগতনি। সব বসে আছে, অভাবী ঘর সব, দুটা পোয়সা হত, ভাত পেত। গাঁয় না খোয়া চঁইলছে বহুত দিন ধরে।

মজুমদার চুপ। বুড়ো তার দিকে ঘুরে তাকাতে তাকাতে নেমে গেল ঘন্টা দুই আগে। ওই সায়েব ম্যাডাম ফুর্তি মারছে, এই সায়েব করবে কী? ফুর্তি যদি না মারবে, এল কেন? ঘরে ফিরে তার বুড়ি বউকে কি ওই কথাই শোনাচ্ছিল? ছোটো সায়েবের জন্য মেয়েছেলে আনতেই পারত সে, ইস কী হলো এটা; একা একা লোকটা বসে থাকবে, আগে বললে অমন হতোনি?

কী বলছ তুমি! মজুমদার তখন টের পায় একটু একটু করে।

হ্যাঁ হজুর, কথা কহিতে কহিতে থির হঁই গেল, হুজুর বুড়াকে দেখবা চলো।

হাসপাতাল নিয়ে যাও।

কী করে নি যাব হুজুর?

ভ্যানট্যান জোগাড় করে নিয়ে যাও।

হুজুর, হাসপাতাল নি যাবার অবস্থা নেই, বুড়ার কী হলো হুজুর।

তখন ডাক এসেছিল শ্রীবাস্তব সায়েবের, মুজুমডার, কাঁহা হ্যায় মুজুমডার?

দূর থেকে মজুমদার দেখতে পেয়েছিল শ্রীবাস্তব সায়েব পাকা প্রশাসকের পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে। জিনস, টি-শার্ট, শ্যু। মুখখানি যেন জলে ধোয়া। কিছুই হয়নি। সে ছুটে গিয়েছিল, ইয়েস স্যার?

গগন শ্রীবাস্তব বলেছি, মুজুমদার, বাংলোর খাট ড্যামেজ হয়ে গেছে, নাজিরখানায় বলে নতুন এনে দিয়ো।

ইয়েস স্যার।

চলো, এবার ফিরতে হোবে।

শ্রীবাস্তবের একটু পর বেরিয়ে এল মিস শ্রেয়া চৌধুরী। তার দিকে চেয়ে হাসে, হাই, হাও ডিড য়্যু এজনয়? নাইস বাংলো, নাইস নাইস, থ্যাঙ্কস জগবন্ধু।

শ্রেয়ার কথায় বিগলিত হাসে মজুমদার। হাত কচলায়। শ্রেয়া তখন বলে, নাইস অফিসার, মোস্ট ওবিডিয়েন্ট। গগন, য়্যু আর লাকি। এমনি অফিসার পেলে কোনো চিন্তা থাকে না। আমি জানতামই না এমন লয়াল অফিসার থাকতে পারে।

শ্রীবাস্তব বলে, মজুমদারকে আমি তৈরি করেছি, তোমার আঙ্কেল ডি.এম. নিয়ে নিয়েছে।

ওক্কে গগন, মজুমদার এবার আমরা ব্যাক করব তো।

ইয়েস ম্যাডাম।

হাঁ মজুমদার, বুড়াটাকে সব মিটিয়ে দিয়েছ? শ্রীবাস্তব জিজ্ঞেস করে।

ইয়েস স্যার।

কুছু বকশিস তো দাও, হান্ড্রেড রুপিজ।

ইয়েস স্যার।

আমিও দেব গগন, পে অ্যানাদার হান্ড্রেড ফর মি। শ্রীবাস্তবের হাত ধরে শ্রেয়া বলল, বুড়োটা বেশ ভালো, গ্র্যান্ড ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার ভাব।

তখন শ্রীবাস্তব বলল, বাংলোর কেয়ার টেকার গ্রান্ড ফাদার হয় নাকি, তোমাকে নিজেকে সকলের থেকে সেপারেট করে নিতে হবে শ্রেয়া। তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তোমার ক্লাস আলাদা। মুজুমডার, টু হান্ড্রেড দিয়ে দিয়ো, আর বলো বটলে কিছুটা ওর জন্য রেখে দিলাম, তিন পেগ হয়ে যাবে, যেমন ছুকছুকে চোখ বুড়ার, বটলে হাত ঘষছিল।

বলল তো বটলে একটু রেখে দিতে, হাউ ফানি, আমি তাই বললাম বুড়ো চেয়েছে থাক একটু। বলে শ্রেয়া হাসল, বাংলোর বুড়োরা এমনি হয় গগন, প্রসাদ পায়।

শ্রীবাস্তব বলল, নাজিরখানা থেকে টাকা নিয়ে নিও মজুমদার।

নাজিরখানা সরকারি কোষাগারের টাকা খরচ করে। এসব খরচ ওখান থেকেই হয়। নানা খাতে খরচ দেখিয়ে এসবের জন্য টাকার জোগান দিতে হয় নাজিরবাবুকে। মজুমদারের কি অজানা এইসব? জেলা শাসকের চা-পাতার দামও দিতে হয় নাজিরখানাকে। স্যারিডন কিংবা অ্যালজোলামের দামও। সে নিজেকে একটু নুইয়ে বলল, "ইয়েস স্যার, স্যার!" তারপর মজুমদার বুড়োর কথাটা বলতে গেল, বুড়ো বোধ হয় ...। বলতে পারল না। সায়েব তখন শ্রেয়া চৌধুরীকে নিয়ে বাংলোর বাইরে রাখা গাড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছে। মজুমদার পার্স থেকে দুশো টাকা বের করে বুড়ির দিকে ছুটল। সায়েবের অভ্যেস সে জানে। সায়েব দেরি করবে না। সায়েবের গাড়ি খুব জোরে ছোটে। এখন তাঁর গাড়িতেই যাবেন মিস চৌধুরী, শহরে ঢোকার আগে তিনি গাড়ি বদল করে মজুমদারের গাড়িতে উঠবেন। মজুমদার তখন গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াবে। মিস চৌধুরী উঠে গেলে সে উঠবে ড্রাইভারের পাশে। শহরের আগের ওই গাড়ি বদলের জায়গা অবধি মজুমদারকে অনুসরণ করতে হবে শ্রীবাস্তব সায়েবে গাড়ি। গগন সায়েবকে হারিয়ে ফেলা চলবে না। কারণ নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছে গগন শ্রীবাস্তব দাঁড়াতে চাইবে না। অপেক্ষা করতে হলে সে মজুমদারের উপরে রেগে যাবে। দরকারে শ্রেয়া চৌধুরীর সামনে খিস্তি করতে আরম্ভ করবে, আরে বুদ্ধু, আমি কি তোমার জন্য ওয়েট করব মুজুমডার, আমার কাজ নেই, ফাইল নিয়ে বসে আছে বড়োবাবু! তুরন্ত আসতে পার না।

বুড়ির হাতে দুশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে মজুমদার ছুটল। বুড়ি তখন কাঁদতে আরম্ভ করেছে, হুজুর, বুড়া মোরে ছেড়ে চলি গেল, হুজুর, বুড়া আর নাই!

তারপর কি হল মজুমদার? আমি জিজ্ঞেস করলাম। অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম মজুমদারের কথায়। সে যেন কনফেশনে বসেছে।

দুশো টাকায় সৎকার হয়ে যাবে, নিস্তব্ধ হয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলল মজুমদার। আচমকা কেঁপে ওঠে সে, টাকাটা বুড়িকে দিয়ে ছুটেছি, পিছনে বুড়ি তখন রোখ ছেড়ে কেঁদে উঠল, এতক্ষণ সায়েবদের ভয়ে কাঁদতে পারছিল না, আমরা বেরোতে তারা যেন বাঁচল। মনে হয়েছিল বুড়োও বোধহয় বাঁচল।

তারপর? এসব কথা আমরা কেউ জানতাম না, কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

মজুমদার বলল, সারাটা পথ আমি কাঁপতে লাগলাম বাসু। সে ছিল ভরা ভাদ্দর, পচা গরম, হাই রোডের পাশে নয়ানজুলিতে পাট পচছে, তার গন্ধ পচা ভাদুরে মেঘের মতো ভেসে আছে শূন্যে। আমি গুটিয়ে পড়ে থাকলাম গাড়ির পিছনে। অর্ধেক পথ যেতে ড্রাইভারকে বললাম, আস্তে চালাতে, আমার ভয় করছিল খুব। বুড়ো মরেছে তা ড্রাইভারও বলল। বয়স্ক ড্রাইভার কতবার কত সায়েব মেমকে নিয়ে বাংলোয় এসেছে। বুড়োকে সে অনেকদিন ধরে চেনে, যৌবনকালে নাকি তার খুব জোশ ছিল, সায়েবদের খুব ফেবারিট ছিল, সাত পেগ খেয়েও টলত না। এক সায়েব ওর জন্য আলাদা বোতল আনত। সায়েব আর ও নেশা করত সন্ধে থেকে। সায়েবটা ভালো ছিল। নেশা করেই ওকে দোস্ত বলত। সেই সায়েবের কথা বুড়ো আজও বলল। সে

ছিল একা মানুষ। কী ভালো মানুষ! ..... ওর বউ বিয়ের আগে কাজ করত আর এক সায়েবের বাংলোয়, সায়েব তাকে নষ্ট করে বুড়োর কাছে দিয়ে গেছিল, সেই থেকে সে বুড়োর বউ। তখন বুড়ো জোয়ান মরদ। এসব কথা ড্রাইভার বলতে বলতে স্টিয়ারিং ধরে ঢিমে তালে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। বলতে বলতে থামে মজুমদার, তারপর আবার বলে, সে যখন নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছয়, গগন শ্রীবাস্তব সায়েব চলে গেছেন শ্রেয়া ম্যামকে নিয়ে, ডি. এম. বাংলোয় পৌঁছে দিয়েছেন। ভার্গব সায়েব ব্লক অফিস ভিজিটে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন শ্রেয়া ম্যাম। প্রোগ্রাম তো সেই রকম ছিল। শ্রেয়া চৌধুরী ইন্টারভিউ-এর জন্য ওইভাবেই তৈরি হচ্ছিলেন।

আমরা দুজনে চুপ। শেষে আমি বললাম, এত ভয় করতে কেন মজুমদার, তুমি তো স্টেট সার্ভিসের অফিসার, ভয়ের কী ছিল?

মজুমদার বলল, ভয়টা পারিবারিক, জেনেটিক বলা যায়। তুমি আমাকে একটা গল্প বলেছিলে, বিদেশি লেখকের, সেই এক কেরানি, কী যেন নাম?

ডেথ অফ এ ক্লার্ক, আন্তন চেখভের গল্প।

আমি ওই রকম ভয় পেতাম বাসু। আর বুঝেছিলাম, আমি ওই ভাবেই পাওয়ারের ছিটেফোঁটা পাব, নীচ থেকে উঠেছি প্রোমোশনে প্রোমোশনে, ওর কোনো দাম ছিল না সায়েবদের কাছে। তারা অবিশ্যি সবসময় প্রকৃত চাকর খুঁজত, যত খারাপ কাজ, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বাসন মাজা, টয়লেট সাফাই — সব প্রমোটিরা করবে। আমি ভয় করতাম যেমন, ভক্তিও করতাম। জানতাম, গভর্মেন্ট সার্ভেন্ট আসলে সায়েবদের সার্ভেন্ট, দেখেছি ভয় থেকেই আসে ভক্তি।

ভয়ে ভক্তিতে নার্সিং হোমে ঢুকে গেলে?

আমি সেদিন সারারাত প্রায় ঘুমোইনি বাসু। বুড়োটা আচমকা মরল, তখন ওরা দুজন বাংলোর পুরোনো খাট ভাঙছে ভীষণ আনন্দে, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। চুপ করল মজুমদার। তারপর নিম্ন স্বরে বলল, রাতভর বুড়ো আমার পাতলা ঘুমের ভিতর হানা দিতে লাগল। বুড়ো হাত কচলে কচলে বলছে, আগে যদি সে জানত হুজুর একা, সে গাঁ থেকে হুজুরের পছন্দমতো নিয়ে আসত কাউকে, ভাদ্দর মাসে অভাব খুব, তারা আসবে বলে বসে আছে। সে বুড়ো হয়েছে, তার যৌবনকালে সায়েবের এঁটো হতে পারলে ভাগ্য ফিরে যেত, পছন্দ হলে সায়েব তার কোয়ার্টারে কাজে বহাল করত, পরে গরমেন তার চাকরি দিত। আমি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বাসু, ভয় করছিল কেন তা বলতে পারব না আমি, মনে হচ্ছিল আমি তলিয়ে যাচ্ছি। ভোর রাতে আমার জ্বর এল, মাথা ছিঁড়ে যেতে লাগল।

আমরা ভেবেছিলাম তুমি বড়ো সায়েবের ভয়ে নার্সিং হোমে অ্যাডমিশন নিলে।

না, বুড়োটার ভয়ে।

সুনন্দা উপর থেকে নেমে এল, বলল, বউমা অন লাইন হয়েছিল, অনেক ফোটো পোস্ট করেছে নেটে, নায়াগ্রা গেছিল ওরা।

মজুমদার বলল, কতদিন বাদে দেখা হল ম্যাডাম বউদি, আপনারা খুব ভালো।

কেন? সুনন্দা শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে।

সে আমি জানি, তা আপনি কি তারপর থেকে বাড়িতে বসে গেলেন ম্যাডাম?

সুনন্দা কথা এড়িয়ে গিয়ে বলল, মেয়েদের বাড়িই ভালো, বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যাবে তারা মজুমদারদা?

আমি একটু কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কেন এসেছ মজুমদার, স্রেফ আড্ডা দিতে কি তুমি এলে, আড্ডা কোনোদিন দিয়েছ বলে তো মনে পড়ে না। সব সময় সায়েবদের গা ঘেষে ঘেষে থাকতে, সক্কাল থেকে তোমার ডিউটি শুরু হতো। সায়েবের অনুগ্রহ পেতে তোমাকে ধরত সবাই। তোমার পাওয়ারও কম ছিল না।

কথাটা গায়ে মাখে না মজুমদার। তার মুখে অচিনপুরের সেই নির্লিপ্ত হাসি দেখলাম। বলল, পাওয়ার কে না পেতে চায় বাসু, কথাটা তা নয়, আমি তোমাদের ইনভাইট করতে এসেছি, আমরা একটা জমায়েত করব, রি-ইউনিয়ন বলতে পার বাসু। যারা ছিল অচিনপুরে, নাইনটিন নাইনটি টু থেকে নাইনটি সিক্স, তাদের ডাকছি সকলকে। আমাদের স্যার এম. পি. হয়েছেন।

স্যার মানে কোন স্যার?

হেডস্যার! মৃদু হাসে মজুমদার, বলে, লোকনাথ মল্লিক স্যার, বড়ো সায়েব, রিটায়ারমেন্টের পর রাজনীতিতে নেমেছেন। দ্যাখো বাসু, আসল পাওয়ার কিন্তু অন্যখানে, রাজনীতিতে। আমলারা ভাবে তাদের কাছে। আসলে তা মন্ত্রীদের কাছে, এম.এল.এ, এম.পি.-র কাছে, স্যার তা রিয়ালাইজ করেছেন।

তাঁরা কোথা থেকে ক্ষমতা পান? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কেন জনগণের কাছ থেকে, মজুমদার বলে।

সব ক্ষমতা তাহলে জনগণের? বিপুল ক্ষমতা!

হুঁ। সংক্ষিপ্ত মত প্রকাশ করল মজুমদার।

জনগণের উপরই তো রোলার চালানো হয় মজুমদার, তাদের কি সত্যিই ক্ষমতা আছে?

মজুমদার মাথা চুলকোতে লাগল, বলল, জানি না, আশ্চর্য, আমি কেন এটা জানি না।

আমিও জানি না, মনে হয় অস্ত্র যার হাতে তার হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা। আমি বললাম।

এ তো সাধারণ কথা। বিড়বিড় করল মজুমদার, কিন্তু ধরতে পারলাম না কিছুই।

হুঁ, আমি চুপ করে থাকলাম, তারপর বললাম, মল্লিক সায়েব ব্যুরোক্র্যাটদের কথা বলতেন, তারা ক্ষমতার অধীশ্বর হবে। কিন্তু তিনি তো এম.পি-র কথায় উঠতেন বসতেন, জানো তা?

জানি, তিনি খুব পাওয়ারফুল ছিলেন। এখন শয্যাশায়ী। একা। কেউ তাঁর কাছে যায় না শুনেছি। পার্টিও ত্যাগ করেছে প্রায়, পার্টির বিরুদ্ধে বলেছিলেন।

তাহলে কী হল? আমি অস্ফুট গলায় বললাম।

জানি না, ক্ষমতা কারোর কাছে চিরজীবনের জন্য থাকে না জমি বাড়ির মতো। কেউ কেউ চেষ্টা করেন তা রেখে দিতে, হয় না। পার্টিও তো পারে না শেষ অবধি, দেখলাম তো, তিন দশকের ক্ষমতা চলে গেল। বলল মজুমদার।

তাহলে কি ক্ষমতা সাধারণ মানুষের? আমি বললাম।

ওসব জানি না, তাহলে আমার বাবা কেন ঘাড় ধাক্কা খেয়ে বাড়ি এসে অপমানে বিষ খাবেন। ওসব থাক, আমরা স্যারকে সংবর্ধনা দেব। তিনি আবার পাওয়ারফুল হয়ে উঠেছেন। ম্যাডাম বউদিকে গান গাইতে হবে। জানি না উনি এখনও গান করেন কিনা।

আমি চুপ করে গেলাম। পরিবেশ থম থমে হয়ে উঠতে লাগল তা টের পেলাম। আমার মাথার দপদপানি শুরু হয়ে গেল বুঝি। আচমকা মনে হল মজুমদারকে বলি চলে যেতে। তোমার সেই কর্তাভজা অভ্যেস এখনো গেল না মজুমদার? তুমি তোমার মল্লিক সায়েবের বেডরুম পাহারা দাও গিয়ে, আমাদের, আমাদের মতো থাকতে দাও। চাকরি শেষ হয়ে গেছে, এখন ওই লোকনাথ মল্লিক আমার কাছে কে? হু ইজ হি? তিনি কে মজুমদার?

আরে আমাদের বস মল্লিক সায়েব, ডি. এম. তাঁকে আমরা সংবর্ধনা দেব।

আমার মনে পড়ছে না মজুমদার। নির্লিপ্ত স্বরে বললাম।

হা হা করে হাসল মজুমদার। বলল, কী দারুণ বললে বাসু, অচিনপুরকে ভুলে গেলে! এতক্ষণ যে গল্পটি শুনলে, সেই অচিনপুর।

ও আচ্ছা, আমি কেন যাব, আমার কী ইন্টারেস্ট?

মজুমদার একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর দম নিয়ে বলে, বাসু, তোমাদের উপর ইনজাস্টিস হয়েছিল। কিন্তু জীবনে কতরকম ইনজাস্টিসকে ফেস করতে হয়। ভুলে যাও বাসু, ভুলে যাও, আসলে তোমার কিছুই ক্ষতি হয়নি বাসু।

তুমি কী করে এলে মজুমদার, সব ভুলে গেছ?

মজুমদার বলল, আমি কিছুই ভুলিনি বাসু। আমি স্যারকে কথা দিয়েছি বাসু।

এই সেই পুরোনো মজুমদার। সামান্য আলাদা লাগছিল, কিন্তু আলাদা নয়। সময় গেলে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। মজুমদার বদলায়নি। সে রিটায়ার করে গেছে। কিন্তু অভ্যেসটি আগের মতো রয়েছে। ক্ষমতাকে কুর্নিশ করতে ভালোবাসে মজুমদার। সায়েব লোকনাথ মল্লিক পাওয়ার থেকে সরে গিয়ে আবার পাওয়ারে ফিরেছেন, মজুমদার কি তাঁর ছায়ায় যেতে চাইবে না? মজুমদার বলছে, দ্যাখো বাসু, পাওয়ার কিন্তু রাজনীতিকদের হাতেই। স্যার যা বলতেন, ব্যুরোক্র্যাটরা একদিন সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নেবে, তারাই কন্ট্রোল করবে সব ....।

আমি হাত তুললাম। থাক মজুমদার, আমি তো পাওয়ারের বাইরে আছি, আমার ওসবে কোনো কৌতুহল নেই।

মজুমদার বলল, আসলে সেটাই হবে। যত বেশি ব্যুরোক্র্যাট রাজনীতিতে আসবে, তত বেশি ক্ষমতা যাবে ব্যুরোক্রেসির হাতে।

তুমি যাই বলো, এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

মজুমদার বলল, ব্যুরোক্রেসিই কন্ট্রোল করবে রাজনীতিকে। তারা ধীরে ধীরে সব ক্ষমতা নিয়ে নেবে।

থাক না মজুমদার।

বাসু, তিনি তোমাদের কমপেনসেট করতে চান, শুভময় সেন লোকটার খোঁজ জানো?

আমি মাথা নাড়ি। তারপর বলি, শোনো মজুমদার, আমরা তো চাই না, আমরা ক্ষতিপূরণের জন্য ধর্ণা দিইনি।

মজুমদার হাসল। চুপ করে থাকল, তারপর বলল, শুভময় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, তুমি জান না?

না। আমি বললাম, ওকে রেখে চলে আসি কলকাতার পাশে, আমিই তো আগে বদলি হলাম।

মজুমদার বলল, কট রেড হ্যান্ডেড, হাতে নাতে ধরা পড়েছিল সেন।

তার মানে?

আমি জানতাম অমনি কিছু হবে, মল্লিক সায়েব সব জানতেন।

কী জানতেন? আমি অবাক হচ্ছিলাম, কত কথা বয়ে এনেছে মজুমদার। শুভময় সেন একটু বেশি বলত। তার হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব ফাইল সরে গিয়েছিল। শুভময় বসে খবরের কাগজ পড়ত আর নিন্দা করত জেলা শাসকের। তাঁর সান্ধ্য-সভাতেও যেত না। মজুমদারের সামনেই মল্লিক সায়েবের সমালোচনা করত। নাজিরখানা তার বাজার করে দেয়, রোজগার কী করতে করে এইসব আমলারা? সব চেটেপুটে খেয়ে নেবে। দেশটাকে ওরাই শেষ করছে। আমিও পরের দিকে এড়িয়ে যেতাম ওকে। ভয় করত। শুভময়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নেবে না তো মজুমদার? আমি ছিলাম ভীরু প্রকৃতির। এখনও তাই।

৬

মজুমদার বলল, সায়েব ওকে ফাঁদে ফেলে ধরেছিল, একেবারে কালেক্টরেটের ভিতরে। একহাজার টাকা ঘুষ নিচ্ছিল শুভময় সেন, নোটে সায়েবের স্বাক্ষর ছিল।

হয় না, আমি এটা বিশ্বাস করি না।

হয়েছিল, ওকে গান লাইসেন্স দপ্তর দেওয়া হয়েছিল, আসলে ও ছিল ডিজ-অনেস্ট।

বিশ্বাস করি না। আমি বললাম।

মানুষকে চেনা যায় না বাসু। মজুমদার বলল।

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, ও আলাদা ছিল।

আলাদা তো ছিলই, ও সাসপেন্ড হল। পরে চাকরি ফিরেও পায়, তার জন্য মল্লিক সায়েবকেই ধরতে হয়েছিল। তুমি এসব জান না?

না জানি না।

না জানাটাই তো অদ্ভুত! বলল মজুমদার। তবে মল্লিক সায়েবই বিষয়টা গোপন করে দিয়েছিলেন। সেন ওয়াজ দ্য পার্ট অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তিনি প্রশাসক, তিনি ব্যাপারটা মিটিয়ে দেন। ২৪ ঘন্টা জেল কাস্টডিতে থাকতে হয়েছিল তাকে, তারপর তিনদিন পুলিশ কাস্টডি, তারপর জামিন। জামিন পেয়ে সে অচিনপুর ছাড়ে এক ভোরে, আর ফেরেনি।

আমি অবাক হচ্ছিলাম। কিছুই জানি না! সেনকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল লোকনাথ মল্লিক। মনে পড়ল সায়েবের মুখের ক্রূরতা। সেই ডেভেলপমেন্ট মিটিং, সুবিমলের রিপোর্ট, অনাহার নিয়ে আলোচনা। ক্ষিপ্ত মল্লিক সায়েব বলছিলেন, চাকরি কারও ফানডামেন্টাল রাইট নয়, খেয়ে নিতে কতক্ষণ। ইউ, বাসু, সাবধান হও, আমি কী পারি তা তুমি জান না, সবাই জেনে রাখো, তোমরা সরকারের লোক, সরকার বিপদে পড়ে এমন কোনো কিছু হলে শেষ করে দেব।

শুভময় সেন মন্তব্য করেছিল, কত তোর ক্ষমতা দেখি না। লিখেছিল চিরকুটে, আমাকে দিয়েছিল। সেই শুভময়কে জেল খাটিয়ে নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল লোকনাথ মল্লিক। তার দাদা এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল, শুনে স্তম্ভিত হয়েছিল। বিশ্বাস করেনি শুভময় ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়তে পারে। কেন নেবে ঘুষ, তার কোনো আকর্ষণই ছিল না টাকা পয়সায়। কতজনকে সাহায্য করে তাও বলে গেল। ধার নিয়ে কতজন তার টাকা মেরে দিয়েছে, তাও বলল। বলে গেল নির্মম জেলা শাসক ওর জীবন শেষ করে দিয়েছে।

তোমাকে বলে গিয়েছিল? আমি মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে নির্লিপ্ত গলায় বলল, হ্যাঁ।

তুমি কী বলেছিলে?

মজুমদার বলল, শুনেছিলাম সে বাড়ি ফিরেছিল, কিন্তু সার্ভিসে আর আসেনি।

না না, তুমি কী বলেছিলে?

কিছুই না, শুনেছিলাম কথাগুলো।

তুমি কি মনে করো কাজটা ঠিক হয়েছিল?

ও থামছিল না। ওকে থামানোর দরকার ছিল। সায়েবের ক্ষমতাটা শো করার দরকার ছিল। ও প্রশাসনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। আর ও তো সত্যিই টাকাটা নিয়েছিল, ওর ড্রয়ারে পাওয়া গিয়েছিল।

সুনন্দা উঠে গেছে অনেক সময়। বিরক্ত হয়েছে। আবার সেই অচিনপুর! মজুমদারকে দেখে চঞ্চল হয়েছে সে। তার মনের ভিতরে হয়তো পুরোনো অপমানের স্মৃতি ফিরে আসছে। মজুমদার এসে ঠিক করেনি। সুনন্দার গানের গলা ছিল। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি। আমি জেলায় জেলায় চাকরি করেছি, সেখানে গানটা নতুন করে শেখা হয়নি, অফিসারদের নানা জমায়েতে গান গেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ওকে। সবাই বলত, বাহ, দারুণ, আপনি আপনার গান নিয়ে অনেকদূর যাবেন। জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের যে জগৎ গড়ে ওঠে, সেখানে আমার বউ সুনন্দা বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছিল। গান তাকে করতেই হত। বাড়িতে কেউ এলেও গান শোনাতে হত তাকে। ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে তার গান

বাধা। রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তীতে সুনন্দা ব্যতীত ছোটো শহরটিতে চলে না। গান শেখাতও রবিবারে। কত অনুরোধ, উপরোধে যে হার্মোনিয়ম নিয়ে বসতে হত তাকে, গাইতে হতো ''আজি যত তারা তব আকাশে ....'', সেই সময়টা আমাদের ভালো কেটেছিল অনেকদিন। আমাদের ছেলের তখন তিন বছর বয়স। তাকে ভর্তি করা হয়েছিল সেই জেলা শহরের এক নার্সারি ইস্কুলে। অফিসের গাড়ি তাকে নিয়ে যেত, ফিরিয়ে আনত। সুনন্দাও যেত ছেলের সঙ্গে ওই ইস্কুলে। সে একটা চাকরি নিয়েছিল। তাকে খুশি করার লোকের অভাব হত না তখন। আমার হাতে এমন সব দপ্তরের ভার ছিল যে সবাই আমাকে খুশি করতে চাইত। ক্ষমতার একটা রং আছে, সেই রঙে সুখ আছে, সেই সুখ আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু তা চলেও যায় লোকনাথ মল্লিক জেলাশাসক হয়ে এলে। আমার ক্ষতি করে দিল সাংবাদিক বন্ধু সুবিমল।

নতুন জেলা শাসক মল্লিক সায়েবের বউ গান জানেন, রবীন্দ্র সংগীত শিখেছেন নাকি খোদ শান্তিনিকেতনে, তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্রী, এসব খবর রটে যেতে দেরি হল না। মজুমদার নিজেই সেই কথা বলতে লাগল সবাইকে। আমাকেও বলল, খোদ শান্তিনিকেতনে শেখা, তা কি সুনন্দা বউদির মতো হবে? সকলের সামনেই কথাটা বলতে লাগল। ম্যাডামের ক্যাসেট বের করবার জন্য তিনটে কোম্পানি ঘুরছে। দূরদর্শনে তিনি কতবার গেয়েছেন। আকাশবাণীতেও।

মজুমদার জানত ক্ষমতার দরজা কোনদিকে। কোন পথে গেলে ক্ষমতার ছায়ায় দাঁড়াতে পারবে সে? তখন সেও ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পাবে। সে তার ডিউটি আওয়ার্স বদলে নিয়েছিল নতুন ডি.এম. আসতেই। সকালে বাজার করে বাংলোয় হাজির হত। নীচে বসে থাকত। সায়েব বা মেম সায়েব কখন ডাকবেন। সকাল আটটা থেকে রাজ আটটা পর্যন্ত ছিল তার ডিউটি আওয়ার্স। বাংলোর অফিসে মজুমদার পড়ে থাকত। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সুবিধে-অসুবিধে দেখত। লোকে বলত মজুমদার এমনই ছিল কর্তাভজা, যে বললে সে কর্তা গিন্নির জামাকাপড় কেচে দিতেও পারে। কিন্তু কেন, মজুমদার কী পেয়েছিল এর পরিবর্তে? পেয়েছিল অপরিমেয় ক্ষমতা। সে অসন্তুস্ট হলে জেলা শাসকও অসন্তুষ্ট হবেন, এটা আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। জেলা শাসকের অনুগ্রহ পেতে সে ছিল সবচেয়ে বড়ো খুঁটি।

নতুন জেলা শাসকের বউ শান্তিনিকেতন ফেরত এ কথা জানার পর মজুমদার সুনন্দাকে বাদ দিয়ে দিল আগের জেলা শাসকের ফেয়ারওয়েলে তার গানের পর। সেখানে নতুন জেলা শাসক লোকনাথ মল্লিকের স্ত্রীও ছিলেন। তিনি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান। তারপর সুনন্দা। সুনন্দার গলায় মধু। আগের জেলা শাসক কী প্রশংসাই না করে বিদায় নিলেন জেলা থেকে। তাতে মল্লিক সায়েবের স্ত্রী একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সুনন্দা তো গেয়েই যাচ্ছিল। মল্লিক সায়েবের স্ত্রী তাকে পছন্দ করত না এটাও জানি। কিন্তু আমার বন্ধু সাংবাদিক সুবিমল রায় যখন জেলায় অনাহারে মৃত্যুর রিপোর্ট করল, আমি এবং সুনন্দা জেলা শাসক ও তাঁর স্ত্রী বিষ নজরে পড়ি। বড়ো সায়েব পছন্দ করেন না, তাই মজুমদারও অপছন্দ করতে লাগল। জেলা উৎসব

থেকে বাদ গেল সুনন্দা। মজুমদার জেলা শাসক ও তাঁর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে কোনো কিছু করতেই পিছপা হত না। এই ঘটনা শ্রেয়া চৌধুরীর ঘটনার পরে ঘটে। জেলা উৎসবে সুনন্দা ডাক না পেয়ে অবাক। আমি মজুমদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মজুমদার বলেছিল, সেই স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছতে পারেনি সুনন্দা।

কোন স্ট্যান্ডার্ড?

আরে ম্যাডামের ক্যাসেট বেরিয়ে গেছে, টিভিতে তাঁর গান দেখায়, উনি তো সিলেক্টর।

কিন্তু ওর গানের গলা তো ভালো না।

কে বলল ভালো না, সবাই বলছে দারুণ, সুচিত্রা মিত্রর মতো।

দেখ মজুমদার, ওঁর গানে ভুল থাকে অনেক, আমার যেন রোখ চেপে গিয়েছিল।

মজুমদার দলল, তুমি ভুল ধরতে পার?

সুনন্দাই বলে।

তোমার বউ গান জানে? নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করে মজুমদার।

তোমার কি মনে হয়? রাগ চেপে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

দ্যাখো অচিনপুর উৎসব কোনো পাড়ার ফাংশন নয় যে এলি-তেলি সবাইকে স্টেজে তুলে দেওয়া হবে। বাইরে থেকে কত লোক আসবে তখন। বদনাম হয়ে যাবে। বড়ো ম্যাম সমস্ত প্রোগ্রাম তৈরি করছেন, উনি যা বলবেন তাই হবে।

বড়ো ম্যাম গাইবেন?

সে উনি জানেন। উনি তো নিজেকে রাখেননি। এম.পি., এম.এল.এ, সবাই বলল, কী করবেন উনি, তারাই বলেছে ওঁকে গাইতে হবেই, সত্যিই তো, ওঁর শিল্পী সত্তা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই, এম.পি. ওঁকে দিল্লিতে বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে নিয়ে যাবেন, মার্চের এন্ডে।

সেদিন দেখেছিলাম মজুমদারের চেহারা। যেন আমাকে আর সুনন্দাকে অপমান করতেই আমার চেম্বারে এসেছিল সে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ধীরে ধীরে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল সে। কী রকম অনায়াস ছিল তার উচ্চারণ। বলছিল সে অনেক চেষ্টা করেছিল সুনন্দাকে রাখতে, হতেও পারে যদি সুনন্দা একবার মিসেস মল্লিকের কাছে যায়। একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ওঁর হাতে দেয়। লোকাল আর্টিস্টদের জন্য দুপুরে একটা স্লট রাখার কথা ভাবা হচ্ছে।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ মজুমদার, থাক এসব কথা।

মজুমদার বলেছিল, তুমি মিসেসকে বলো বড়ো ম্যামের কাছে যেতে, আমিই নিয়ে যাব।

খুব অপমানিত লেগেছিল। আমি বলেছিলাম, ধন্যবাদ মজুমদার, কোনো প্রয়োজন নেই।

যাবে না!

না। আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, থাক এসব কথা।

উনি চাইছেন সুনন্দা বাসু ওঁকে রিকোয়েস্ট করুন।

চাইলে তো হবে না, সে যাবে না।

ম্যাম ডাকলে তো যেতে হবে বাসু।

কেন বলো দেখি?

মজুমদার বলল, তোমার প্রয়োজনেই তোমার বউকে ম্যামের কাছে যেতে বলো।

কী প্রয়োজন? আমি বিস্মিত হয়েছি।

তুমি কি জান না?

কী জানব? আমি আরো অবাক।

তোমার বিরুদ্ধে সার্ভিস রুল ব্রেকের চার্জ আসছে, তুমি জান না?

না, আমি কী করলাম?

মজুমদার বলল, তুমি ডি. এম. স্যারের কাছে যাও।

কী হয়েছে পরিষ্কার করে বলো দেখি।

তুমি কী সব মিথ্যে রিপোর্ট দিয়েছিলে তোমার রিপোর্টার বন্ধুকে, অনাহার কেস।

আমি! কে বলল?

তুমিই তো তাকে বড়ো সায়েবের কাছে নিয়ে এসেছিলে, সে বলে গিয়েছিল যা যা জানার সব জেনে নেবে তোমার কাছ থেকে। এনকোয়্যারি হয়েছে, অনাহারের মতো কোনো ঘটনা এখানে নেই, গাড়ির লগ বুক বলছে তুমি ওই মার্চে ধুলোপাড়ায় গিয়েছিলে, সঙ্গে ছিল তোমার ওই বন্ধু।

বুঝতে পারছিলাম সুবিমলের রিপোর্ট আমাকে বিপদে ফেলেছে। ঘটনা সত্যি। সুমিবলকে আমি ঘুরতে নিয়ে গেছিলাম সরকারি গাড়িতে করে। এটা তো হয়েই থাকে। সে ধুলোপাড়ায় যেতে চেয়েছিল। ট্রাইবাল গ্রাম দেখবে। তারিখ উল্লেখ ছিল তার প্রতিবেদনে। গাড়ির লগ বুকের সঙ্গে মিলে গেছে সেই তারিখ। অস্বীকারের কোনো জায়গা নেই।

মনে হয়েছিল, মজুমদার ওই কথা নিয়েই এসেছে আমার কাছে। সুনন্দার বাদ যাওয়া ওই কারণে। মজুমদার চাইছে আমি ডি. এমের কাছে গিয়ে মার্জনা চেয়ে আসি। চিঠি বেরনোর আগে তা হলে হয়তো আমি বেঁচে যাব। সে ব্যবস্থা মজুমদার করবে। রিপোর্টার বন্ধুই তোমাকে ফাঁসিয়েছে বাসু, ওরা জীবনে এই রকম ক্ষমতার অলিন্দে আসতে পারবে না, তাই যত রাগ সরকারি চাকুরেদের উপর। সত্য-মিথ্যায় তাদের ফাঁসায়।

কথাটা অসত্য নয়। সুবিমল আমাকে বলেওনি অথচ লিখে দিল, সে ওটা ঠিক করেনি। আমার চাকরিকে সুবিমল কি ঈর্ষা করেছিল? লিখবে ওই খবর তা আমাকে জানায়নি কেন? জানালে আমি ওকে ডি. এমের কাছে নিয়ে যেতাম না। কিন্তু পাওয়ারের সঙ্গে লড়ার সাধ্য কি সুবিমলের আছে? রিপোর্ট হল, কদিন হৈ হৈ হল, জেলাশাসক মিটিঙে বললেন, সরকারি তথ্য যিনি দিয়েছেন, তার চাকরির বারোটা বাজিয়ে দেবেন তিনি। তাঁর কী রোষ সেই ডেভলপমেন্ট মিটিঙে। আমার অ্যানুয়াল কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে চাকরির ক্ষতি তিনি করেছিলেন। চার্জশিট তৈরি হয়েছিল, শেষে দুটো ইনক্রিমেন্ট বাদ গেছিল। আমার বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ আনা হয়েছিল। জেলা থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলাম আমি। অনেকদিন লেগেছিল প্রশাসনের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে। আর সেই অনাহারের রিপোর্ট মিথ্যে বলে প্রশাসন জবাব দিয়েছিল। এনক্যোয়ারি করেছিল মজুমদার। বড়ো সায়েব যেমন চেয়েছিল সে তেমন রিপোর্ট দিয়েছিল।

৭

মনে আছে এরপর সুনন্দা মরমে মরে থাকল। সে আর কোথাও যেত না। জেলা উৎসব থেকে বাদ যাওয়া তাকে দমিয়ে দিয়েছিল। সে আর আমাদের অফিসার্স ক্লাবে কখনও গান গাইতে যায়নি। জেলা মেলায় বাদ, জেলা শাসকের বউ তার মধু মাখা গান পছন্দ করেন না, তা জেনে তার গানের অনুরাগীর সংখ্যাও কমতে লাগল একটু একটু করে। যতদিন ছিলাম এরপর আমার হাত থেকেও চলে যেতে লাগল ক্ষমতার দায়িত্বগুলি।

মজুমদারকে আমি বললাম, সে তো নিজের জন্য গাইত।

ওঁকে গাইতে হবে এবার, কী চমৎকার গলা ওঁর, মল্লিক সায়েব খুব পছন্দ করতেন ওঁর গান। অম্লান মুখে বলল মজুমদার। সে পুরোনো কথা সব ভুলে গেছে। বলছে, সায়েবরা হলেন গার্জেন, তাঁদের কথা

মতো চললে কোনো অসুবিধা হয় না।

আমি বললাম, অচিনপুর থেকে আসার পর সুনন্দা আর কখনও কোথাও গান শোনায় না।

তা বললে হবে দাদা? সব কথা মনে রাখতে নেই। বউদি তো আসলে ভালো গাইতেন। মল্লিক সায়েব বলেছেন ওঁর কথা। তিনি বউদিকে মনে রেখেছেন এখনো, অচিনপুর বলতেই বড়ো ম্যাডামের গান, তারপর বউদির গান, আপনার বক্তৃতা, অনিকেত সান্যালের আবৃত্তি, প্রবীর রায়ের অভিনয়, সব মনে রেখেছেন। আমরা ওকে সংবর্ধনা দেব শুনে কী খুশি। বলেছেন সবাইকে হাজির করতে, প্রবীর রায় বেঁচে নেই শুনে কী দুঃখ করতে লাগলেন, গ্রেট ম্যান উনি, না হলে আমাদের কথা এমনভাবে মনে রাখতে পারেন।

সুনন্দা নেমে এল চা নিয়ে। বসল হাসি মুখে, তারপর প্রস্তাব শুনে বলল, স্যরি, মজুমদারদা, আমি গান ছেড়ে দিয়েছি, এখন যা হবে সব বেসুরো।

তাই-ই হবে ম্যাম, আপনি বেসুরো গাইতে পারেন না। সম্বোধন বারবার বদলে দিচ্ছে মজুমদার। আমার মনে পড়ছে সুনন্দাকে জেলা উৎসব থেকে বাদ দিয়ে মজুমদারের সেই ভঙ্গী। সব ভুলে গেছে মজুমদার। সায়েব আমার চাকরির ক্ষতি করে দিলেন তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাও! সে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। ডি.এম. যেমন বলেছিল ঠিক তেমন লিখেছিল। কী করে এল মজুমদার এই কথা নিয়ে? কী রকম নিষ্পাপ মুখ ওর! যেন অতীতে কিছুই হয়নি।

আমি তো জানি কী হবে, আপনারা আর কাউকে ঠিক করুন। সুনন্দা তীক্ষ্ণ গলায় বলল।

ঠিক তো হয়েই গেছে, লোকনাথ মল্লিক সায়েবই বলে দিয়েছেন, উনি এম. পি. ওঁর ইচ্ছাই তো শেষ কথা।

সুনন্দা বলল, না কত বড়ো বড়ো গায়ক আছেন, উনি বললেই তাঁরা চলে আসবেন।

সে তো জানি ম্যাম, কতজন ওঁর কাছে ঘুরঘুর করে, এই যে বিদেশে বঙ্গ-উৎসব হয়, উনি প্রায় সবকটির অ্যাডভাইসার, শুধু কি সিঙ্গার, রাইটার, অ্যাক্টর, সবাই ওঁর কাছে অবলাইজড, সকলে ওঁর পিছু পিছু ঘোরে। আর উনি যে কতজনকে বিদেশ ঘুরিয়ে এনেছেন।

আমার সে লোভ নেই মিঃ মজুমদার। সুনন্দার সম্বোধন বদলে গেল।

মজুমদারের উপর সন্তুষ্ট ছিল না সুনন্দা। অচিনপুরে কথা এখনো মনে পুষে রেখেছে। জেলা উৎসব থেকে বাদ দিয়ে এই লোকটা কী অনায়াসে বলে দিয়েছিল, হার হাইনেস শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করা, গানও ওখানে শেখা, তাঁর ডিসিশনই ফাইনাল, লিস্ট তিনি করেছেন,তার মতো কে পারবে? কেউ না। ডি.এম-এর বউকে যে হার হাইনেস বলতে হয় তা মজুমদারই জানিয়েছিল প্রথম। মিসেস মল্লিকের গাওয়া গানে

রবীন্দ্রনাথের বাণীর ভুল পরিবেশন হচ্ছে, সুনন্দার তা বলা ঠিক হয়নি মজুমদারের কাছে। মজুমদার তা বলে দিয়েছিল বড়ো ম্যামের কাছে। বলে আরো বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল জেলা শাসকের স্ত্রী কাছে। জেলা শাসকের কাছেও। তার ক্ষমতাও বাড়ল তখন। হাঁটা চলা বদলে গেল, হাতে মাথা কাটতে পারত সে তখন। নানাজনকে নানা উপদেশ দিত, চাকরি কী ভাবে করতে হয় তা মজুমদার দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি ওকে এড়িয়ে চলতাম।

কিন্তু এই মজুমদারই তো অনেকদিন পরে আমার জমি পাওয়ায় সুবিধে করে দিয়েছিল। বলেছিল, দেখ বাসু, বেঁচে থাকা একটা লড়াই, কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেয় না, আমি যা করেছি, প্রয়োজনে করেছি, এখনো তাই-ই করছি, হ্যাঁ, তোমার জমি আমি বের করে দেব, বিনিময়ে কিছুই নেব না। সব হল বউদির জন্য, উনি অচিনপুর থেকে মন খারাপ করে ফিরেছিলেন। মজুমদার দুঃখ প্রকাশ করেছিল, যা হয়েছিল সব ভুলে যাও।

একটা জীবন। ব্যাপ্তি এর বছর পঁয়তিরিশ, চাকরি জীবন তো ওইটুকুই। জীবন ভোগের সময়ও ওইটুকু। এই সময়েই যত ক্ষমতা, আর সেই ক্ষমতার নানারকম রূপ আস্বাদ। প্রয়োজনে ব্যবহার। জেলায় জেলায় ভ্রমণ। সম্পদ অর্জন, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া — সব।

মজুমদার বলল, ওটা আমার অভ্যাস ছিল ম্যাম, আমি আমার বসকে সন্তুষ্ট করতে সব কিছু করতে পারি, করা উচিৎ। করলে সার্ভিস লাইফ ভালো হয়, আপনি চলুন। স্যার সকলকে সস্ত্রীক যেতে বলেছেন, খুব খুশি হবেন স্যার।

উনি কি এখনও আপনার বস?

বলতেই পারেন ম্যাম, বস তো বসই, এখন তিনি এম. পি. মোর পাওয়ারফুল।

ওঁর চাকরির ক্ষতিও করে দিয়েছিলেন, সব কথা কি ভোলা যায়!

সে বাদ দিন, দায়ী সেই রিপোর্টার।

স্যরি আমি যেতে পারছি না, আমার গান আমার ছেলের জন্য, বউমার জন্য, গান গেয়ে গেয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতাম। এখন তারা বিদেশে, আমার কিছুই ভালো লাগে না। কবে আমার নাতনিকে ঘুম পাড়ার গান গেয়ে গেয়ে, সেই দিন গুনছি।

সুনন্দা গেল না। আমাকে যেতে হল মজুমদারের জন্য। গেলাম কৌতূহলে। আমার বস তো উনি এখন নন। দেখা যাক। পুরোনো অপমানটা ফিরিয়ে কি দিতে পারব? ছোটো এক এয়ার কন্ডিশনড হলে অনুষ্ঠান। দেখা হল কত পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে। তাদের অনেকে রিটায়ার করে গেছে আমার মতো। কারো কারো

চাকরি রয়েছে এখনও বছর দেড় দুই। বস এলেন সস্ত্রীক। বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু সব চুল ঘন কালো। যৌবন নেই, কিন্তু তাকে রক্ষা করার কী ব্যর্থ প্রচেষ্টা! মিসেস মল্লিকেরও তাই। বরং আরো বিসদৃশ তিনি। লোকনাথ মল্লিক মঞ্চে বসে একটি তালিকা খুললেন। যেন হাজিরা খাতা ধরে নাম ডাকতে লাগলেন। এই সব হল। সুনন্দা আসেনি শুনে তিনি বললেন, উচিত ছিল আসা, তিনি তো অচিনপুরের গায়িকা, আপনাদের ম্যামের গলা নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আর গাইতে পারেন না। সি ইজ সাফারিং ফ্রম আ সিরিয়াস ডিজিজ। তার জায়গাটা কে নেবে, মিসেস বোসই গাইবেন ঠিক ছিল, কি মজুমদার, সবাইকে আনতে পেরেছ, পারনি তো?

মজুমদার মাথা চুলকোতে লাগল আগের মতো। বলল, ডেপুটিরা সব এসেছে স্যার, অচিনপুরে আপনার সময় নেজারত ডেপুটি কালেক্টার ছিল সান্যাল, ওই যে স্যার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ায় অনুগতের মতো। সায়েব বললেন, ডিফালকেশন কেস থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে, কয়েক লাখের হিসেব ছিল না।

সান্যাল মাথা নামিয়ে নেয়। এত বছর বাদে তার বউ-এর সামনে না বললেই হত। কিন্তু অনেকে হে হে করে হাসতে লাগল। মজুমদার বলল, গুণধর মণ্ডলকে সেভ করলেন স্যার, মনে আছে তার কথা?

এসেছে?

না স্যার, মণ্ডল এখন সিঙ্গাপুরে।

কাকে নিয়ে গেল আবার চাকরি দেওয়ার নাম করে? বলতে বলতে হাসতে লাগলেন বড়ো সায়েব, তেত্রিশ বছর আগের জেলা শাসক। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিসেস এল না যে, ভেবেছিলাম ওঁকে লানডানের বঙ্গ সম্মেলনে পাঠাব, মজুমদার তো যাবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে।

কী রকম পাথরের মতো বসে আছেন বড়ো ম্যাডাম। উনিই বড়ো ম্যাডাম —ম্যাম। আর সবাই শুধু ম্যাম, উনি বসেই থাকলেন। একটি কথাও বললেন না। তাঁর রূপ ঝরে গেছে একেবারে। বুড়ি হয়ে গেছেন। স্যার আর ম্যাডামকে অনেক উপহার দেওয়া হল অচিনপুর প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে। ম্যাডাম শেষে দুটি কথা বললেন, 'আমি সুনন্দা বসুর গান শুনতে এসেছিলাম!'

কী ফ্যাঁসফেসে কণ্ঠস্বর তাঁর। বোঝা গেল অসুখটা কী। তিনি আবার বললেন, অচিনপুর বড়ো সুন্দর ছিল, বড়ো নিষ্ঠুরও ছিল, তাই না?

সকলে চুপচাপ। কেমন মনখারাপের বাতাস উড়ে এল দূর উত্তর থেকে। সেই জাহ্নবী নদীর কুল থেকে। আমার মনে পড়তে লাগল সব। কী নিষ্ঠুর অহঙ্কারী না ছিলেন ম্যাডাম মল্লিক। তার ফাই ফরমাস খাটত কী ভাবে আমাদের মজুমদার। গানের আসর, সাহিত্যের আসর বসাতে বসাতে হিমসিম। কলকাতা থেকে বড়ো

কবি গায়ককে নিয়ে গিয়ে তাদের হাত-পা টেপাই ছিল যেন মজুমদারের কাজ। ম্যাডাম বললেই হল। মনে পড়ল তাঁর সেই কঠিন দৃষ্টি। সুনন্দা না গেলেও ম্যাডামের ডাকা কবিতা পাঠ, গানের আসরে আমাকে যেতে হত। কত দূরে পড়ে আছি। যত সময় স্বস্তিতে থাকা যায়। ডি.এম সায়েবের চেয়ে ম্যাডামের প্রতাপ সব জায়গায় বেশি। শোনা যায় আগের জেলা বীরভূমে একজনের চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছিলেন তিনি ডি.এম সায়েবকে দিয়ে। সেই তিনি কেমন স্থির হয়ে বসে আছেন। শান্ত দৃষ্টি। আজ ফিরেও তাকাচ্ছেন না মজুমদারের দিকে। ফিরে তাকাচ্ছেন না বত্রিশ বছর পিছনে। মজুমদার তাঁকে প্রায় কুর্নিশ করল। তিনি দেখেও দেখলেন না।

আমার কানে মজুমদার গুনগুন করল, সুনন্দা ম্যাডামকে লনডন পাঠাতেন ওঁরা, এতবার আসতে বললাম, চান্স চলে গেল, বঙ্গ সম্মেলন বলে কথা।

আমি বললাম, ওঁর জন্য সুনন্দা গানই বন্ধ করে দিল বলা যায়, এখন আর কেন, অনুগ্রহ নেবে কেন ও, সবাই তো অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচে না মজুমদার।

মজুমদার বলল, এঁদের কিন্তু অনেক ক্ষমতা, এখনও সেই আগের মতোই যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। গুণধর মণ্ডল কত বড়ো অন্যায় করেছিল বলো, চাকরি দেওয়ার নাম করে মেয়েটাকে নিয়ে জাহ্নবীর ডাক বাঙলোয়, তার গায়ে হাতই পড়ল না, অথচ এফ. আই. আর করেছিল মেয়েটার বাবা। বড়ো ম্যাডামই গুণধরকে বাঁচিয়েছিলেন, আর শুভময় সেন ফেঁসে গেল, জেল খাটল শুধু সায়েবের রোষে পড়ে, তোমরা অনেক পেতে পারতে, পাওনি।

আমি চুপ করে থাকলাম। সবটা আমার জানা। ওই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম আমি। তার কারণ সুনন্দার গান, সুনন্দার রূপ।

সুনন্দা আসুন, তা বারবার বলে দিয়েছিলেন স্যার, বড়ো ম্যাডাম তাই চান, সব মনে আছে ওঁদের, যার এ.সি.আর খারাপ দিয়ে কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছিলেন, সেই মানস কুণ্ডুর খোঁজ করছিলেন, কমপেনসেট করবেন বলে।

ওসবের কোনো ক্ষতি পূরণ হয়? আমি বিনবিন করে বললাম, ও গান শোনে শুধু একা একা, সেতার সরোদ পিয়ানোর রাগরাগিনী, সোনাটা সিম্ভনি।

তখন একজন আবৃত্তি করছেন, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া অনিকেত সান্যাল। গলার সেই মাধুর্য আর নেই। অল্প বয়সে করত। তারপর ওসবের কাছে নেই। কিন্তু ম্যাডামের কথায় তাঁকে করতে হল, তা বললেন বারবার। আবেগে অনিকেত সান্যাল আপ্লুত।

মঞ্চ থেকে মল্লিক স্যার আমাকে বললেন, মিসেসকে নিয়ে কবে আসবেন?

কোথায়?

আমাদের সল্টলেকের ফ্ল্যাটে, আপনাদের ম্যাডাম ওঁর গান শুনবেন, বঙ্গ সম্মেলনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?

আমি বললাম, বলতে পারছি না, আমরা থার্ড উইকে সান দিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া যেতে পারি, এর ভিতরে সময় হবে না।

বলতে বলতে আমি দেখি বড়ো ম্যাডামের দুটি চোখ জ্বলে উঠল যেন। তিনি অনুগ্রহ বিলোতে এসে ব্যর্থ হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বলছেন। মজুমদার উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, আমিই নিয়ে যাব স্যার, আমার উপর ভার থাকল।

এরপর যেন সুর কেটে গেল। আমি বেরিয়ে পড়েছি একা। কাউকে কিছু না বলেই চলে এসেছি। পথে একবার মোবাইল বাজল, ধরিনি। বোধহয় মজুমদার। বাড়ি ফিরে দেখি সুনন্দা স্থির হয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে। তার দু-চোখে দিয়ে নেমে আসছে জল। ইন্টারনেটে ফেসবুকে পাওয়া লিঙ্ক থেকে গান নিঃসৃত হচ্ছে। বাঁশির সুর। মনিটরে ভেসে উঠছে এক অকুল গাঙের দৃশ্য। ভেসে যাচ্ছে নৌকো। ভোরের গোলাপি আলোয় ভেসে আছে চরাচর। এ কার বাঁশি?

এর নাম সংস অফ রিভার, নদীর গান, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া। সুনন্দা আঁচলে চোখ মুছল। বলল, শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যায়, এর চেয়ে সুন্দর কিছু হয়। চুপ করে শোনো, আমি প্রথম থেকে আবার বাজিয়ে দিই।

নেটে পাওয়া?

হ্যাঁ, এক বন্ধু পাঠিয়েছেন লিঙ্কটা, পৃথিবীটা শুধু মজুমদার, মল্লিক স্যারের শ্রীবাস্তবদের নয়, পৃথিবী আসলে এমন, আগে এসব শুনিনি কেন? বিড়বিড় করে বলল সুনন্দা।

সন্ধ্যা আর ভোর বুঝি মিলেমিশে একাকার। সেই বাঁশির কী আকুল ডাক। অনন্ত আকাশের নীচে যে নদী, সেই নদীর বাতাসে বাতাসে বাঁশির সুর ছড়িয়ে যেতে লাগল। এক একবার তীব্র হয়ে তা অন্তরাত্মায় প্রবেশ করে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব। সুরে ভেসে যেতে লাগল সব, অতীত, বর্তমান। কোথা থেকে নেমেছে নদী, কোন অনন্তের দিকে যাত্রা করেছে নদী, অজানা সমুদ্রে গিয়ে মিলবে ... বেদনা উৎসারিত হচ্ছে সুরে সুরে। আবার বহমানতার আনন্দও। বাঁশির ডাকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে পাখিরা, নদীর উপর দিয়ে তারা উড়ে যেতে লাগল নদীর গান নিয়ে। তাদের ডানায় লেগে গেল বাঁশির সুর। ডানার কাঁপনে সুর রং হয়ে ঝরে পড়তে লাগল ভোরের নদীতে। বহমান সেই নদী আমাকে স্মরণ করাতে লাগল আমার শৈশব আর যৌবনকালের কথা। আমাদের জীবন যে সব ভালো কিছু দিয়ে সুন্দর হয়েছিল কখনও কখনও তা মনে পড়ে যেতে লাগল। ভুলেই গিয়েছিলাম সব। মনে ছিল শুধু অনেক তিক্ততার কথা। খারাপ মানুষগুলোর কথা। অথচ সুন্দর সব

মানুষের মুখোমুখি হয়েছি কতবার। সুনন্দার সঙ্গে আমি ধ্যানস্থ হয়েছি আশ্চর্য সেই বাঁশিতে। অনেক পরে তা থামল।

সুনন্দা বলল, আমার অচেনা বন্ধু আমাকে প্রতিদিন ভোরে একটি করে গান পাঠিয়ে দেন, হারিয়ে যাওয়া গান, ভুলে যাওয়া গান, সেই পঞ্চাশ বছর আগের গান, তখন তোমার কৈশোর, আমার বালিকা বয়স, শুনবে?

তুমি তো আমাকে বলনি?

না বলিনি, নিজের কাছে রেখে দেখ ভেবেছিলাম, রেখে দিয়েও ছিলাম, কিন্তু আজ তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে মনে হতে লাগল আমি একা নেব কেন এই সুখ, আমার বন্ধুও তো ভোর রাতে উঠে নানাজনকে নানা গান উপহার দিয়ে দিয়ে সকাল শুরু করেন। তিনি বলেন, এই সুর তোমাকে শুদ্ধ করবে, নীরবতা দেবে এইসব সংগীত, সেই গান কি শুধু আমার হবে, গান আমার একার তো হতে পারে না, কিন্তু হলেই বা কী হতো, এতকাল পরে সংগীতের শুদ্ধতা অনুভব করতে পেরেছি, না গেয়েও মনে হয় যেন আমিই গাইছি, এ বাঁশির সুর আমার, নদীর গান আমার, আর তা সবাইকে বিলিয়ে দিলেই বুঝি জীবন সার্থক হতে পারে।

তোমার বন্ধুটি কে?

কে আমি তা জানি না, তাঁর নাম অনন্ত আকাশ, এই নামেই তাকে জানি, শুনেছি বাঙ্গালুরু থেকে একশো কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের এক গাঁয়ে থাকেন, ফেসবুকে আলাপ।

চমকে উঠি, কে সে, সুবীর ভদ্র? মেজমাসির বড়ো ছেলে? কিন্তু তিনি অনন্ত আকাশ নাম নিয়ে আসবেন কেন? সুনন্দা বলল, ওই নামেই তাঁর সহস্রাধিক বন্ধু তাঁকে চেনে, আমিও চিনি, ফেসবুকে আর কিছু চেনার দরকার হয় না, আলাপ হয়ে যায়, আমি লিখেছিলাম গান ভালোবাসি, উনি প্রতিদিন একটি করে গান আমাকে উপহার দিয়ে যান সেই কোন ভোরে, কোনো গান জানো, যে গান, ভুলে গেছে মানুষ সেই গান।

আশ্চর্য, তাহলে কি সুবীরদাই সত্যি!

সুনন্দা বলল, ইনি বহু দেশ ঘুরে এদেশের গাঁয়ের লোকের চিকিৎসা করছেন, কত বয়স, সাধুর মতো হয়ে গেছেন, আমরা কি করলাম সারা জীবন? বসো, তোমাকে আর এটাই শোনাই, বেটোফেন-এর মুনলাইট সোনাটাং ... ফিল করো তুমি, আগে তো এসব শুনিনি।

জ্যোৎস্না রাতের রূপ ফুটছে ধীরে। আমি যেন নীরবতাকে রূপ দেখতে পাচ্ছি একটু একটু করে। তার ভিতরে আবছা কলকল শোনা যাচ্ছে। অনন্ত আকাশ একা নন, যেন অনেক শিশুর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে

এসেছেন চাঁদের আলোর ভিতরে। ঘর ভরে উঠেছে তাদের কলধ্বনিতে। আমার কীরকম ছোটো লাগল নিজেকে, সমস্ত দুপুরটা কীভাবে কাটিয়েছি। কীভাবে সকলের সঙ্গে গিয়েছিলাম আনুগত্য প্রকাশ করতে। চুপ করে থাকলাম। মুনলাইট সোনাটা বাজতে লাগল। বেজে যাচ্ছে। আমাদের সেই অচিনপুরে জাহ্নবী নদীর তীরে চাঁদের আলো নিঃশব্দে নেমে এল অনন্ত আকাশ থেকে।

এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ

এক

সুদামার আবার সাধ হয়েছিল মা হওয়ার। হ্যাঁ, চোদ্দ বছর বাদেও। শুনে কৃষ্ণেন্দুর কী হাসি। হাসতে হাসতেই তুচ্ছ করে দিল সুদামার ইচ্ছেকে, মাথা খারাপ।

কেন, আমি তো তোমাকে বলেইছিলাম।

শুনে কৃষ্ণেন্দু আবার হাসে, বলেছিলে। কবে বলেছিলে? বলার কী আছে? এই বয়সে আবার ওই হ্যাপা কাঁধে নেয় কেউ?

তুমি সব জানতে, আমি বলিনি? সুদামার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে প্রায়।

বলেছিলে? সত্যি বলেছিলে? আমি কি তখন অফিসে, না ঘুমিয়ে? কৃষ্ণেন্দুর চোখের তারায় কী রকম তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা। সুদামার অচেনা মনে হয় তার প্রেমিক, স্বামীকে। কৃষ্ণেন্দু তো সব জানে। সে সম্মতি দিয়েছিল, এত বছর বাদে! তোমার যা ইচ্ছে —!

কৃষ্ণেন্দু বলল, সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় তো হ্যাঁ বলেছিলে কেন? সুদামা কাঁপছে।

কৃষ্ণেন্দু বলল, কী আবোল-তাবোল বকছ! এত বছর বাদে আবার চেকআপ, আবার নার্সিংহোম, টেনসড হয়ে থাকা, ডাক্তার, বাচ্চা — ইস!

সুদামা অবাক হয়। আশ্চর্য! কৃষ্ণেন্দু নিজের কথা নিজে কেমন খেয়ে ফেলছে। অস্বীকার করছে সব। অথচ তার কথাতেই না সুদামা সাহস পেয়ে যাবতীয় নিরোধক ত্যাগ করে বসে আছে এই তিনমাস। সে কৃষ্ণেন্দুকে বুঝতে চেষ্টা করে ক্রমাগত।

কৃষ্ণেন্দু ঈষৎ বিরক্ত, বলল, তোমার কি সব কাণ্ডজ্ঞান উধাও হয়ে যাচ্ছে, য়্যু আর থার্টি সেভেন প্লাস, আটত্রিশে পা দিয়েছ। এই বয়সে কেউ মা হয়? তুমি কোলে বাচ্চা নিয়ে বেরোবে, পারবে!

সুদামা বলে, চিন্তা আমি করেই নিয়েছি আগে, তুমি সব জেনেও না জানার ভান করছ। রাখব বলেই কনসিভ করেছি আমি।

কৃষ্ণেন্দু উষ্মা প্রকাশ করল এবার, আমি জানি! তুমি সত্যি বলছ না সুদামা।

গলা উঠেছিল দুজনেরই। বাইরে মধ্য ফেব্রুয়ারির রাত। কৃষ্ণেন্দু আজ অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিল। নতুন প্রজেক্ট আসছে পরপর। আসছে নানা দেশি বিদেশি কোম্পানি, বণিকেরা। কেউ ফুড প্রডাক্ট, কেউ টিভি, মোটরগাড়ি, কেউ ঠাণ্ডা পানীয়, কেউ কম্পিউটার, কেউ হাসপাতাল নার্সিংহোম বানানোর প্রস্তাব নিয়ে

আসছে। রূপায়িত করার অনেকটা দায়িত্ব কৃষ্ণেন্দুর। প্রাথমিক ব্যবস্থা করবে তো সে-ই। এই সব প্রজেক্টের সাফল্যের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর জীবনের সাফল্যও যে জড়িয়ে গেছে। রাজারামপুর বলে একটা গ্রামে তিনশো বিঘের উপর বেসরকারি এক পেট্রোলিয়াম গ্যাস কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণেন্দু এখন খুব ব্যস্ত। ঘুমের ভিতরেও অফিস নিয়ে থাকছে যেন সে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, এত ঝামেলা নিয়ে আছি।

ঝামেলা তো আমার জন্য নয়।

কৃষ্ণেন্দুর বিরক্ত হয়। কিছু বলতে যাচ্ছিল চড়া গলায়, কিন্তু তখনই ফোন বাজল। সে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তোলে।

কৃষ্ণেন্দু ফোন ধরেছে। সুদামা কঠিন হয়ে বসে আছে খাটের এক কোণে। চাপা গলায় বলল, আমার কি স্বাধীনতা নেই নাকি, ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছুই নেই...।

কৃষ্ণেন্দু রিসিভার হাতের পাতায় চেপে ধরে বিরক্ত মুখে তাকায় সুদামার দিকে। ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলে। সুদামার কথা ওপারের মানুষের কানে চলে যেতে পারে। সুদামা উঠল। ধীর পায়ে ব্যালকনির অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের রাস্তাটা আবছা অন্ধকার। আলো আছে বটে, কিন্তু সেই আলো পথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

কে কথা বলছে? না সুহাস বোস, কৃষ্ণেন্দুর জুনিয়র। সে আজ রাজারামপুর গিয়েছিল প্রজেক্ট সাইট দেখতে, রিপোর্ট দিচ্ছে। সুদামা কান পাতে। কিন্তু তার কৌতূহল সামান্যতেই উবে যায়। ল্যান্ড-কমপেনসেশন এইসব নিয়ে কথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে সুহাস নতুন কিছু বলছে। নতুন কোনো প্রজেক্টের কথা। কৃষ্ণেন্দু খুব উৎসাহী।

সুদামা অন্ধকার আকাশে তাকায়। এখানে আকাশ অনেক পরিষ্কার। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তো আকাশ তারায় তারায় ছয়লাপ। ছায়াপথ দেখা যায়। খুব নজর করলে অচেনা কোনো গ্রহও হয়তো। হ্যাঁ, কথাটা কৃষ্ণেন্দুর। বছর সাত আগে যখন এই ফ্ল্যাট কিনে তারা বেহালার সরকারি আবাসন থেকে উঠে আসে, কৃষ্ণেন্দু বলেছিল তার সাত বছরের ছেলে নীলাঞ্জনকে। পাশে দাঁড়িয়েছিল সুদামা। রাত হয়েছিল অনেক। গৃহপ্রবেশের দিন ছোটো মতো উৎসব হয়েছিল এই ফ্ল্যাটে। এসেছিল অর্ধেন্দু, যূথিকা, যূথিকার মেয়ে টুম্পা। সব এখন কেমন অলীক মনে হয়।

অলীক-ই তো! সুদামা বলেছিল, নতুন গ্রহ মানে, নয় গ্রহের বাইরে?

তাই-ই তো! কৃষ্ণেন্দুর তার ছেলেকে দু-হাতে বেড় দিয়ে বলেছিল, নটি গ্রহ তো সূর্যের, অন্য নক্ষত্রের গ্রহের কথা বলছি, এই বারান্দায় টেলিস্কোপ বসিয়ে দেব নীল, তোর জন্যে, তুই গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের মতো টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে বসে থাকবি। কী চমৎকার হয়েছে ফ্ল্যাটটা। আমাদের বাড়ি।

তখন অফিস থেকে এসে নীলকে নিয়ে বারান্দায় বসত কৃষ্ণেন্দু। নতুন ফ্ল্যাট কেনার ধাক্কা সামলাতে হচ্ছিল সেই সময় স্বামী-স্ত্রীকে। সুদামার সব গয়না তো বেচেই দিতে হয়েছিল, তা ছাড়া ছিল ঋণ। কিন্তু কোনো অসুবিধেই যেন হয়নি। কোনোদিন তারা কেউ মুখ অন্ধকার করেনি। বেহালার সরকারি আবাসন খারাপ ছিল না। সেখানে তারা গিয়েছিল বেলগাছিয়ার আলো-অন্ধকারে ছাওয়া ঘর ছেড়ে। না গিয়ে উপায় ছিল না। কৃষ্ণেন্দুর কাছে অফিসের কেউ এলে বসতে দেওয়ার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। একটাই তো ঘর। আবার তিন ঘরের ফ্ল্যাটের ভিতরে ওই ঘরটিই ছিল সবচেয়ে কম আলোর কম বাতাসের, একটু স্যাঁতসেঁতে মতো। বাড়ির ভালো ঘর দুটি ছিল কৃষ্ণেন্দুর বাবা-মা আর বড়োভাই অর্ধেন্দুর দখলে। তখন তো উপায়ও ছিল না। অন্ধকার ঘরটি কাউকে না কাউকে নিতে হত, অর্ধেন্দু-যূথিকা কিংবা কৃষ্ণেন্দু-সুদামা। বাবা-মায়ের ঘরটি ছিল সবচেয়ে ভালো। দুই ভাইয়ের ব্যবস্থা ছিল না এটি। আপনা-আপনি হয়ে গিয়েছিল। ওই ফ্ল্যাটে তো অর্ধেন্দুর বাবা-মা চারটি সন্তান নিয়ে এসে উঠেছিলেন অনেক বছর আগে। মেয়েরা বিয়ের পর চলে যাওয়ায় ঘর ভাগ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে গিয়েছিল।

এই তো কদিন আগে সুদামা গিয়েছিল বেলগাছিয়ায়। ওই ঘরটিতে ঢুকেছিল। বিশ্বাসই হয় না ওখানে সে আর কৃষ্ণেন্দু বিয়ের পর প্রথম দেড় বছর ছিল। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হত। জানালা যে খুলে রাখবে, লাভ কী? জানালা দুটি যেদিকে তার দশ ফুট ওপারে আর একটি বাড়ির পুরোনো দেওয়া, ময়লা কার্নিশ। ঠিক তাদের ঘরের জানলার মুখোমুখি ছিল পাশের তিনতলা বাড়ির দোতলার রান্নাঘর। একান্নবর্তী সেই বাড়ির রান্নাঘরে কড়া চাপত ভোরবেলা, সারাদিনই ছ্যাঁক-ছ্যাঁক, ধোঁয়াকালি, শেষ হতে হতে রাত এগারোটা। দুপুরে ঘন্টা দুয়েকের মতো থামত কখন তা টেরও পাওয়া যেত না। সুদামা জানালা খুললেই নাকে পেত তেল-মশলার ঝাঁঝালো গন্ধ। ঘরে বসে শীতকালটাই টের পাওয়া যেত, অন্য কোনো ঋতু ধরাই যেত না। না বাদল, না শরৎ, না বসন্ত। হ্যাঁ গরমের দিনে যখন আলো-পাখা থাকত না, টের পাওয়া যেত দমবন্ধ ভাবটি। বৈশাখে বিয়ে হয়েছিল সুদামার। তখন ছিল অনবরত লোডশেডিং — সে যেন বন্দিশিবিরে এসে পড়েছিল। ডালিমতলার বাপের বাড়িও খুব আলো-হাওয়ার ছিল না, কিন্তু সে যে ঘরটিতে থাকত আর এক বোনের সঙ্গে, সেই ঘরের জানালা ছিল দখিনমুখী। হাওয়া আসত। শ্বশুরবাড়ির ঘরটি ছিল যেন জেলখানা, বড়ো প্রাচীরে ঘেরা অন্ধকার কুঠুরি। সুদামা ধূপ জ্বেলে রাখত ঘরে প্রায়ই সময়। বোটকা গন্ধটা যাতে যায়। এখন আর বিশ্বাসই হয় না ওই ঘরে তারা বিবাহের পর রাতের পর রাত জেগেছে, ঘুমিয়েছে। ওই ঘরে তাদের ভিতরে ভালোবাসা নিবিড় হয়েছিল। ওই ঘরে তারা পরস্পরকে চিনেছিল পরম

নিশ্চিন্তে। এখন এই আটশো স্কোয়ার ফুটের অঢেল আলো বাতাসে বসে ওই ঘরের কথা মনে হয় অসত্য, অন্য জন্মের কথা।

ডাকলে কৃষ্ণেন্দু, সুদামা তোমাকে ডাকছে সুহাস।

সুদামা ব্যালকনি থেকে সরে ঘরের দরজায়। ভ্রু-কুঞ্চিত মুখে তাকিয়ে আছে টেলিফোন হাতে কৃষ্ণেন্দুর দিকে। কৃষ্ণেন্দু আবার ডাকল, এসো, ও কতক্ষণ ধরে থাকবে।

সুদামা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন ধরল, আমি তো আপনার বস নই বোসবাবু, আমাকেও কি ওইসব প্রজেক্ট বোঝাবেন?

ওপারে হো হো হাসি, না ম্যাডাম, আসলে কী জানেন ম্যাডামকে খুশি না করলে বস খুশি হয় না, তাই।

আমি খুশি হলাম না।

না হন, বসকে বলবেন না, তাহলেই হল। আপনি বলছিলেন না আমাদের প্রজেক্ট সাইটে যাবেন একবার, রাজারামপুর দেখবেন।

সুদামা বলল, এখন আর বলছি না।

সুহাস বলল, স্যার বলতে বললেন, তাই।

সুদামা কঠিন হল, এখন আর যেতে ইচ্ছে নেই। আপনারা ওসব নিয়ে থাকুন, সায়েব, কোম্পানি, জমি, ফ্যাক্টরি, অফিসের ফাইল।

কী করব বলুন, চাকরি তো, কবে যাবেন বলুন।

সুদামা বলল, ঠিক আছে ওকে বলে দেব, রাখছি।

টেলিফোন রেখে সুদামা ঘুরল কৃষ্ণেন্দুর দিকে। কৃষ্ণেন্দু সিগারেট ধরিয়ে হাতে একটা হেডলি চেজ — কভারে রিভলবার হাতে প্রায় নিরাবরণ যুবতি, বিদেশিনী। এখন কৃষ্ণেন্দুর অবসর কাটানো মানে হেডলি চেজ, নিক কার্টার, আরভিং ওয়ালেস — সফট পর্ণো কাম থ্রিলার। এইসব পুস্তক ওর যাবতীয় অবসাদ কাটিয়ে দেয়। সারাদিন অফিসে থেকে মাথা ভার হয়। ভারমুক্ত করে হেডলি চেজ কিংবা টেলিভিশনে। টেলিভিশনের অভ্যাস ক্রমশ বাড়ছে কৃষ্ণেন্দুর।

সুদামা বলল, কেন তুমি বলতে পারলে না?

চমকে ওঠে কৃষ্ণেন্দু, কী!

ওই যে রাজারামপুর যাওয়ার কথা, সুহাস বোসকে দিয়ে বলাতে হবে!

কৃষ্ণেন্দু হাসে, আমি বললেই বলতে পারতাম, কিন্তু সুহাস তো তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, রাজি তুমি হবেই।

সুদামা অবাক, সুহাস বললে রাজি হব কেন?

ওটা কথার কথা, তবে এই মুহূর্তে আমার কথায় যে রাজি হতে না তুমি, তা তো আমি জানতাম, তাই সুহাসকে বলতে বললাম।

সুদামা বলল, এখন তো আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

কেন? অবাক হয় কৃষ্ণেন্দু।

কেন তা বুঝতে পারছ না, এখন সাবধানে থাকতে হবে প্রথম কটা মাস।

হা হা করে হাসে কৃষ্ণেন্দু, প্রথম কটা মাস! পাগল! ও তো একদিনের ব্যাপার, সকালে যাবে, বিকেলে নার্সিংহোম থেকে ক্লিন হয়ে ফিরে আসবে।

সুদামার চোখ-মুখ থরথর করে, সে যেন অন্ধের মতো বাতাস হাতড়ায়। সত্যি বলছ তুমি?

সত্যি ছাড়া কি মিথ্যে? এ বয়সে আমি আবার বাবা হব, নীল কী ভাববে?

ওর আর ভাবার কী আছে, থাকে তো দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে! সুদামা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ও তো এরপর ভুলেই যাবে আমাদের, এবার সামারে আসবে না উটি যাবে, সাউথ ইন্ডিয়া নিয়ে যাবে স্কুল থেকে, ওর মায়া চলে যাচ্ছে।

মায়া যাওয়ার কি আছে, বড়ো হচ্ছে। ছেলেরা তো ডিটাচড হয়ে যেতেই ভালোবাসে এই বয়সে। আবার ফিরেও আসে আরও বড়ো হলে। সামারে না আসুক দেওয়ালিতে, শীতে তো আসবে। না হলে আমরাই যাব মুসৌরি, তুমি ওসব মাথা থেকে তাড়াও দেখি। এখন আর নার্সিংহোমে দৌড়োদৌড়ি করা যায় না। সময়ও তো নেই।

সুদামা চুপ করে থাকে। মুখ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দু খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ, যা বলে তাই করে। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে। ঘন অন্ধকার। অন্ধকারে কী যেন খুঁজতে থাকে তার চোখ। সে যুক্তি খুঁজে বের করতে চাইছিল। পেয়েও গেল বোধহয়।

সুদামা বলে, নীল ছেলেবেলায় কী রকম বোন চাইত মনে আছে?

হাসে কৃষ্ণেন্দু, ছেলেবেলায় সবাই ওরকম চায়। এখন ও অবাক হবে। অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছে তো! আজকাল চোদ্দ বছরেই ছেলেরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে, তারপর যে স্কুলে পড়ে। তুমি তো নীলের পরেও দুবার কনসিভ করেছ, তখন রাখার কথা তো বলোনি।

সুদামা আবার অন্ধকারে তাকায়। কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু তখন যে নীল-নীলাঞ্জন ছিল কাছে। এখন সে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ে, শীতের ভিতরে। সেখানে গিয়ে প্রথম এক বছর মন খারাপ হত ছেলের। চিঠি লিখত খুব, আচমকা ফোন করত। এখন মন বসে গেছে। তার মানে সুদামার জন্য, মায়ের জন্য এখন আর তার ব্যস্ততা নেই, মন খারাপ নেই। নীল বাড়ি ছেড়েছে দু-বছর। কবে বাড়ি ফিরবে জানা নেই। ওই স্কুল থেকে বেরিয়ে আই আই টি — সেই রকমই প্ল্যান কৃষ্ণেন্দুর। তারপর বিদেশ। কলকাতায় পড়বেই না নীল। সুদামা তা হলে তার ছেলেকে কদিন কাছে রাখতে পারল? সন্তান প্রতিপালন করল কদিন? চোদ্দ বছরে অ্যাডাল্ট! এত তাড়াতাড়ি বাচ্চাটা বেড়ে উঠলে তার কী হবে? এত বড়ো ফ্ল্যাটে দিনভর সে একা। একটি শিশু এলে ফ্ল্যাটে চেহারাই বদলে যাবে।

কৃষ্ণেন্দুর ফোন এসেছে আবার। কথা বলছে অনিলবরণ ঘোষচৌধুরীর সঙ্গে। তারই সহকর্মী, অদ্ভুত এক রহস্য উপন্যাস লেখক। ...কী বলছ, চেজের খুন। থার্ড মার্ডার — আমি অত দূর পর্যন্ত যাইনি... হ্যাঁ, প্রথম মার্ডারটা থ্রিলিং... লিফটে ভিতরে গলাকাটা ক্যাবারে গার্ল...। কৃষ্ণেন্দু মার্ডার নিয়ে গল্প করতে লাগল অনিলবরণের সঙ্গে, সেক্স মার্ডার ভায়োলেন্স —! চেজ থেকে নিক কার্টার তা থেকে অতিসাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, এইসব।

সুদামা ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে যায়। ঘাড় উঁচু করে আকাশে তাকায়। পাতলা শীত আছে এখনও। সে আঁচল টানল গায়ে। ভাবছিল আর কী বলা যায়। কৃষ্ণেন্দুর কাছে কীভাবে ব্যক্ত করে সে নিজেকে।

দুই

আবার আমার সাধ হয়েছিল মা হই। হ্যাঁ চোদ্দ বছর বাদেও। শুনে কৃষ্ণেন্দু মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, এখন আর ওসবের সময় নেই, মানুষের জীবনে এক একটি বয়স এক একটি অনুভূতির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সেই দিন আমাদের চলে গেছে। এক এক বয়সে এক এক রকম অনুভূতি, এক এক রকম জীবন। এখন এই বয়সে ও সব ঝামেলা নিয়ে কাজ কী? এখন তো কৃষ্ণেন্দু সেই চোদ্দ-পনেরো বছর আগের মতো সন্তানের মুখ দেখার প্রতীক্ষা করে থাকতে পারবে না। এখন প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে কৃষ্ণেন্দু আমাকে অতি সাবধানে কাঁচা মাটির পুতুলের মতো নিয়ে যেতে পারবে না সুখ্যাত ডাক্তারের কাছে, অপেক্ষা করতে পারবে না কখন ডাক্তারের সময় হয়। এখন অত সময় নেই। ওই রকম মনও নেই।

কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে রাতে অনেক সময় ধরে কথা কাটাকাটি। আমি ছিলাম আমার সিদ্ধান্তে স্থির নিশ্চিত, সন্তান ধারণ করবই। আমার ভেতরে জেদ চেপে গিয়েছিল, বলতে লাগলাম রাখবই একে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর সেই এক কথা, এই বয়সে এসব আর হয় না। আমার এই বয়স পুনর্বার মা হওয়ার উপযোগী নয়। সন্তান তো রয়েইছে, আবার কেন?

কৃষ্ণেন্দু কিন্তু ভুলে যাচ্ছে গত ছ-মাসের কথা। আমি যখন এই বাসনার কথা তার কাছে প্রকাশ করি, কৃষ্ণেন্দু ঘাড় কাত করেছিল, হবে তো হবে। আমি তখন সাবধান হইনি। কৃষ্ণেন্দুকেও সাবধান করিনি। আসলে কৃষ্ণেন্দু তার ছ-মাস আগের মত বদলাচ্ছে। ছ-মাসে কী হয়েছে ওর? নতুন এক দায়িত্ব পেয়েছে, যে দায়িত্বে ওর অনেক সম্ভাবনার চিহ্ন লুকিয়ে আছে। কিছু বলে না, কিন্তু আচমকা ব্যক্ত করে ফেলে। নানান স্বদেশি-বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে, বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে ওর যোগাযোগ হচ্ছে নিয়মিত। ওর দায়িত্ব হল এদেশে তাদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা। ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। করতে গিয়ে প্রকৃত অর্থে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছুটির দিনও ছুটি নেই, সন্ধের পরও ছুটি নেই। মিটিঙের পর মিটিং, ফোনের পর ফোন। হ্যাঁ, সাগরপারের ফোনও আসে। কৃষ্ণেন্দু বলছে, তেমন কোনো অফার পেলে ও ছেড়ে দেবে সরকারি দায়িত্ব — এখন টাকার বাজার তৈরি হচ্ছে, টাকা সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট সময়ই তো এইটা।

অনেক বাক্য-বিনিময়েও কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত ওর জিত হল, হার হল আমার। কৃষ্ণেন্দুর একটিই যুক্তি, এখন যদি রাখতে চাইছি তো আগে দুবার নষ্ট করেছি কেন নীলের পরে?

কী বলি! তখন তো নীল ছিল ঘরে। আমার তো বাসনা শিখর-প্রমাণ নয়। নীলকে নিয়েই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, সন্তুষ্ট ছিলাম। নীল মিশন স্কুলে যাওয়ার পর আমি কী নিয়ে থাকি! কাকে নিয়ে থাকি!

কৃষ্ণেন্দু আমাকে সময় দিল। এখন মনে হচ্ছে এ-ই আমার ভবিতব্য। আমাকে সাবধানে, মাটির পুতুলের মতো নিয়ে গেল সেই পরিচিত নার্সিংহোমে, বুড়ো ডাক্তারকে গিয়ে বলল, পেশেন্ট নিয়ে এলাম ডাঃ দেব, আচ্ছা এই বয়সে মা হয় কেউ?

যে কথাটা ফ্ল্যাটে বলেছে আমাকে কৃষ্ণেন্দু, সেই কথা ডাক্তারকেও বলল। এই বয়সে যে কনসিভ করে সে নিতান্তই পেশেন্ট, আর কিছু নয়। আমার শরীরের অভ্যন্তরে যে প্রাণটি জন্ম নিচ্ছে, তা-ই হল আমার অসুখের কারণ। ভ্রূণমোচন করলেই আমার অসুখটি যাবে।

হাসতে হাসতে আমাকে ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে আনল আমার স্বামী। নিশ্চিন্ত। বউয়ের শরীর ধুয়েমুছে সাফ করে এনেছে, অনেকদিন বাদে আমার মাথার চুলে হাত দিয়ে খোপা ভাঙতে ভাঙতে বলল, খুকি, এই রকম কেউ করে, দিস ইজ দা হাই টাইম টু আরন মানি, টু অ্যাচিভ মোর—এখন আমাদের সেই বয়স নেই, লোকে হাসবে।

আমি চুপ করে থাকলাম। কী করে বোঝাই যে সাধ হয়েছিল সত্যি। হ্যাঁ আমার মাথার ভিতরে খুঁজলে কোথাও না কোথাও রুপোলি রেখা চোখে পড়বেই। একটি দুটি। বয়স হয়েইছে। তা জেনেও তো চেয়েছিলাম আবার সেই স্বাদ নিই। সেই চোদ্দ বছর আগের শিহরণে শিহরিত হই। আবার আমার শূন্য শরীর ভরে উঠুক সন্তানের রক্তমাংসে, দশ মাস ধরে আমি বহন করি তার ভার। আমার দুই স্তনে দুধ আসুক। দুধের ভারে তা স্ফীত হোক, ব্লাউজ ভিজে যাক প্রাণের টানে। আমার গা দিয়ে দুধের গন্ধ বেরোতে থাকুক।

কী করে বোঝাই কৃষ্ণেন্দুকে এত বড়ো এই ফ্ল্যাট আর সহ্য হয় না। একা একা ভয় লাগে। হ্যাঁ সত্যিই। তাই আমি চেয়েছিলাম ফ্ল্যাটের বাতাসে ঘুরুক শিশুর গায়ের গন্ধ। ঘর-বিছানা ভরে যাক কাঁথা-কাপড়-দোলনা-ফিডিং-বোতল আর খালি দুধের কৌটোয়। খেলনা চাই না, সেই খালি দুধের কৌটো গড়িয়ে দিতে দিতে বড়ো হয়ে উঠুক সে। যেমন খেলত নীল। তখন আমরা বেহালার সরকারি আবাসনে। সবে স্টেট সার্ভিস — সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে কৃষ্ণেন্দু। বিয়ে যখন হল তখন তো সে কাগজের অফিসের প্রুফ-রিডার, আর দু-চার পাতা লেখে মাত্র ...।

যদি ডায়েরি লিখত, এভাবেই যেন লিখত সুদামা। এখন আবার সেই অভ্যাস, যে অভ্যাস কৃষ্ণেন্দু তাকে দিয়েছিল আবার কৃষ্ণেন্দুই হরণ করেছিল, ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। ডায়েরি লিখতে বলত তাকে কৃষ্ণেন্দু, পরিচয়ের পর থেকে, কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলত, ডায়েরি লিখলে তোমার লেখার অভ্যাস হয়ে যাবে, আমরা দুজনেই লিখব।

সুদামা বলত, আমার যে ডায়েরি লিখতে ভয় করে।

কেন?

যদি কেউ সেই ডায়েরি খুঁজে পায়, দেখে ফেলে, বাড়িতে কত লোক!

হা হা করে হাসত কৃষ্ণেন্দু। তারা তখন হয়তো হাঁটছে রোদে ডোবা গ্রীষ্মের ময়দান দিয়ে। তারা তখন হয়তো আসছে ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রিটের দিকে। তারা তখন হয়তো বসে আছে কলেজ স্ট্রিটের বসন্ত কেবিনে। তারা তখন হয়তো কলেজ স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দ রোডের দিকে হাঁটছে, ডালিমতলায় সুদামাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার বাস ধরবে কৃষ্ণেন্দু।

কৃষ্ণেন্দু বলেছে, দেখলে দেখবে।

তাতে যে তোমার কথা থাকবে।

থাকলে থাকবে, হ্যাঁ থাকবেই তো, আমার ডায়েরিতে তোমার কথা সব আছে।

কী আছে?

সে কী করে জানাব এখন, যদি কোনোদিন খুঁজে পাও, দেখে নেবে। শোনো খুকি, কবে তোমার হাত ছুঁয়েছি সেই কথাও, কবে কোনদিনে কোনক্ষণে তোমাকে চুম্বন করেছি, তাও।

ইস! তুমি আমার নাম লিখেছ?

লিখেছি তো খুকির কথা। কৃষ্ণেন্দু তার হাতের আঙুলে চাপ দিয়ে বলেছে।

অভ্যাস করছিল সুদামা। অভ্যাসটা ত্যাগও করেছে। আচমকা বিয়ে। বিয়ের কথাও লিখেছিল সুদামা। তারপর লিখতে গেলে হাত কাঁপে। লিখতে ইচ্ছে হয় অনেক কথা, কিন্তু লেখা হয়নি। লেখা হত না এই জন্য যে কৃষ্ণেন্দু টেনে টেনে পড়ত, আর হাসত। আশ্চর্য! কৃষ্ণেন্দু কী লিখেছিল তার ডায়েরিতে তা সে জানতেই পারেনি। কোথায় তার ডায়েরি! কৃষ্ণেন্দু বলত, তুমি খুঁজে বের করো।

সুদামার ফ্ল্যাটের বাইরে এখন প্রথম মার্চের দুপুর। আজ ভোরে কৃষ্ণেন্দু বেরিয়েছে রাজারামপুরের দিকে। তিনশো বিঘে জমি অধিগ্রহণের যে নোটিশ পড়েছে, তা দখল করা হবে আজ। কৃষ্ণেন্দু, সুহাস গেছে। গেছে পুলিশের বড়োকর্তা, বহু পুলিশ, রাইফেলধারী। কৃষ্ণেন্দু কদিন ধরে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নির্বিঘ্নে জমি দখল করে সীমানা চিহ্নিত করে কাঁটাতারে বেড়ো দিয়ে দিতে পারলে তার প্রাথমিক দায়িত্ব শেষ। দায়িত্ব শেষ তো নয়। এই রকম প্রজেক্ট পরপর আসছে। এটি পেট্রোলিয়াম গ্যাস প্রজেক্ট, এরপর আছে হসপিটাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ফুড পার্ক...। কদিন ধরে দেরিতে ফিরছে সে। জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক, পুলিশ কর্তার সঙ্গে বৈঠক, গ্যাস কোম্পানির উচ্চ পদাধিকারিদের সঙ্গে বৈঠক। তারা আরও পেট্রোলিয়াম প্রডাক্ট করতে নামছে, কৃষ্ণেন্দুকে সব দেখতে হবে। কৃষ্ণেন্দুর মুখে এখন ওই গল্প। এখন জুতো কোম্পানি শার্ট তৈরি করছে, ওষুধ কোম্পানি করছে টিভি-র বিজনেস। একটা ব্যবসায়ে কেউ পড়ে থাকছে না। বড়ো বিমার কোম্পানি হাসপাতাল করতে নেমেছে, এরপর তারা তৈরি করবে ফিলম ল্যাবরেটরি, ফুড পার্ক। গ্যাস কোম্পানিও নানারকম বিজনেস করে এ দেশে, বিদেশে। তারা দ্রুত কাজ চায়। ঘড়ির সঙ্গে হাঁটে, ঘড়ি ধরে কথা বলে, ঘড়ি ধরে ঘুমোয়। কৃষ্ণেন্দু হাসতে হাসতে বলেছে, তোমার ছেলে যদি প্রেম করে, করতেই পারে। তাহলেও ঘড়ি ধরে করবে, বুঝলে সুদামা।

টের পাচ্ছে সুদামা, ছ-মাসেই ঘড়ির কাঁটায় সতর্ক চোখ রেখে হাঁটার অভ্যেস করে ফেলেছে কৃষ্ণেন্দু। সেই অভ্যাস থেকেই যেন ভ্রূণমোচন করানো। অতদিন সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা করার অভ্যেসই চলে গেছে তার। কৃষ্ণেন্দু বলে সে যদি এখন ছাব্বিশ বছরের যুবক, আর সুদামা উনিশ বছরের হত, তাহলে তারা কি আগের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা গঙ্গাতীরে জাহাজ দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত? না পায়ে হেঁটে আউট্রাম ঘাট থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত আসতে পারত? প্রেমের প্রকাশও বদলে গেছে, যাচ্ছে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, এরপর দেখবে হয়তো সন্তানের জন্য দশ মাস ওয়েটই করতে হবে না, অত সময় কে দেবে...

কৃষ্ণেন্দু বলে, আমাদের দেশে সারপ্লাস লেবার, যদি সন্তান চাও, তুমি কষ্ট করবে কেন অতদিন, জানো ইউরোপ-আমেরিকায় উম্ব হায়ার করা যায়।

কৃষ্ণেন্দু বলে, ডায়েরি! তা লেখার সময় কখন পাবে এই সময়ের যুবক।

অবাক হয়ে সুদামা তার স্বামীকে দ্যাখে বিড়বিড় করে বলে, সল্টলেক থেকে সেদিন বেলগাছিয়া গেলাম, সেই তো আগের মতো, পথের ধারে চায়ের দোকানে, খালি বারান্দায় বসে আছে চব্বিশ-কুড়ি, নানা রকম বয়স!

ওরা খোঁজ রাখে না?

খোঁজ রাখে না মানে?

পালটে যাচ্ছে সব, দ্রুত পালটে যাচ্ছে, ওরা কি জানে উত্তর মেরুতে এবার বরফ গলবে বেশি, প্রতি বছর তাই হচ্ছে।

এ কথার সঙ্গে তোমার আগের কথার মিল কোথায়?

পালটে যাচ্ছে পৃথিবী।

সুদামা হেসে ফেলেছিল। যুক্তি প্রতিষ্ঠার কী অক্ষম প্রয়াস। উত্তর মেরুতে বরফ বেশি গলছে গ্রীষ্মে, তাই মানুষ হয়ে উঠছে ঘড়ির কাঁটার দাস! সে বলেছিল, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো দেখছি না আমি।

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, প্রকৃতি পালটালে মানুষ পালটাবে না?

হ্যাঁ পালটাবে তো বটেই, তাপমাত্রা বাড়বে, কোনো কোনো বিষয়ের অভাব হবে। কোনো কোনো বিষয়ের প্রাচুর্য হবে, কিন্তু তার মানে কি মানুষ নিজের কথা ভাববে না?

ভাববে, বেশি করে ভাববে।

তোমার সেই ডায়েরি কোথায়?

অবাক হয়েছিল কৃষ্ণেন্দু, এতবছর বাদে আবার ডায়েরির কথা উঠতে। তখন সুদামা বলেছে, ডায়েরিতে এসব লিখে রাখো।

হা হা করে হেসেছিল কৃষ্ণেন্দু, ডায়েরি লেখার সময় কই মানুষের? দিস ইজ দ্য হাই টাইম টু অ্যাচিভ মোর, মোর অ্যান্ড মোর। আরও বেশি ভিটামিনের মতো, মানুষের এখন আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা দরকার। বহু বছর আমরা অনর্থক নষ্ট করেছি। সময় চলে গেছে হু-হু করে। এখন সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী হল ঘড়ি।

সময় নষ্ট হয়েছে! কিসে? প্রেমে ভালোবাসায়, সুদামার জন্য নিদ্রাহীনতায়, কৃষ্ণেন্দুর জন্য রাত জাগায়। ঘড়ি কি প্রেমের সময়টুকুও কেড়ে নিচ্ছে? নিয়েছে?

ঘুম এসে যাচ্ছিল সুদামার। তখন ফোন বাজতে আরম্ভ করল। নতুন বছরের ডায়েরি পেন একধারে পড়ে আছে। আজই প্রথম পাখা চলল এই ঘরে।

সল্টলেক সিটির বালির মাঠ তপ্ত হতে আরম্ভ করেছে মধ্য বসন্তেই। সুদামা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায় একটু সময় নিয়ে। বেজে বেজে যদি থেমে যায় তো যাক। ফোনটা তো কৃষ্ণেন্দুর। ভোরে বেরোনোর সময় সে-ই কৃষ্ণেন্দুকে বলে দিয়েছিল, কী হল জানায় যেন। আজকের দিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি হল, আরও বেশি ভিটামিন, 'টু অ্যাচিভ মোর, মোর অ্যান্ড মোর'-এর প্রথম নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। তিনশো বিঘে দো-ফসলি চাষের জমি অধিগ্রহণ করা তো সহজ কথা নয়। জমির অবস্থানটি ভালো, ইনফ্রাস্ট্রাকচার — জল, বিদ্যুৎ, বড়ো পাকা রাস্তা সবই আছে। জমি দেখে গ্যাস কোম্পানি খুশি। দেওয়া নেওয়া নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল অনেকদিন। পঞ্চায়েত, গ্রামবাসীকে নানাভাবে বোঝাতে হয়েছে। ক্ষতিপূরণের নানারকম প্যাকেজ ঘোষণা করতে হয়েছে। নানারকম স্বপ্ন দেখাতে হয়েছে। রং চড়াতে হয়েছে। সব করেছে কৃষ্ণেন্দু, আর তার সহকারী সুহাস বোস।

ফোনটা কৃষ্ণেন্দুর। জানাবে, সব কাজ পিসফুলি, ওকে। ফিরতে দেরি হবে। সুদামা নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। পুলিশ বন্দুক নিয়ে ফসল ভরা জমি দখল তো সামান্য বিষয় নয়। ফোনটা তুলল সে আধো ঘুম চোখে। টেনে নিয়ে অলস গলায় বলল, হ্যাঁ বলছি, সব হয়ে গেছে তো?

ম্যাডাম আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, ডিস্টার্ব করলাম ম্যাডাম?

চোখ খুলে যায় সুদামার ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে সে। না, কৃষ্ণেন্দু তো নেই ওপাশে। সুহাস বোস, তার সহকারী, খুবই বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করছে, তার ঘুম ভাঙাল কিনা। সুহাস রাজারামপুর পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন করছে। স্যার জানাতে বললেন....

তিন

ফোন রেখে দিয়েছিল সুদামা ওপারের মানুষ কিছু আন্দাজ করার আগেই। বোধহয় আরও একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল সুহাসের। সুদামার সঙ্গে সুযোগ পেলেই আলাপ দীর্ঘ করতে চায় সে। বসের স্ত্রীকে খুশি রাখার

নিয়মেই হয়তো। এটা লক্ষ না করে পারেনি সুদামা। কারণ যাই হোক, সুহাস আলাপ থামাতে চায় না। হ্যাঁ খুবই বিনীত। কৃষ্ণেন্দুই সুহাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুহাস না থাকলে সে দম ফেলতে পারত না। তার অনেক কাজই তো সুহাস করে দেয়। যোগ্য সহকারী।

সেই যোগ্য সহকারী কৃষ্ণেন্দুর মুখ থেকে বাক্য স্ফুরণের অপেক্ষাটুকুই করে শুধু। বাকিটা বুঝে নেয়। মাঝে-মধ্যে সুদামাকে টেলিফোনে জানায়, কৃষ্ণেন্দু দেরিতে ফিরবে, কাজে ফেঁসে গেছে তারা। এখনই বড়ো একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে বাইরে। কম্পিউটার রুমে কেরানির সঙ্গে বসে আছে সাহেব। কখন যে শেষ হবে! সে ফ্যাক্স করল এখনই, রিপোর্ট যাচ্ছে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, সুহাস আন্দাজ করতে পারে চমৎকার। ফলে কাজ এগিয়ে থাকে। এখন এই সন্ধ্যায়, রাজারামপুর থেকে সুহাস এবং অনিলবরণ ঘোষচৌধুরীকে নিয়ে ফিরেছে কৃষ্ণেন্দু তার ফ্ল্যাটে। সারাদিন খুব পরিশ্রম গেছে, সন্ধেতে রিল্যাক্স করবে।

রাজারামপুরে তিনশো বিঘে জমি দখল করা হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ, একেবারে নিঃশব্দে। গ্রামে কোনো মানুষ ছিল বলে ধরাও যায়নি। গ্রামের লোককে বারণ করা সত্ত্বেও ওরা জমিতে ধান রুয়ে দিয়েছিল উচ্চ ফলনশীল।

এইরকমই হচ্ছে গত বছর দেড়েক ধরে। বার বার বারণ করা হচ্ছে গ্রামের মানুষকে জমিতে ফসল না ফলাতে। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে রোয়া বোনার সিজিনে মানুষ প্রতিবার নেমে পড়ছে জমিতে। জমিকে বিশ্রাম দিচ্ছে না। উচ্চ পর্যায়ে মিটিং করে জমি দখলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে অনেকদিন। গ্যাস কোম্পানি জমির দামও জমা দিয়ে রেখেছে সরকারি কোষাগারে। সেই টাকাতেই ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা। সব-ই ঠিকঠাক। কিন্তু জমি দখলের তারিখই বদলে গেছে বার বার। জমি কখনও ফাঁকা থাকছে না। ফসল ভরা জমির দখল নেওয়া একটু সমস্যার। তাতে প্রতিক্রিয়া খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। সেই সুযোগটিই নিয়েছে রাজারামপুরের মানুষ। ফসল ফলানোর প্রক্রিয়া কখনও থামিয়ে রাখেনি তারা। বীজতলা তৈরি, ধান বোনা, ধান রোয়া — এইসব ক্রিয়া কর্মগুলিকে ব্যবহার করছে জমি রক্ষার জন্য। অথচ ধান বোনা, রোয়ার অধিকারের জন্যই তো মানুষ জমি রক্ষার লড়াই-এ শামিল হয়। চিরকাল তাই হয়েছে। যাবতীয় কৃষক আন্দোলন, জমি দখলের আন্দোলন তো ফসল ফলানোর অধিকার অর্জনের জন্য। এখানে জমির অধিকার কায়েম রাখার জন্য রোয়া বোনা চলেছে। গত সিজিনে বারণ করা হল চাষিদের জমিতে নামতে, রোয়া বোনা করতে। নোটিশ করে দেওয়া হল জমির পজেশন নেওয়ার তারিখ জানিয়ে। কিন্তু চাষিরা জমিতে আগে-ভাগে নেমে পড়ে চাষ করে দিল। চাষের জল তো ওই এলাকায় সহজ লভ্য। রাজারামপুরের গা দিয়ে তিরিশ বছর আগে কাটা ইরিগেশন ক্যানেল। সেই ক্যানেল জল দেয় প্রচুর। সেই জলই জমির প্রকৃতি বদলে দিয়েছে। এক ফসলি থেকে দো-ফসলি, দুবার ফসল করেও তৃতীয়বারের চাষে গত দেড় বছর ধরে ব্যাপক মানুষ

শামিল হয়ে পড়েছে। দু-বার ধান, একবার নানান সবজি, কলাই। ফসল দিয়েই তারা জমির দখল কায়েম রাখতে চেষ্টা করছে। এছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, ভূমি রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল কিছু মানুষ। কিন্তু রাজনৈতিক সমর্থনবিহীন আন্দোলন এগোতে পারেনি। আর আন্দোলনের নেতাদের খুব সহজেই গ্যাস কোম্পানি কিনে নিতে পেরেছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে। বটলিং প্ল্যান্ট মানে তো শুধুই তা-ই নয়। আরও ছোটো ছোটো শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হবে এ দিয়ে। রোজগারের নানারকম পথ খুলে যাবে। গ্যাস ডিলারশিপ, কন্ট্রাক্টরির সম্ভাবনা অনেক। আন্দোলন ভেঙে গেল বটে, কিন্তু গ্রামের মানুষের নিঃশব্দ প্রতিরোধ বন্ধ হল না। কতবার যে মিটিং হল, তারিখ ঠিক হল জমি দখলের। কিন্তু ফসলের প্রতিরোধে তারিখ বদলে যায় বারবার। শেষে পুলিশের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ক্যানেলের জল বন্ধ করে দেওয়ার। ছ-মাসের জন্য রাজারামপুর ইরিগেশন ক্যানেলের জলপ্রবাহ বন্ধ থাকুক। তা সম্ভব নয়। কেননা, ওই ক্যানেল তো শুধু তিনশো বিঘেতে জল দেয় না। বিস্তীর্ণ এলাকাকে সবুজ করেছে ওই ক্যানেলের জল যা হুগলি নদী থেকে আসে। গ্রামের মানুষ নিশ্চুপে তাদের কাজ করে যাচ্ছিল। জমির লড়াই চলছিল গোপনে। এবারও ধানকাটা হয়েছিল ডিসেম্বরে। তারপর আবার জানানো হয়েছিল নোটিশ করা জমিতে যেন ফসল না-রোপন করে চাষিরা। জানুয়ারি মাসে প্রশাসন অন্য বিষয়ে ব্যস্ত থাকে। পুলিশ পাওয়া সম্ভব হয় না, সরকারি কর্মীও অপ্রতুল হয়ে ওঠে সাগর মেলার কারণে। সেই সুযোগ নিয়েছে গ্রামের মানুষ। সুতরাং, শেষ অবধি নতুন রোয়া ধান সমেত জমি দখল করা হল। চাষিদের ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এল পি জি সংস্থা আর দেরি করতে রাজি হচ্ছিল না।

ফসল সমেত জমি দখল করতে যে হাঙ্গামার কথা আন্দাজ করে প্রায় শ-ছয়েক রাইফেলধারী নামানো হয়েছিল আজ, তাদের রাইফেলের একটি গুলিও খরচ করতে হয়নি। সুদামাকে সব জানতে হচ্ছে এক একজনের মুখ থেকে। সে এখন এই মুহূর্তে ব্যালকনিতে, চেয়ার ঘুরিয়ে তিন পুরুষের দিকে তাকিয়ে। সুহাসের চোখ তার চোখে। সুহাস মদ্যপান করে না, করলেও বড়োজোর এক পেগ; অভ্যাসটা তাকে ধরাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু। অন্য দু-জন তো রীতিমতো অভ্যাসের দাস।

সুহাস বলল, ম্যাডাম ফোনটা রেখে দিলেন তখন।

সুদামা কিছু বলল না সঙ্গে সঙ্গে, একটু সময় নিয়ে বলল, জেনে গেলাম তো, আবার কী? আপনাদের অফিসের কাজে আমার কোনো কৌতূহল নেই।

সুহাস চুপ করে যায়। সুদামা চেয়ার ঘুরিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে। এখন এই লবণ হ্রদ উপনগরীতে ফুল ফোটে অনেক। মার্চের সন্ধে চমৎকার। পথে বেরোলেই দু-পাশে কাঠগোলাপের গাছ, ফুটফুটে সাদা পাখির মতো ফুলে ভরে গেছে। একবার বাই-কার পুরুলিয়া যাওয়ার পথে আচমকা গাড়ি বিগড়ে ছিল বাঁকুড়ার কোনো এক গ্রামের কাছে। পথের ধারে মস্ত তেঁতুল গাছে বিকেলে হাজার বক। গাছ সাদা

হয়েছিল। অবাক হয়ে সেই আশ্চর্য বকের গাছ দেখেছিল সে। সন্ধেয় উপনগরীর আধা নির্জন পথের দু-পাশে মাঝারি উচ্চতার অনেক হাত ছড়ানো হাত বাঁকানো কাঠগোলাপ গাছ দেখলে সেই স্মৃতি ঘুরে আসে। ফুল নয় যেন সাদা পাখি এসে বসে আছে ডালে ডালে। কত রকম গন্ধ এখন হাওয়ায়। নিম, কাঠগোলাপ, আচমকা আম-মুকুল। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সব টের পাওয়া যায়। সুহাসের কণ্ঠস্বরে সুদামা উৎকর্ণ হল। কী বলছে!

সুহাস বলছে, ওই জমি না দেখানোই ঠিক ছিল, গ্রিন দেখেই ওদের পছন্দ হল, অথচ গ্রিন তো নষ্ট করবেই।

জমিটা কী দোষ করল? প্রশ্ন অনিলবরণের।

ওদের তো দরকার জমি, গ্রিন নয়। সুহাস বলে।

অনিলবরণ বিরক্ত হল, ভ্যাকান্ট ল্যান্ড, ফ্যালো ল্যান্ড তুমি পাবে কোথায়?

সার্চ করতে পারতাম, দেখলাম আর দিয়ে দিলাম, এটা ঠিক নয়। সুহাস বলে।

অনিলবরণ আচমকা হেসে ওঠে, তুমি যেমন! ও কৃষ্ণেন্দু, এ যে চাঁদের গায়ে চাঁদ, সোনার চাঁদ লেগেছে আমি করব কী?

সুহাস বলে, ঠাট্টার ব্যাপার নয় স্যার, আসলে এই কথা এতদিনে আমারও মনে হয়নি। আজ অনেকদিন বাদে রাজারামপুর গেলাম। আজ জমি পজেশন নেওয়া হল। চাষির জমি চলে গেলে যে কী হয় আমি তো কিছুটা বুঝি, শিকড় এখনও ছেঁড়েনি, যখন প্রথম গিয়েছিলাম তখন হাই-ইল্ডিং ক্রপ তোলা হয়ে গেছে। আমন ছিল না, চাষ হয়নি তখনও, ফাঁকা শুকনো মাঠ, আজ ক্রপ দেখে যে কী হল?

কী হল? অনিলবরণ মোটা গোঁফের ফাঁকে হাসে, কী হল বলো?

ফসল দেখলে আপনার ভালো লাগে না? পালটা প্রশ্ন করল সুহাস।

ফসল না ফসলভরা জমি? অনিলবরণ জিগ্যেস করে।

জমি। সুহাস উচ্চারণ করে।

অনিলবরণ বলে, না, বরং মরুভূমি চমৎকার লাগে। পতিত লালমাটির ডিহি, মাঠ।

সুহাস বলে, আপনার সঙ্গে আমার মেলে না। কারওরই মেলে না।

মেলে না কেননা সবাই একইরকম ভাবে ভাবতে ভালোবাসে, আরে বাবা ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা — সেই পাঁচবছর বয়স থেকে শুনছি। এর ভেতরে নতুন কী আছে। মরুভূমিতে গেছ কখনও?

সুহাস মাথা নাড়ে।

তাহলে আর কী বুঝবে। এক ভয়ংকর সৌন্দর্য। রোদে পুড়তে পুড়তে জল না পেয়ে মরেই গেলে হয়তো। তুমি ম্যাকেনাস গোল্ড দেখেছিলে?

দেখেছিলাম বোধহয়। নিস্পৃহে উত্তর দেয় সুহাস।

চোরাবালিতে ডুবে মৃত্যু দেখেছিল?

সুদামা অবাক হয়ে দুজনের কথোপকথান শুনছে। দেখছিল কীভাবে অনিলবরণ ফসল ভরা জমিকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় রাজারামপুরের সবুজ কৃষি ভূমি, কোথায় মরুভূমির বালি, চোরাবালি, মৃত্যু। চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া সেই স্বর্ণসন্ধানীর কথা শোনাচ্ছে অনিলবরণ। পারেও বটে মানুষটা ঘুরে ফিরে তার নিজের পছন্দের দিকে চলে যাবেই। চোরাবালির ভেতরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে স্বর্ণসন্ধানীর দেহ। পা থেকে হাঁটু, হাঁটু থেকে কোমর, কোমর থেকে বুক...। মানুষটি আঁকড়ে ধরতে চাইছে মাটি। মাটি মানেই তো বালি, চোরাবালি, তার কোনো ভার নেই। সর সর করে সরে যাচ্ছে হাত। মানুষটার চোখমুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে আতঙ্ক। তার সহযাত্রী স্বর্ণসন্ধানী, তিনি বোধ হয় ছিলেন গ্রেগরি পেক, নিরাপদ দূরত্ব থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন দড়ি। দড়ি হাতের নাগালে এসেও আসছে না। আস্তে আস্তে মানুষটি তলিয়ে গেল বালির ভেতরে। বালি আবার শান্ত, নিশ্চুপ। একেবারে নিরাপদ চেহারা নিয়ে পড়ে থাকল মরুভূমির ভেতরে। অপেক্ষা করতে লাগল আর একটি শিকারের জন্য। আর একটি মানুষের মরণ হয়ে পড়ে থাকল হিলহিলে রোদ্দুর।

সুহাস বলল, এসব আমার মনে আছে।

তবে বোঝো, মৃত্যুর অমন চেহারা কি কখনও দেখেছ? যাচ্ছিল সোনার সন্ধানে, হারিয়ে গেল বালির ভেতরে —

সুহাসের মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে হাত তুলল, আমার ভালো লাগছে না এসব শুনতে।

ভালো না লাগলে হবে, দেখো ভায়া এসবই হল রিয়ালিটি।

আপনি থামুন।

হা হা করে হাসে অনিলবরণ, বলে, গেল সোনার সন্ধানে, পেয়ে গেল মৃত্যুর সন্ধান। অবশ্য শেষপর্যন্ত সবাই তো মরে না, কেউ কেউ মরে। যারা মরে তাদের মৃত্যু ওইরকম হয়, ভয়ংকর সুন্দর —

সুহাস বলে, আমি বলছিলাম গ্রিনের কথা, সবুজ ফসলের জমি, যা আমরা আজ দখল করেছি — আমরা কি ঠিক করেছি ওই ইরিগেটেড জমি প্রজেক্টের জন্য অ্যাকোয়ার করে?

অনিলবরণ বলে, বাজে কথা বলছ, তোমার নেশা হয়ে গেছে।

না, না আমি ঠিক আছি, আমি বলছি গ্রিইন....।

ঠিক নেই তুমি। অনিলবরণ ঢুলছে, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে স্বর্ণসন্ধানী, সোনার খোঁজে বেরিয়েছ।

স্টপ ইট। সুহাস চিৎকার করে ওঠে, চুপ করুন মিঃ ঘোষচৌধুরী।

অনিলবরণ হাসে। সুহাসের কাঁধে হাত রাখে। বিড়বিড় করে, আমি কিন্তু ভুল বলছি না।

হ্যাঁ বলছেন।

তাহলে বলছি। উদাসীন হয়ে যায় অনিলবরণ।

সুহাস মুখ গম্ভীর করে টলতে থাকে। বিড়বিড় করতে থাকে, গ্রিইনের মূল্য কে বুঝবে, যারা চাষ বাস করেনি, ফসল ভরতি জমির মর্ম বুঝতে ফসল ফলানোর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হয়....। সুহাস আপন মনে বকবক করতে থাকে।

চার

সুদামা ক্রমশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে সুহাসের প্রতি। একত্রিশ বত্রিশের বীরভুমের এই যুবককে তার মনে হয় অতি সাধারণ, অফিস কর্তার পিছনে ঘুর-ঘুর করা আর পাঁচটা চাকুরের একজন, যে বড়ো সায়েবের ফোন এলে ক্রমাগত স্যার, স্যার, ইয়েস স্যার উচ্চারণ করে কৃষ্ণেন্দুর মতো, যে বড়োকর্তার ফাইফরমাশ খেটেও নিজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে চায়। কিন্তু কী বলছে সেই সুহাস? ও বীরভূমের গ্রামের ছেলে, বাবা প্রাইমারি স্কুলের টিচার, ওদের চাষের জমি আছে দশবিঘের মতো। প্রতি অঘ্রানে ধান ওঠে। না, দুটো ক্রপ ওদের জমিতে হয় না। ওখানে সেচের ব্যবস্থা নেই। সেচের সুফল পাওয়া দু-ফসলি জমি তারা আজ দখল করল, মন খারাপ হয়ে গেছে সুহাসের। এই সময়ে তাদের খয়রাশোল ব্লকের সব গ্রাম রোদে পোড়ে, শুধুই পোড়ে। জমির হাড়গোড় বেরিয়ে যায়। ধুলো ওড়ে শুধু ...

অনিলবরণ হাসে, হুইস্কি কিক করছে তোমাকে সুহাস, জমি বাদ দিয়ে গান গাও দেখি, চাঁদের গায়ে ....।

মাথা নাড়ে সুহাস, নো স্যার, আমার মনে পড়ছে চাষি বউটার কথা, কিষাণী। ওই যে বলছিলাম চাষিরাই বোঝে সবুজের মর্ম ....।

হা হা করে হাসে অনিলবরণ। কিষাণী, চাষি বউ। দারুণ বলেছে তো সুহাস। এত পুলিশ, অফিসার গেল, মনে পড়ল শুধু চাষি বউকে, হ্যাঁ বয়স অবশ্য কমই ছিল! সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, কৃষিকর্ম নিপুণা ....।

অনিলবরণ একটু ভোঁতা প্রকৃতির। নেশা করলে বেসামাল হয়। তার কথার আগল থাকে না কোনো। লোকটা কৃষ্ণেন্দুর সহকর্মী। এই ফ্ল্যাটে এসেছে অনেক, বউ নিয়েও এসেছে, কিন্তু সুদামার ওকে একদম পছন্দ হয় না। হৃদয়হীন মানুষ, অফিসেও নাকি খুব বদনাম ওর। কারওর সঙ্গেই ভালো করে কথা বলে না। সাব-অর্ডিনেট স্টাফরা তো ক্ষেপেই থাকে সর্বক্ষণ। ওর বউও নাকি ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ওইরকম লোকের সঙ্গে কেউ সংসার করতে পারে। সারাক্ষণই খুন জখম মৃত্যু রক্তপাত নিয়ে কথা বলে রহস্য ঔপন্যাসিক অনিলবরণ। হা হা করে হাসে।

অনিল বলল, চাষি বউটার জন্য কষ্ট হচ্ছে তোমার, আরে বাবা বললে না কেন, পুলিশ দিয়ে তো তোলাই যেত আজ। থানায় ভরে দিতাম। তারপর তোমাকে সুযোগ দিতাম, হ্যা হ্যা হ্যা, আলাপ করতে লকআপে ঢুকে। হা হা হা, তুমিই হলে আসল স্বর্ণসন্ধানী সোনাটা চিনেছ, চোরাবালিতে পড়া না-পড়া তোমার ইচ্ছে।

সুদামা অন্ধকারে সরে গেছে আরও। সে যদি আলোয় থাকে দরজার গোড়ায় তো ওরা ইচ্ছে মতো আলাপ করতে পারবে না। তার কৌতূহল বাড়ছিল। সে আন্দাজ করছিল, করতে চেষ্টা করছিল কী হয়েছে আজ। কে সেই চাষি বউ, যাকে নিয়ে অনিলবরণের রসিকতা।

কৃষ্ণেন্দুকে বলছে সুহাস। কৃষ্ণেন্দু ওই সামান্য ঘটনাটির কথা জানে না। সে তখন ওই স্পটে উপস্থিত ছিল না। উপস্থিত থাকার কথাও ছিল না তার। সে ছিল রাস্তার ধারে, একটি ক্লাব ঘরে এল পি জি সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত। দু-একটা প্রয়োজনীয় বিনিময়, সামান্য সময় খোস-গল্প, ইত্যাদিতে মগ্ন। আজ তো গ্রামের মানুষকে ঘরেই রেখে দিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। ভোরবেলায় রাজারামপুর গ্রামে রাইফেলধারীরা নেমে গিয়েছিল। ওই গ্রামে যত পুরুষ মানুষ ছিল, তার দশগুণ ছিল রাইফেলধারী, টিয়ার গ্যাস, লাঠি-ঢাল সমেত পুলিশ। সাবধানতার কোনো ত্রুটি ছিল না। অত উর্দি রাইফেল দেখে পুরুষ মানুষরা ঘর থেকে বেরোয়নি। পাড়ার মুখে মুখে, রাস্তার প্রতিটি বাঁকে, ঝোপেঝাড়েও পুলিশ বসিয়ে দিয়েছিল প্রশাসন। এইভাবেই হয়ে থাকে। মানুষের বেরোনোর সব পথ বন্ধ করে গ্রাম জনবিরল করে দেওয়া হয়েছিল। আগে কতকগুলি জোনে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল গোটা বসতিকে, সেইভাবে পাহারা বসানো হয়েছিল। একটা মানুষও বেরোয়নি, দু-একজন বৃদ্ধ প্রশ্ন করতে এলেই তাদের ঝটপট করে সরিয়ে দিয়েছিল রাইফেলধারীরা চোখ রাঙিয়ে।

কিন্তু এত সতর্কতার ভিতরে ও মাঠে চলে গিয়েছিল দু-চারজন। তাদেরও সরিয়ে দিতে অসুবিধে হয়নি। অসুবিধে হয়েছিল এক চাষি বউয়ের বেলায়। পুরুষ মানুষ ঘরে, সে বেরিয়েছিল। রাইফেলধারীদের নজর এড়িয়ে আড়াল-আবডাল দিয়ে রোয়া জমিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হয়তো ক্ষীণ আশা ছিল জমিতে যখন ধান, জমি দখল করবে না গ্যাস কোম্পানি। জমির ধানই জমিকে তো রক্ষা করেছে এতদিন, এবারও তাই হবে। এইভাবেই যেন জমি চিরকাল রক্ষা করা যাবে। ধানকাটা পর্যন্ত সময় দেবে। ধানকাটার পর আবার ফসল ফলানোর আয়োজন করে পিছিয়ে দেওয়া যাবে অধিগ্রহণের দিন। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, শাল-খুঁটি পোঁতা হয়ে যাচ্ছে জমির সীমায়, তখন বউটি জমির আলে বসে পড়েছিল। একটু গলা তুলে বলেছিল, কাঁচা ধান যেন নষ্ট না করে পুলিশ, জমিতে যেন না নামে মজুররা, যারা শাল-খুঁটি কাঁধে নিয়ে সার্ভে পার্টির পিছনে পিছনে হাঁটছিল। কিন্তু কথা হল এই, মেয়েমানুষটা এল কী করে এতদূর? চাষ করতে কে বলেছিল তাকে? পুলিশের কথা হল এই রকম।

সুহাস বলছে, মানুষের কৃষিকর্মের অভ্যাস তো বহুকালের। মানুষ তো অভ্যাসে চাষ করে। আকাশে মেঘ উঠলে সবচেয়ে খুশি হয় কে? আকাশের পাখি, গাছ আর চাষি মানুষ। পুলিশ খুব খারাপ ব্যবহার করছে ওই বউটির সঙ্গে। অশ্লীল ভাষায় তাকে গালিগালাজ করেছিল।

কী রকম! না এক রাইফেলধারী কনেস্টবল প্রথমে বলল, উঠে যান জমি থেকে, ক্রপ কমপেনসেশন তো দেবে! আমাদের কাজে বাধা দেবেন না।

বউটি শোনেনি। তার বয়স কম। তার রাগও তাই বেশি। তেজও। তেজেই বলেছিল, তার জমি বাদ দিয়ে দিক বাবুরা। ধান নষ্ট করে যেন কোনো কাজ না হয়।

তখন পুলিশ ভয় পাওয়াল বউটিকে। ভয় দেখানো প্রয়োজন ছিল। না হলে সে জমি থেকে উঠতই না। এক রাইফেলধারী বলেছিল, যদি জমি থেকে না ওঠে সে, তবে তুলে নিয়ে গিয়ে লকআপে ভরে কেসে ঝুলিয়ে দেবে।

আর একজন আর একটু বাড়িয়ে বলল, তাতে ছ-মাস জেল, দশ হাজার টাকা জরিমানা।

চোখ রাঙানো তৃতীয় রাইফেলধারী, গর্জে উঠেছিল, যা ভাগ, লকআপে চোর-ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে গুণ্ডা বদমাশের সঙ্গে যদি সারা রাত্তির থাকিস তো কী হাত পারে জানিস! বেটাছেলেদের ঘরে থাকবি রাতভর।

অনিলবরণের মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বলল, ঠিকই তো বলেছে, মেয়েছেলের জন্য যদি আলাদা লকআপ না থাকে তো কোথায় রাখবে, দারোগাবাবুর ঘরে?

সুহাস বলল, কথাগুলো বলাই তো ঠিক নয়, কোনো মহিলাকে সন্ধের পর থানা আটকে রাখতে পারে না। আর কথাগুলো খুব খারাপভাবে বলেছিল স্যার।

অনিলবরণ নিশ্চুপে মদ্যপান করে। বলল, তুমি একেবারে বাচ্চা। পুলিশকে ভয় না দেখালে চলে। আরে বাবা গায়ে তো হাত দেয়নি, আঁচল ধরে তো টানেনি। আর মেয়েটাই-বা কী রকম! অত পুলিশের ভেতরে চলে গেল? ভয় করল না?

বাহ! জমিটা তো তার।

হা হা করে হাসে অনিলবরণ, জমি আমাদের। মানে গভমেন্টের। আমরা ইচ্ছে হলেই নিয়ে নেব। স্টেট প্রয়োজন হলে সব কিছু করতে পারে, মানুষ মারতে পারে, মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে। ওর স্বামীই-বা কীরকম, বউকে পাঠিয়ে দিল পুলিশের ভেতর? জানে না পুলিশ কোনো সুবোধ বালক নয়।

সুহাস বিড়বিড় করে, আমরা ওই রকম এ ক্লাস ল্যান্ড না নিতেই পারতাম, কী চমৎকার ফসল হয়। দেখুন স্যার চাষিরাই এদেশে একমাত্র কাজ করে, সময়ের কাজ সময়ে করে, শ্রাবণে অঘ্রানে বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে, তারা ধান রোয়া ধানকাটা বন্ধ রেখে ঘরে বসে তাস খেলে না, সিনেমার নায়িকার শরীর নিয়ে গল্প করে না, রহস্য উপন্যাসের খুনের বিচিত্র উপায় নিয়ে ভাবেও না। দে আর ডিসিপ্লিনড, পাঞ্চুয়াল, লেবোরিয়াস।

অনিলবরণ ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে নেশার টানে, মাথাটা তুলে বলল, রহস্য উপন্যাসে খুনের উপায়! হোয়াট ডু য়্যু ওয়ান্ট টু টেল, ওটা কোনো কাজ নয়। তুমি কি জানো মার্ডার ইজ অ্যান আর্ট, মূর্তি মার্ডার সম্পর্কে কী জানো, জানো মানুষের ভেতরে সবচেয়ে প্রখর দুটো ইনসটিঙ্কট, সেক্স অ্যান্ড মার্ডার, ছেলেবেলায় পিঁপড়ে টিপে মারতে না?

অনিলবরণ আবার তার প্রসঙ্গে চলে গেছে। মার্ডার নিয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করল। কেউ শুনছে কিনা সে বিষয়ে তার কোনো কৌতূহল নেই, নেশার ঘোরে তা থাকার কথাও নয়। সুহাস সরে গেল কৃষ্ণেন্দুর কাছে, সে বোঝাচ্ছে কৃষ্ণেন্দুকে, স্যার, আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমরা আমাদের ডিউটি ঠিকমতো করিনি। জমি চাইছে বিভিন্ন সংস্থা, ডেভেলপমেন্ট হবে। আমরা তো পরিশ্রম করে পতিত জমি, ফসলহীন জমি খোঁজ করে তাদের দেখাব। তা না করে চাষের জমি দিয়ে দিলাম, চাষই হওয়া উচিত আমাদের ডেভেলপমেন্টের হাতিয়ার, আমাদের চাষিরা কী চমৎকার ফসল ফলায়, যখন ধান ওঠে, কী ধান কী ধান! যখন, ধরুন শীতের সবজি, কপি ওঠে, কপির পাহাড়, এত ফসল কোথায় হয়? অথচ এসব আমরা ভাবছি না, এটাই হল ব্যুরোক্রেসির দোষ, ক্ষমতাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করি না আমরা।

কৃষ্ণেন্দু গম্ভীর। তার নেশা হয় না। নেশা হলেও অচঞ্চল থাকে সে। সে সুহাসের কথা শোনে, কিন্তু মন্তব্য করে না। মাতালের কথার কোনো মানে নেই, তাই। সুহাস সাড়া না পেয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ানো সুদামাকে খোঁজে। সে তার যুক্তির সমর্থক খুঁজে পেতে চাইছিল। আর তখন অনিলবরণ তা বক্তৃতায় কোনো

সাড়া না পেয়ে আচমকা সুহাসের পিঠ চাপড়ে দেয়, তুমি বড্ড বেশি কথা বল, বেশি ভাব, বেশি বুদ্ধিমান মনে কর নিজেকে, বেশি চালাক, চাষি-দরদী! অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হচ্ছ এইভাবে? আরে শালা, পুলিশ তো অত্যন্ত ভদ্র-সভ্যের মতো কাজ করেছে আজ, সেই রকম ডিরেকশন ছিল। তা যদি না করত তাতেই-বা কী ক্ষতি হত, পুলিশকে লোকের ভয় করা উচিত, তা না হলে শাসনই থাকে না, তখন তোমার আমার মূল্য কী! পুলিশ দিয়েই তো রাজ্য শাসন হয়, মন্ত্রী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার, বিচারপতি সবার ক্ষমতার উৎসই তো পুলিশ। দরকারেই আমরা পুলিশ ডাকি। আরে বাবা পুলিশের প্রতি যদি ভয় না থাকবে, কাজ হবে কী করে? ভয় পাওয়ানোর জন্য একটা দুটো রেপ, লকআপে থার্ড ডিগ্রি দরকার। আই সাপোর্ট ইট। এসব ঘটে বলেই না মানুষ পুলিশকে যমের মতো ভয় করে — বলে হা হা করে হাসতে থাকে অনিলবরণ, শোনো সুহাস, মার্ডারের নানান কেস হিসট্রি আমি পুলিশের কাছ থেকে নিচ্ছি, যদি শুনতে তুমি।

সুদামা এইসব শুনতে থাকে। বাধ্য হয় শুনতে।

পাঁচ

অনিলবরণ, সুহাস চলে গেল সাড়ে আটটার পর। এই সাড়ে আটটা পর্যন্ত সুহাস আর অনিলবরণের তর্কাতর্কি চলতে লাগল। অনিলবরণ বারংবার বোঝাতে লাগল শাসন বজায় রাখার জন্য পুলিশের কাজে মাথা গলানো ঠিক নয়। শাসন বজায় রাখার জন্য পুলিশকে অনেক কিছু করতে হয়। ধর্ষণও করতে হয়, পিটিয়েও মারতে হয়। একটা দুটো এমন কেস হয়ে গেলে লোকে সন্ত্রস্ত থাকে। ওইটা প্রয়োজন। বড়ো কাজে যখন নামে পুলিশ, আচমকা এমন হয়ে যেতে পারে। এ নিয়ে কাগজ হল্লা করতে পারে, কিন্তু তাতেই-বা কী! পুলিশ দেখলে মানুষের কাপড় যদি না ভিজে যায়, তবে কাজ হবে কী করে? আসলে দেখা দরকার কাজটা হয়ে উঠল কিনা। এসব ঘটনা তুচ্ছ। কে কাকে খিস্তি মেরে কী বলল, কটা মানুষের মাথা ফাটল লাঠির ঘায়ে, কোন মেয়েছেলের গায়ে হাত দিল, তা নিয়ে মাথা ঘামালে সুহাস প্রশাসনিক কাজই করতে পারবে না।

এই তর্কে কৃষ্ণেন্দু নিরপেক্ষ। মিটিমিটি শুধু হাসতে থাকে। দূর থেকে তার ভূমিকাও পছন্দ হয় না সুদামার। কৃষ্ণেন্দু কি অনিলবরণের মতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে, না হলে তাকে থামাচ্ছে না কেন? দুজন চলে গেলে সুদামা রোষে ফেটে পড়েছে, লোকটা যেন আর না আসে।

কে সুহাস? হাসছে কৃষ্ণেন্দু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সুহাস যেন তোমাদের আসরে আর না আসে। ও এর উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি, খারাপ হয়ে যাবে ছেলেটা।

তুমি কি অনিলবরণের কথা বলছ?

বলছিই তো, ও না উপন্যাস লেখে! লোকটা কি পাথর?

কৃষ্ণেন্দু বলে, পাথর নয়, মানুষই, ও এসব বলে ইচ্ছে করে, সুহাসকে রাগাবার জন্য আজ বলছিল।

রসিকতার মাত্রা থাকবে তো।

কৃষ্ণেন্দু তখন খেতে চায়। সে আর কথা বাড়াতে চাইছিল না। কিচেনের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণেন্দু। সুদামা গ্যাস ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে একটু নিচু হয়ে সিলিন্ডারের নব অন করতে গিয়ে চমকে ওঠে, এ কী! একটি ওভেনের নব তো খোলা। ছোটোটা, যেটি ব্যবহার হয় কম। সরে দাঁড়াতেই আবার খেয়াল হল গ্যাস সিলিন্ডারের নবে চাপ দিয়ে সে সরে এসেছে। হাত বাড়িয়ে ওভেনের নব না সিলিন্ডারের নব করতে করতে এক দু-সেকেন্ড যেতেই কৃষ্ণেন্দুর খেয়াল হয়, কী করছ তুমি, তোমারও কি নেশা হয়ে গেল।

সুদামাকে সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু ওভেনের নব বন্ধ করল, এটা খুলল কে?

সুদামা বিব্রত হয়ে পড়ে। তাই তো! রান্নার মেয়েটির তো এসব বিষয়ে খুব নজর। সে এই ভুলটা করল নাকি? সিলিন্ডারের চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওভেনের শিখা নিভে যেতে সে মনে করেছিল সবই বন্ধ করা আছে। ছোটো ওভেন ব্যবহার করা হয় খুব তাড়া থাকলে। সময় তো বেশিই লাগে ওতে। আজ তাড়া ছিল কোথায়? কৃষ্ণেন্দু ভোরে বেরিয়েছে। আজ তো শুধু সে খেয়েছে দুপুরে। কাজের মেয়ে বিমলা নিশ্চিন্তে রান্না করেছে। সে নিজে শুধু একবার চা করেছিল চারটে নাগাদ। কিন্তু নিশ্চয়ই বড়ো ওভেনে চাপিয়েছিল জলের পাত্র। তাই-ই তো করে থাকে। নাকি ছোটো ওভেন ব্যবহার করেছিল? ছোটোটায় তো সময় বেশি লাগে। সময় লাগলে তারই-বা ক্ষতি কী! তার তো সারাদিনই কোনো তাড়া নেই। সে তো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা ফেলে না। ঘড়ি তো দ্যাখেই না সে প্রায়। যদি বা দ্যাখে, তার ভেতরে কোনো কৌতূহল থাকে না, তাড়া থাকে না। খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রোব, ওয়াসিং মেশিন, টেলিফোন, টিভি, ঘরের তেলরঙা দেওয়ালে টাঙানো কৃষ্ণেন্দুর মা-বাবার ছবি, নিসর্গ চিত্র, জীবনবিমার ক্যালেন্ডার দেখার মতো করেই দ্যাখে। তার কাছে দেওয়ালের কোয়ার্টাজ ঘড়িটি আসবাবের মতোই হয়ে গেছে প্রায়। হ্যাঁ তাই, এক একদিন বিকেলের দিকে, দুপুরের দিকে, রাতে ফোন এলে, তা কোনো বান্ধবীর হোক বা আত্মীয়-স্বজনের হোক, সে আচমকা তাদেরই জিজ্ঞেস করে, কটা বাজে এখন বলো দেখি? সময়টা শুনে নিয়ে আবার কথা বলতে থাকে।

কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে, বিমলা খুলে রেখে গেছে?

কী জানি! অন্যমনস্কের মতো জবাব দিল সে।

তুমি খুলে বন্ধ করোনি?

আমি তো খুলিনি, এটা তো খুলি না। বলতে বলতে সুদামা ঘুরে ফ্রিজ থেকে মাছ তরকারি বের করতে থাকে। বাইরে থাকুক কিছু সময়, ততক্ষণে ভাত ফুটে যাক। ভাতের পর ওগুলো গরম করে নেবে।

তুমি খোলোনি, বিমলা খোলেনি, তাহলে কে?

সুদামা বিব্রত হয়ে পড়ে। মাথা কাজ করছে না। যদি সে বড়ো ওভেনে চা করে থাকে, যা তার অভ্যেস, তা হলে তখনও কি ছোটো ওভেনের নব খোলা ছিল। ছোটো ওভেন দিয়ে তখন গলগল করে বেরিয়ে আসছিল কুকিং গ্যাস — তরল পেট্রোলিয়াম — যা বাতাসের সংস্পর্শে এসে বায়বীয় হয়ে যায়। যতক্ষণ জল ফুটেছে, যত সময় পাশের ওভেনে আগুন জ্বলছে ততক্ষণ এই ওভেনের গ্যাস আপনা-আপনি বেরিয়ে গেছে। আগুন খুঁজেছে। খোল ছিলা জানালা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সুদামা মাথা নাড়তে থাকে। তা হয়নি। তা না হলে কেউ গ্যাস ওভেন খুলে দিয়ে চলে গেছে। আশ্চর্য! তা হতে পারে? সে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকায়। নেশা কেটে গেছে কৃষ্ণেন্দুর। না কাটলেও খুব ব্যালান্সড মানুষ। ডাইনিং টেবিলের সামনে পাতা চেয়ারে বসে কিচেনের দিকে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণেন্দু।

খেতে খেতে কৃষ্ণেন্দু বলল, আগে ওভেন বন্ধ করে, তারপর সিলিন্ডারের নব বন্ধ করা, এইভাবেই তো করো।

কী জানি!

কৃষ্ণেন্দু বলল, কেয়ারলেস হলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

হাসে সুদামা। তখন ফোন বাজল। সে উঠে গিয়ে ফোন ধরল। আশ্চর্য! ফোন কেটে গেল। গেল কিংবা কেটে দিল ওপাশের লোক। ফোন রাখার শব্দটিও কানে এল যেন। সুদামা ক্রেডলে রিসিভার রেখে ডাইনিং টেবিলে ফিরে এল।

কার ফোন? কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে।

কী জানি, রেখে দিল।

রেখে দিল মানে? কৃষ্ণেন্দু অবাক, রেখে দিল?

সাড়া দিতেই ফোন রাখার শব্দ শুনলাম।

নাকি কেটে গেল লাইনটা?

সুদামা জবাব দেয় না। কৃষ্ণেন্দু বিড়বিড় করে, মনে হয় লাইন কেটে গেছে, আবার আসবে, কিছু হল নাকি রাজারামপুরে?

কৃষ্ণেন্দু ধীরে ধীরে খায়। সুদামার চোখ টেলিফোনে। টেলিফোন আবার বাজবে হয়তো। লাইন কেটেও যেতে পারে, সে ভুল ভেবেছে বোধহয়। কৃষ্ণেন্দু খাওয়া শেষ করে ওঠে। সুদামার খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কোনোরকমে মুখে দুটো দিয়ে উঠে পড়ে। টেবিলে থালা বাসন পড়ে থাকল।

কৃষ্ণেন্দু মুখ ধুয়ে সোজা বিছানায়। এখন রাজ্যের ক্লান্তি তার উপরে ভর করেছে। ঘুম আসছে ঘুম। বিছানায় চিত হয়েই চোখ বন্ধ করল সে। ঘুমিয়েও পড়ল খুব তাড়াতাড়ি। সুদামা মশারি লাগিয়ে, মশারির ভিতরে কৃষ্ণেন্দুকে রেখে বাইরে। বাড়িতে টেলিফোন দুটি, একই লাইনে দুটো রিসিভার, একটি বেডরুমে, অন্যটি ডাইনিং কাম লিভিং-এ। সুদামা বেডরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে যায়। গা-টা কেমন করছে। ভাজা মশলার কৌটো খুঁজতে গিয়ে তার নজরে আসে রুপোলি রঙের ওভেন। দুটি নবই বন্ধ আছে। সে ছোটো ওভেনের নবটি ঘোরায়। ঘুরিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে। তখনই নাকে আসে কাঁচা গ্যাসের গন্ধ। ভক করে বেরিয়ে এল জমা গ্যাস। সে নব ঘুরিয়ে দিয়েই সিলিন্ডারের কাছে নিচু হয়। না বন্ধ আছে। পুরোপুরি কিনা দেখার জন্য হাত বাড়িয়ে নবটি সামান্য ঘোরাতে ঘুরল সেটি। তখনই আবার ফোন বাজল।

ফোন বাজছিল। সুদামার মনে হল কৃষ্ণেন্দুর ঘুম ভেঙে যাবে। সে বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে ধরবে টেলিফোন। কিন্তু ফোন বেজেই চলে। কৃষ্ণেন্দু জাগে না। সে কিচেন থেকে বেরিয়ে ডাইনিং-এর টেলিফোন তোলে, সুদামা বলছি, মিসেস চ্যাটার্জি স্পিকিং...

ওপারে নীরবতা। কানের কাছে চেপে ধরল সুদামা রিসিভারটি। সে আবার বলে, সুদামা বলছি, কে?

ওপারের টেলিফোন থেমে যেতেই তার গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আচমকা। হ্যাঁ, ফোনটা রেখে দিল। খুব ক্ষীণ হলেও সে তো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। এখন দশটা চল্লিশ। পার্লামেন্ট নিউজ টেলিভিশনে। সুদামা চট করে টিভির সুইচ অন করল। ঠিক তাই। পার্লামেন্টে নিউজ পড়ছেন সেই পরিচিত মুখ, কলকাতার মেয়ে, বিবাহের পর পশ্চিম ভারতীয়। চমৎকার পড়েন উনি। উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। এক সময়ে কলকাতার নামি গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতেন। সুন্দরী, সুদর্শনা। পার্লামেন্টে বিজেপি-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সদস্যরা কে কী বলেছেন তার বিবরণ দিচ্ছেন। এই বিবরণই তো ভেসে আসছিল টেলিফোনের ভিতর দিয়ে ক্ষীণভাবে।

বিজেপি, আবার কোথায় একটা মসজিদ নিয়ে প্ররোচনাময় বিবৃতি দিয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ... একটার পর একটা নাম কানে আসতে থাকে সুদামার। বিজেপির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট জনতা সদস্যেরা কী বলেছেন তার বিবরণ দিচ্ছে সুদর্শনা।

অনিলবরণ লোকটা কী রকম! ও কি সত্যিই সুহাসকে রাগাবার জন্য ওই কথা বলছিল? আশ্চর্য! ওর কথা মনে পড়ল কেন সুদামার? লোকটা নাকি খুন নিয়েই ভাবে সব সময়। কতরকমভাবে মানুষ খুন করা যেতে পারে। মার্ডারের সাইকোলজি, রহস্যের জটিলতায় ওর খুব উৎসাহ। এমন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কে

থাকতে পারে? ওর বউ চলে গেছে বাপের বাড়ি। কঙ্কনার সঙ্গে সুদামার ভালোই পরিচয়। এই ফ্ল্যাটে দুই মেয়ে নিয়ে কতবার এসেছে অনিলবরণের বউ। কিন্তু অনিলবরণের সঙ্গে সে যে কবে ভালো করে দুটো কথা বলেছে, তা মনে পড়ে না।

অনিলবরণকে মনে পড়ল কেন তার? সুদামা কেমন যেন শিহরিত হয়। কৃষ্ণেন্দু এখন ঘুমিয়ে। সুদামা মেঝের কার্পেটে বসে। মাথার উপরে ছাদ, ছাদে কী চমৎকার গোলাপি রং। ঘরটিই গেলাপি। টিভির খবর পাঠিকার কণ্ঠস্বর শুনছে সে। মুখ দেখছে না আর। তার চোখের সামনে হত্যা-বিলাসী অনিলবরণের মুখ ভাসে। লোকটা পিকিউলিয়ার। কথাটা মাঝেমধ্যেই বলে কৃষ্ণেন্দু। আজকাল এই রকম মানুষের দেখা পাওয়াই ভার। শেষ পর্যত যেখানে খুনিও খুনকে সমর্থন করে না, সেখানে অনিলবরণ খোঁজে খুনের প্রয়োগ-পদ্ধতির ভেতরে শিল্প-সুষমা! হাস্যকর! আসলে সকলে যে কথা বলে, অনিলবরণ তার বিপক্ষে চলে। বলে রক্তপাত মৃত্যু ব্যতীত কোন বড়ো কাজটা ঘটেছে পৃথিবীতে! সে মহাভারতের কথা তোলে, মহাভারত রামায়ণ থেকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর নানান যুদ্ধ বিপ্লবের কথা তুলে তার কথার পিছনে যুক্তি সাজায়। বলে ভালোবাসা আংশিক সত্য, হিংসা সম্পূর্ণ সত্য। পৃথিবী থেকে ভালোবাসা কখনও যাবে না এই কথা বলে বহু মান্যজন, তারা ভাবের ঘরে চুরি করে। ভালোবাসার আয়ু কতদিনের? ভালোবাসাই যদি সত্য হত হিটলারের জন্ম হত না এ পৃথিবীতে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে নাৎসিরা ক্লান্ত হয়েছিল, তাদের মন বিকল হয়েছিল বলে শোনা যায় না। আসল সত্য হল পৃথিবীর থেকে হিংসা কখনও যাবে না। সত্য বলতে দোষ কোথায়? আসলে পৃথিবীতে মূল দ্বন্দ্ব তো হিংসা আর ভালোবাসার ভিতরে। বারে বারে হিংসা জিতে গেছে। ভালোবাসা হল হীনবল পিঁপড়ের মতো, তাকে টিপে মারতে কতক্ষণ? অনিলবরণ হিংসার পিছনে দাঁড়ায় তার যুক্তি নিয়ে।

কিন্তু এত রাতে লোকটার কথা মনে পড়ছে কেন? সে কি ওই দীর্ঘদেহী পুরুষটির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। ভাবতেই কেমন গুটিয়ে যায় সুদামা। কী বিচিত্র মানুষ। কঙ্কনার মতো মেয়ের সঙ্গে ওর বনছে না। কৃষ্ণেন্দু বলেছে, আসল কারণ হল অনিলবরণ চায় তার বউ আবার সন্তান দিক, তার মুখাগ্নির জন্য একটি পুত্র। মধ্যযুগের মানসিকতা লোকটার।

সুদামা টিভি বন্ধ করে। টেলিফোন যেখান থেকে আসছিল সেখানে টিভি চলছিল। এক নম্বর চ্যানেলে পার্লামেন্ট নিউজ। তাই কি? ওপরের ফ্ল্যাটে তো টিভি চলে সব সময়। এখনও চলছে। পার্লামেন্ট নিউজের পর বিজ্ঞাপনের গান। তা ভেসে আসছে নীচে। তা হলে পার্লামেন্ট নিউজটা কি ওপর থেকে কানে আসছিল? লাইনটা কি কেটে যাচ্ছে, নাকি রেখে দিচ্ছিল কেউ তার কণ্ঠস্বর শুনে। যে বারবার ফোন করছে সে কি তাকে চাইছে না? কৃষ্ণেন্দুর ফোন? ডেকে দিতেও তো বলত তা হলে, ফোন কি খারাপ হল? তাও

তো নয়। লাইন কেটে যাওয়ার ব্যাপার আর কেটে দেওয়ার ব্যাপার তো আলাদা করেই ধরা যায়। হ্যাঁ, টেলিফোনের ভেতর থেকে টিভির শব্দ ভেসে আসছিল, ওপরের টিভির শব্দ যদি হত আগে শোনেনি কেন?

সুদামা বসেই থাকে। চোখ জুড়ে যায় প্রায়। আবার কি টেলিফোন বাজবে?

না বোধ হয়। সে ক্রেডল থেকে নামিয়ে রাখে টেলিফোন। এনগেজড হয়ে থাকুক। মশারি তুলে ভিতরে ঢোকে। ঢুকতে ঢুকতে আচমকা সুদামার মনে হয় কেউ হয়তো খোঁজ নিচ্ছে কিছু। আজ তার গ্যাস ওভেনের নব খোলা ছিল, যে ওভেন বেশি ব্যবহার করা হয় না, সেটিই। পাশেরটা অন্যমনস্কের মতো জ্বালিয়ে দিলে ছোটোটা থেকে গ্যাস বেরোতে আরম্ভ করত। কেউ কি সেই খোঁজ ...। অবাক হয়ে যায় সুদামা।

ছয়

সকালে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে, আবার ফোন এসেছিল?

হ্যাঁ তুমি তখন ঘুমিয়ে।

শুনছিলাম যেন, কেটে গেল?

না লাইন রেখে দিল। সুদামা বলল।

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে থাকে। ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে তার মনে হচ্ছে না। টেলিফোন তো এইরকম আচরণ করেই থাকে উলটোপালটা লাইন চলে আসে। আবার লাইন কেটেও যায় বারবার। রেখে দেবে কে? কেন রাখবে?

রান্নার মেয়ে বিমলা এসে দ্বিতীয়বার চা দিয়ে গেল। সুদামার মনে পড়ল, বিমলা তুমি কি ওভেনের নব বন্ধ করনি কাল?

করেছিলাম তো! সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে অল্পবয়সী মেয়েটি, স্বামী পরিত্যক্তা, থাকে উলটোডাঙার বস্তিতে।

মনে করে দ্যাখো তো।

হ্যাঁ বউদি, করেছিলাম। বিমলার চোখ মুখের ভাবে কেমন অনিশ্চিত উত্তর।

কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে, দুটো ওভেন তো একসঙ্গে জ্বালাও তুমি।

হ্যাঁ দাদা।

কৃষ্ণেন্দু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। কৃষ্ণেন্দু এই ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দিল। গ্যাস ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়। সে জেরা করতে থাকে বিমলাকে। বিমলা কেমন কুণ্ঠার সঙ্গে জবাব দিতে

লাগল। সুদামার মনে হল বিমলা খুব ভয় পাচ্ছে। এর আগে দু-জায়গায় চাকরি খুইয়েছে মেয়েটা। কারণ অবশ্য কাজে অবহেলা নয়। বয়স। প্রখর যুবতি সে। এক সন্তানের মা। কাজে ঢোকার পর গল্প করেছে সুদামার সঙ্গে। উলটোডাঙার এক ফ্ল্যাট বাড়িতে কীভাবে বিপদে পড়েছিল সে। ঘটনার মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। যা হয়ে থাকে। সহায়হীন যুবতি, কাছে ঘুর ঘুর করে বাড়ির পুরুষরা, সুযোগ খোঁজে, তৈরি করে নেয়। কাজের মেয়েদের দেখে মধ্যবয়সী পুরুষ বিনা ঝুঁকিতে লাম্পট্য করতে চায়। লাম্পট্যের ইচ্ছা আছে, সাহস নেই সুতরাং কাজের মেয়েকে ব্যবহার করা। অনায়াসে সামান্য কিছু হাতে গুঁজে দিয়ে ভোগ করতে চাওয়া। এই ফ্ল্যাটে তেমন কিছু হয়নি। হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কাজটা তো থাকতে হবে। কৃষ্ণেন্দুর প্রশ্নে বিব্রত হয়ে এলোমেলো জবাব দিতে আরম্ভ করেছে বিমলা। প্রথমে বলল, দুটো ওভেনই জ্বালিয়ে ছিল। পরে বলল, না না একটা, বলল আগে সে গ্যাস সিলিন্ডারের নব বন্ধ করে, পরে ওভেন — না, না তা না দাদাবাবু, আগে সিলিন্ডার, পরে উনুন, না না ইস আমি তো জানি দাদাবাবু, পাঁচ বছর কাজ করছি নানা বাড়িতে, সেই কবে থেকে গ্যাসে রান্না করছি, গ্যাস আমার খুব চেনা, গ্যাসের গন্ধও জানি আমি, আমার ভুল হবে না, একবার এফ ডি ব্লকে কী হল...। আমার ঘরে অবশ্য কয়লার উনুন, স্টোভও আছে... আবোল-তাবোল বকছে। শেষে তার সম্বিত ফিরল, একটু থেমে থেমে বলল, আগে সে উনুন বন্ধ করে, পরে সিলিন্ডার।

তখন ফোন বাজল। কৃষ্ণেন্দু উঠে ধরল। কে? আরে এবিজিসি!

সুদামা শক্ত হয়ে গেল। এত সকালে লোকটার ফোন। কাল রাত্তিরে কি ফোনটা সে-ই করছিল, সে-ই রেখে দিচ্ছিল? আচমকা মনে হল যেন তাই। সে উঠল। বিমলাকে নিয়ে কিচেনে ঢুকল। এখন গ্যাস জ্বলছে না।

বিমলা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল বউদি?

তোমার উনুন খোলা ছিল।

গ্যাস বন্ধ ছিল?

সুদামা তাকিয়ে আছে বিমলার মুখের দিকে, তার মানে, তুমি কি ওভেন বন্ধ করো না?

না না না, তা কেন? বিমলা ভীত হয়ে পড়ে, আগে বন্ধ করি, দুটোই বন্ধ করি। বলছি গ্যাস বন্ধ থাকলে উনুন খোলা থাকলেও তো ভয় নেই।

ভয় আছে। সুদামা বলে।

কীরকম? বিমলা বুঝতে পারে না।

আছে ভয়, শোনো ...। সুদামা বোঝাতে থাকে বিমলাকে। একদম ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে ডেমনস্ট্রেশন দেয়। ছোটো ওভেনের নব খোলা, চায়ের জল চাপালে বড়ো ওভেনে। গ্যাস সিলিন্ডার চালু করে দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বড়ো ওভেনের মুখে ধরলে। বড়ো ওভেন জ্বলে উঠল। জল গরম হতে লাগল, তখনও খেয়াল করনি যে ছোটো ওভেনের নব অন করা। গ্যাস বেরোচ্ছে। কী ভীষণ ব্যাপার বলো দেখি বিমলা!

বিমলা ভয় পায়, তা কেন হবে বউদি, খোলা উনুন দিয়ে গ্যাস বেরোলে গন্ধ পাব না?

না পাবে না। কী করে পাবে। তেল-মশলার গন্ধে মিশে যাবে। আর যদি অন্যমনস্ক হও, তুমি করেছিলে?

না না, আমি না, সত্যি বলছি আমি না। বিমলার চোখে কর্মহীন হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক ফুটে ওঠে, বিশ্বাস করুন।

সুদামা চুপ করে থাকে। বিমলা কাঁপছে ভয়ে।

বিমলা বলল, আমি তো ভালো করে দেখেশুনে তারপর যাই বউদি, আর ছোটো উনুন তো জ্বালাইনে, ওতে সময় বেশি লাগে।

কেন, দুটো একসঙ্গে হয়, শেষ পর্যন্ত তো সময় বাঁচে। গ্যাসে তো এই সুবিধে।

হতে পারে বউদি, কিন্তু আমার যে কী হয়, গলা জড়িয়ে যায় বিমলার, ভুল করে ফেলি, ডাল আর মাছ একসঙ্গে চাপিয়ে যেটাতে নুন দেওয়ার কথা সেটাতে চিনি দিয়ে দিই, আবার মিষ্টির জায়গায় নুন, মাছের ঝোলের জিরেবাটা আমি ডালে দিয়ে ফেলেছিলাম একবার। একসঙ্গে দুটো রান্নায় মন বসে না। কোনোটাই ভালো মতো হয় না, অভ্যাস নেই।

সুদামা অবাক, অভ্যাস নেই মানে, এখানেই তো এক বছর কাজ করছ।

এখেনে তো দুজনের রান্না, দরকার কী দুটো একসঙ্গে চাপানোর, আর সব জায়গায়, মানে এর আগে যেখানে যেখানে কাজ করেছি, রান্না তো করতে হয়নি, যদি করতে হয়েছে তো এই রকম ফেমিলি, রান্নার অভ্যেস তো একদিনের নয়।

বাড়িতে তো অনেক লোক তোমার?

কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে যাচ্ছে বিমলা, মাথা কাত করে বলছে, হ্যাঁ মা বাবা ভাই বুন, আছে অনেক। কিন্তু আমার ঘরে তো গ্যাস নেই। কয়লার তোলা উনুনে একটাই রান্না হয় একবারে। আমি তো অনেকদিন ধরে রান্না করি। ওই অভ্যেসটা রয়ে গেছে। আর ওই ছোটো উনুনের অল্প আগুন পছন্দ হয় না আমার, গ্যাসের উনুনে দুটোই বড়ো থাকে না কেন?

সুদামার মনে পড়ল। এই একই কথা তার বড়ো-জা যুথিকা বলত, যখন তারা বেলগাছিয়া থাকত। হ্যাঁ ডানদিকের ছোটো ওভেনটা তারও খুব পছন্দ হয় না। সেও তো বড়ো একটা জ্বালায় না ওটা।

বিমলা বলল, আপনি বউদি ভুল করে — না না আমারও ভুল হতে পারে, মাপ করে দিন, তবে কিনা এরকম ভুল তো হয়নি আগে, তবে গ্যাসটা যখন বন্ধ ছিল, তখন নিশ্চিন্ত, এবার থেকে সব দুবার করে দেখে বেরোব।

সুদামা মাথা নাড়ে, ডানদিকেরটা খোলা রেখে বাঁদিকেরটা জ্বালানো তো বিপজ্জনক, গ্যাসে বেরোতে বেরোতে ঘরে জমে যাবে একটু বাদেই, যাক গে সাবধানে করো।

কিচেন থেকে বেরোতে বেরোতে সুদামা ভাবে সেই কি তা হলে ভুল করে? কিন্তু তারও যে অভ্যাস বড়োটি জ্বালানো। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে সে প্রথমে ডানদিকেরটা খুলেছে, পরে অভ্যাস মতো বাঁদিকেরটায় জল চাপিয়েছে। একজনের চায়ে আর কত জল লাগে। বাঁদিকের অনেকটা আগুনে দ্রুত জল গরম হয়ে গেছে। ডানদিকেরটা খোলাই রয়েছে। সে কি ভুল করে আগে ওভেন খুলে, তার উপরে পাত্র চাপিয়ে পরে সিলিন্ডারের নব ঘুরিয়েছিল। ফলে বড়ো ছোটো দুটো ওভেনই খোলাই রইল। সামান্যক্ষণ লাগল চা করতে, তাই খেয়ালও হল না খোলা রয়েছে ছোটো ওভেন। গ্যাস তো তারপর বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট ধরে কাঁচা গ্যাস বেরিয়েছিল নিশ্চিত। খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল। সে যদি অনেকক্ষণ ধরে রান্না করত তা হলে হয়তো তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস জমে যেত ঘরের ভেতরে ধীরে ধীরে। তারপর আচমকা আগুন ...। পেট্রোলিয়াম গ্যাসে শ্বাস নিলে কী হয়? ফুসফুস ফেটে যায়?

কৃষ্ণেন্দু ডাকল, তোমাকে ডাকছে অনিলবরণ?

কেন?

কৃষ্ণেন্দু রিসিভার কানে রেখে হাসছে, ও বলছে কাল সন্ধেয় কীসব আবোল-তাবোল বকেছে, অ্যাপোলজি চেয়ে নেবে।

আমাকে তো কিছু বলেনি। সুদামার ভ্রূ কুঞ্চিত।

তোমাকে না বলুক, বলেছে তো। ফোনটা ধরো।

তার জন্য আমার সঙ্গে কী কথা, যা শুনেছে সব তো ওই সুহাস।

আহা সে তো দুজনেই বলেছে, কিন্তু ও বলছে ওর মনে হচ্ছে কথাগুলো তোমার সামনে না হলেই ঠিক হত ...

সুদামা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে, গতকালের সন্দেহটা আবার জেগে ওঠে তার ভেতরে, সে বলল, কাল রাতে কি অনিলবরণ —?

না, না ও তো বলছে ও করেনি।

সুদামা ফোনটা নিল কৃষ্ণেন্দুর হাত থেকে। কানে চেপে দাঁড়িয়ে থাকল। ওপারে অনিলবরণের কণ্ঠস্বর। সুদামার মনে হল কাল এই ফোনই দুবার এল, দুবার কেটে গেল। সে জিজ্ঞেস করে, ফোনটা কেটে দিচ্ছিলেন কেন?

কই না তো! ওপারের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল, কখন কাটলাম, ধরে আছি তো!

এখন নয়, কাল রাতে। সুদামা বলল।

না, না, আপনি ভুল করছেন। ওপারের কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

আমার তো মনে হচ্ছিল —

ওপারের মানুষ হাসছে, কী করে মনে হল আপনার, ডিড য়্যু এক্সপেক্ট মাই কল, আপনি কি ভাবছিলেন আমি ফোন করতে পারি?

সকালে যখন সন্ধের বিষয়ে নিয়ে ফোন করছেন, রাতে বাড়ি ফিরেও তো করতে পারতেন?

বাহ নেশা কাটতে যে রাত গেল।

কিন্তু কয়েকবার তো চেষ্টা করেছেন, ফোন বেজেওছে এ বাড়িতে। সুদামা বলল।

ওপারে অনিলবরণ চুপচাপ। তারপর আচমকাই জিজ্ঞেস করে, গ্যাস নিয়ে কী যেন প্রব্লেম হয়েছিল? কৃষ্ণেন্দু বলছিল।

ও কিছু না, রাখছি।

কী হয়েছিল, রেগুলেটর খারাপ?

আপনাকে বলেনি কৃষ্ণেন্দু?

না, বলছিল একটা প্রব্লেম। যাক গে মিটে গেছে তো। আমি আসলে বলতে চাইছি, সন্ধেয় অত চিৎকার করেছি ...।

ও তো আপনার অভ্যেস।

ওপারে হাসি, হ্যাঁ, একটু বেসামাল হয়ে যাই সুদামা চ্যাটার্জি। সহজ হয়ে উঠতে চায় অনিলবরণ।

সুদামা ফোন রেখে দেয়। কৃষ্ণেন্দু স্নানে গেছে। সুদামা আবার কিচেনের দরজায়। বিমলা কড়া চাপিয়েছে। সুদামা ফিরে এল বেডরুমে। সেখান থেকে ব্যালকনিতে। তারপর হঠাৎ মনে হয় নীলকে চিঠি লিখতে হবে। কালই লিখবে ভেবেছিল, ভুলে গেছে সে।

সাত

ভুলে যাচ্ছে সুদামা। প্রায় দিন-সাতেক এসেছে ছেলের চিঠি। জবাবটা দেওয়া হয়নি। গতকালই লেখার কথা ছিল। একদম মাথায় ছিল না। অথচ এর আগে নীলের চিঠি দুপুরে এলে, বিকেলে সে উত্তর লিখতে বসত। নিজে লিখে জায়গা রেখে দিত কৃষ্ণেন্দুর জন্য। রাতে তাকে দিয়ে লিখিয়ে পরদিন নিজে হাতে পোস্ট করতে বেরোত। এখন যে কী হয়েছে! টানই চলে যাচ্ছে যেন! আগে, এই ফ্ল্যাট, বেহালার সরকারি আবাসন, নীলবিহীন ভাবাই যেত না। একদিন নীল ডালিমতলা কিংবা বেলগাছিয়া থেকে গেলে ফ্ল্যাট হয়ে যেত শূন্য। মনে হতো একজন নেই। এখন নীল যখন আসে, মনে হয় অতিরিক্ত কেউ একজন এসেছে, যে এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা নয়। তার ফলে ফ্ল্যাটের স্বাভাবিকতা ভেঙে পড়ছে। নিঃঝুমতা ভেঙে যাচ্ছে। নীল না থাকলে কেউ যে একজন নেই তা আর মনে হয় না। মনেই হয় না নীলের জন্য বড়ো ব্যালকনিটা অপেক্ষা করে থাকে সন্ধেয়। বড়ো ব্যালকনিতে যে টেলিস্কোপ বসাবে। টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে রাতের আকাশ দেখবে।

নীলের চিঠি রাখল কোথায় সে? নীলের চিঠির কাগজ খাম সাদা পায়রার মতো ডানা মেলে দূর পাহাড় থেকে এই সমতলে উড়ে আসে। খাম প্যাড সুদামা নিজে পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল ছেলেকে। সেই খামের উপর সুন্দর কিন্তু একটু অগোছালো অক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে ছেলে যেন উড়িয়ে দেয় তার হোস্টেলের কাচের সার্শি খুলে। এতটা পথ, নানান ডাকঘর, নানান ডাককর্মীর হাত ঘুরে ঘুরে এসেও খাম একটুও ময়লা হয় না। বোধহয় অত দুধ-সাদা রঙে, সাত রঙের খাঁটি মিশ্রণে উদ্ভূত সাদায় ময়লা হাত ফেলতে সঙ্কোচ বোধ করে ডাককর্মীরা। সাবধানে ছোঁয়।

সুদামা সেই সাদা পায়রাটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন। কোথায় যে রাখল! আগে এমন হতো না তো। নীলের চিঠি চোখের সামনে টেলিফোন স্ট্যান্ডের একধারে। শুধু নীলের চিঠি থাকে সেখানে। যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রীর পাঠ সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ, তারপর জবাব লেখা হয়ে কলকাতার চিঠি ক্যুরিয়র কিংবা স্পিড পোস্টে জমা করা হয়ে গেলে নীলের চিঠি সুদামার নিজস্ব হেফাজতে চলে যায়। চিঠিগুলো সে জমিয়ে রাখে। দশ বছর বাদে নীল বড়ো হয়ে গেলে তার হাতে তুলে দেবে বাবা-মায়ের কাছে লেখা তার মনের বিবরণ। সুদামা এইভাবেই ভেবে রেখেছে।

কোথায় গেল? টেলিফোনের পাশে নেই। এখানেই কি রেখেছিল, নাকি অন্য কোনো জায়গায়? সুদামা ঘরের বাইরে লিভিং স্পেসে যায়, খবরের কাগজের স্ট্যান্ডের উপরটা দ্যাখে। গুটিকয় ম্যাগাজিন এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সুদামা। এমন তো হওয়ার কথা নয়। নীলের চিঠি তো যত্নে রাখে।

সুদামা ডাকল বিমলাকে, চিঠিটা কোথায় গেল জান বিমলা?

বিমলা আঁচলে হাত মুছতে মুখ বাড়ায় কিচেন থেকে, কী চিঠি?

সুদামা জবাবা না দিয়ে আবার ঘরে ভেতরে এল। বিছানার চাদর তোশকের কোণ উলটে দেখল। না। বিছানার নীচে তো সে রাখে না কোনোদিন। সুদামা আবার বাইরে এসে ম্যাগাজিনগুলো উলটোতে লাগল। একটি পত্রিকা দিল্লির তন্দুর হত্যা নিয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট ছেপেছে। দু-দিন আগে সে পড়ছিল দুপুরে, তার ভেতরে নীলের চিঠি লুকিয়ে গেল নাকি? পরপর করে পাতা উলটোতে থাকে সুদামা। নীলের চিঠির খোঁজ নেই। সুদামা হাতে ম্যাগাজিনটা নিয়ে আবার ঘরে আসে। বিছানার উপর ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে দেয়। অবাক লাগছে। নীলের চিঠি কি সে ফাইল বন্দী করে ফেলেছে? পুরোনো চিঠির ভেতরে চালান করে দিয়েছে ভালোভাবে না পড়ে, জবাব না দিয়ে? হ্যাঁ, ভালোভাবে পড়া হয়নি, কেন হয়নি তা বুঝতে পারে না সুদামা। তবে হ্যাঁ, ওই যে নীল লিখেছে, মাম, এবারে সামার ভ্যাকেশন কলকাতা নয়। ওইটুকু পড়ে সে রেখে দিয়েছিল। প্রথম পঙক্তিটিই তাকে আচমকা নিস্পৃহ করে দিয়েছিল। পরে তো অনেক কথা লিখেছে তার সন্তান। সেগুলিও তো পড়তে হবে। সামার ভ্যাকেশনের তো দেরি আছে। আর ক-দিনেরই বা ভ্যাকেশন। আসলে ফাইনাল একজাম হওয়ার পরে কয়েকটি দিন ছুটি। ওই হিল স্টেশনে তো সামারই সবচেয়ে ভালো ঋতু। সুন্দর ঋতু। কিন্তু মা-বাবার কাছে আসার সময়ের চেয়ে সুন্দর ঋতু আর কী হতে পারে?

স্নান শেষ করে কৃষ্ণেন্দু বলে, অনিলবরণের সঙ্গে কথা বললে না?

হ্যাঁ, কিন্তু নীলের চিঠিটা কোথায় রেখেছি বলো তো? জবাব দেব, চিঠিটা পাচ্ছি না।

কৃষ্ণেন্দু বলল, ও তো আমার ব্যাগে।

রাগ করল সুদামা, বলবে তো।

পড়ব বলে নিয়েছি।

দাও, জবাব লিখব।

কৃষ্ণেন্দু গায়ে শার্ট পরতে পরতে বলে, পড়া হয়নি আমার।

পড়া হয়নি? অবাক সুদামা।

না, সময় পেলাম কই, ও এই সামারে আসবে না বলছিলে না?

পড়ে দ্যাখো। সুদামা ব্যালকনির দিকে পা বাড়ায়।

আজ পড়ে ফেলব, হ্যাঁ অনিল কী বলল। কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে, ও কেমন যেন, তাই না?

সুদামা ঘুরে তাকায়, ফোন ও-ই করেছিল রাতে।

তাই! বলল সে কথা?

বলেনি, কিন্তু মনে হল যেন।

মনে হল মানে? কৃষ্ণেন্দু কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

মনে হল মানে মনে হল, সব ঘটনার অকাট্য প্রমাণ তো হয় না, আন্দাজ করছি ও-ই টেলিফোন করছিল।

কৃষ্ণেন্দু হাসে, ও কেন খামোকা ফোন করে লাইন কেটে দেবে?

সুদামা বলল, খবর নিতে চাইছিল।

তার মানে?

ওই লোকটা সুবিধের নয়। ওকে আমি কোনোদিনই পছন্দ করি না। ওইরকম একটা হিংস্র প্রকৃতির লোকের সঙ্গে কী করে যে তোমার বন্ধুত্ব হয়। সুদামা বলে।

কৃষ্ণেন্দু হাসতে থাকে, আরে ওসব ও এমনি বলে। আজকে তো প্রথম বলছে না?

বলবে কেন, কোন কথা বলতে নেই তা জানে না, ও কাল রাত্তিরে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না বলেই হয়তো ফোন রেখে দিচ্ছিল, অথবা—।

কৃষ্ণেন্দু ঠিক ধরতে পারে না সুদামা কী বলতে চাইছে। অনিলবরণ কেন ফোন করে লাইন কেটে দেবে? কী খোঁজ নেবে? সে যতটা জানে অনিলবরণের নারী-সংক্রান্ত কোনো দুর্বলতা নেই। সে পছন্দই করে না মেয়েদের। বন্ধুর স্ত্রীকে বিরক্ত করার মতো মানুষ অনিলবরণ নয়। হ্যাঁ সুদামার তো অপছন্দ হতেই পারে, অনেকেরই হতে পারে যখন অনিলবরণ নরহত্যার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করতে চায়, খুনির পক্ষে কথা বলে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, আসলে অনিলবরণ কিন্তু ভিতু মানুষ, প্রচুর থ্রিলার পড়ে ওর মাথা বিগড়ে গেছে, আবার এর ভিতরে ওর চালাকিও আছে, ওইসব কথা বলে ও লোককে রাগিয়ে দিতে চায়, ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত মানুষ দেখতে ওর ভালো লাগে।

আরও অনেক কিছুই ভালো লাগে, আমার ধারণা বারবার ফোন করে ও খোঁজ নিতে চাইছিল কোনো কিছুর, না হলে সকালে ফোন করবে কেন? কী দরকার, একটু বাদেই তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সকালে ফোন করে হতাশই হয়েছে মনে হয়। অ্যাপোলজি-টজি ফালতু কথা। ও একটা ব্যাপার ঘটাতে চেয়েছিল মনে হয়। চতুর। থ্রিলার, ক্রাইম স্টোরি লিখতে লিখতে ও নিজেই ক্রাইম ঘটিয়ে ফেলতে চেয়েছিল —।

কী আবোল-তাবোল বকছ তুমি! এবার কৃষ্ণেন্দু রেগে ওঠে।

সুদামা বলল, ঠিক-ই বলছি।

কৃষ্ণেন্দু বলে, তুমিও দেখছি অদ্ভুত সব কল্পনা করতে আরম্ভ করেছ। অনিলবরণের মতো।

সুদামা চুপচাপ। তার যা মনে হচ্ছে, যে সম্ভাবনার কথা ক্ষীণ হয়ে মাথায় উঁকি মারছে, তা তো অনিলবরণকে জড়িয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি কাল্পনিক দৃশ্য। তার আগের দৃশ্যটি তো তার জানা। সুহাস আর অনিল আচমকা উঠল। সুহাস আবার বসে পড়ল। কমবয়সী সুহাস এতই রেগে গিয়েছিল যে অনিলবরণের সঙ্গে যেতে চায়নি। এইটুকু জানা। অনিলবরণ উঠল। সুদামা তখন ব্যালকনিতে বসে। একা একা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মানুষটা। ঘর থেকে সদর দরজায় যাওয়ার মধ্যে ঘটে গেল আর একটা ব্যাপার, সকলের অলক্ষে। সুদামা শক্ত হয়ে যায়। তার শীত করে যেন। মানুষটা কি খোলা কিচেনে ঢুকে পড়ল। নেশায় টলমল পা। একটু খেলা করে চলে গেল। নেশার জন্যই সবটা ঠিকঠাক করা হয়ে ওঠেনি ওর। তারপর বাড়ি গেল। অনেক রাতে ফোন। ফোনে খোঁজ নিতে লাগল, আন্দাজ করতে লাগল। শান্ত ঘরে শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে তো চায়নি ও। সুদামা ভাবতে ভাবতে বসে পড়েছে কার্পেটে। বিমলা ঢুকল কৃষ্ণেন্দুকে ডাকতে। খেতে দিয়েছে। ডাকল সুদামাকেও।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সুদামা বলল, চিঠিটা রেখে যাবে।

সঙ্গে থাক, পড়ে নিই। কৃষ্ণেন্দু বলে।

আট

কথাটা হাসতে হাসতে বলেছিল কৃষ্ণেন্দু, বয়স হচ্ছে, এখন ওসব ছাড়ো দেখি অনিল, তোমার ঠাট্টাগুলো কেউ আর ঠাট্টা বলে ভাবে না।

ভ্রূ ভাঁজ হয়ে গেছে অনিলবরণের, কোন ঠাট্টা?

নেশা করে সেদিন যা বলেছ।

অনিলবরণ বলল, সে তো খুব খারাপ ব্যাপার হয়েইছে, আমি তো সেইজন্যই ফোন করলাম সকালে, একজন মহিলার সামনে এসব আলোচনা কি ঠিক? ঠিক নয়।

ঠিক নয় তো বললে কেন ওসব? কৃষ্ণেন্দু বলে।

বলে ফেলেছি, সুহাসই তো কথা তুলল, কেন সুদামা কি কিছু বলেছে?

ও তো খুব রেগেই গেছে, বলছে তুমি একদিন ক্রাইম করে ফেলবে।

হা হা করে হাসছে, অনিলবরণ, করতে তো ইচ্ছেই হয়।

কৃষ্ণেন্দু অবাক হল, সত্যি বলছ?

কেন, তোমার ইচ্ছে হয় না?

পাগল। অনিলবরণের মাথার ভিতরে কলকব্জা বিগড়ে গেল নাকি। তা হলে কি সুদামার সন্দেহটা ঠিক! গ্যাস ওভেন অন করে চলে গিয়েছিল অনিলবরণ।

কৃষ্ণেন্দু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

কিছু বলবে আর? অনিলবরণ জিজ্ঞেস করে।

তা হলে তো সুদামা মিথ্যে বলেনি, আচ্ছা তুমি কি রাতে ফোন করছিলে?

না তো! অনিলবরণ যেন চমকে ওঠে, কী ব্যাপার বলো দেখি, সুদামাও জিজ্ঞেস করছিল, রাতে কে ফোন করছিল!

লাইন রেখে দিচ্ছিল বার বার।

অনিলবরণের চোখ-মুখে রহস্য আবিষ্কারের আবেশ, আমেজ। সে সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দুকে বলে, তুমি চা খাবে?

না, না আমার সময় নেই, উঠব এখনই।

আরে রাখো তো তোমার কাজ, আচ্ছা কী হয়েছিল তোমার ফ্ল্যাটে, গ্যাস ভরতি হয়ে গিয়েছিল? বললে না তো টেলিফোনে।

কৃষ্ণেন্দু অনিলবরণকে জরিপ করে। লোকটা কি খুনি? সত্যি সত্যি চায় যে মানুষ খুন হয়ে যাক। তার এই সহকর্মী কি খেলার ছলে ওভেনের নব অন করে চলে এসেছিল? সুদামা তো বলছে সেই কথা। সুদামার কথাটা অবশ্য আন্দাজে। সে মনে করছে তাই। সে বলছে অনিলবরণই রাতে রিং করে আন্দাজ করতে চেয়েছিল ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে। ফ্ল্যাটে আগুন ধরল কিনা। ঠিক এই ভাবেই ক-বছর আগে এক অভিনেত্রী পুড়ে

মারা গিয়েছিল। তার কিচেন ভরতি হয়েছিল কুকিং গ্যাসে। ভেতরে গিয়ে দেশলাই ঠুকে দিতেই ফ্ল্যাট জ্বলে ওঠে।

অনিলবরণ জিজ্ঞেস করে, কী হল কথা বলছ না কেন? কী ভাবছ?

কৃষ্ণেন্দু বলে, তুমি যা বলো সত্যিই কি তা বিশ্বাস করো?

কী কথা?

ভায়োলেন্স, মার্ডার, ডেথ?

অনিলবরণ বলে, মার্ডার! আচ্ছা তোমার ভালো লাগে না ভায়োলেন্স?

সিনেমা, বইয়ের ভায়োলেন্স কি সত্যি বলে ভাবে কেউ?

অনিলবরণ বলে, আমার রক্ত গরম হয়। আসলে কী জানো মার্ডার নিয়ে আমি সত্যিই ভাবি, এমন ভাবে একটা খুন হবে, যাতে হত্যাকারীর পরিকল্পনার বৈচিত্র্য তোমাকে মুগ্ধ করবে, হত্যাকারী যে কতটা ইনোভেটিভ তা তুমি টের পাবে। আমি চাই সেইরকম একটা উপন্যাস লিখতে। হ্যাঁ ফ্ল্যাটে কী হয়েছিল?

কৃষ্ণেন্দু বলল, কেউ একজন ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক চেয়েছিল লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসে ফ্ল্যাট ভরতি হয়ে যাক।

চমকে ওঠে অনিলবরণ, তার মানে?

তাই-ই হয়েছিল, ওভেনের নব খোলা, সিলিন্ডারটি একটু বাঁকানো ছিল, নবটা ভেতরের দিকে, খুঁজে পায়নি বোধহয়। সিলিন্ডার বন্ধ ছিল।

অনিলবরণের দাঁতে ঠোঁট, সে যেন কী ভাবছে, তারপর বলল, আমিও ঠিক এই রকম ভাবছিলাম, শোনার পর থেকে এইরকম মনে হচ্ছিল আমার। আমি ভাবছিলাম এটাও মার্ডারের একটা দারুণ উপায় হতে পারে। শোনার পর প্রথমে ভাবলাম রেগুলেটর খারাপ হতে পারে, তা থেকে গ্যাস লিক করছে। পরে যা শুনেছি, এখন যা শুনছি মনে হচ্ছে আচমকা একটা সূত্র পেয়ে গেলাম আমি।

কৃষ্ণেন্দু বলল, সূত্র পাওয়ার কিছু নেই। ওভেনের আগে সিলিন্ডার বন্ধ করে আর ওভেন বন্ধ করেনি সুদামা বা আমার মেডসারভেন্ট। এটা একটা মিসটেক। আর এমন ভুল হয়েই থাকে, সুদামা শুধু শুধু ব্যাপারটাকে ঘোলা করছে। বলতে বলতে ওঠে কৃষ্ণেন্দু। তার মনে হচ্ছিল এ নিয়ে কথা বলা রুচি-গর্হিত ব্যাপার হবে।

আরে উঠছ কেন, বসো। অনিলবরণ উঠে হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণেন্দুকে চেয়ারে বসিয়ে দেয় আবার, সবে জমে উঠছে রহস্য, তুমি উঠে যাচ্ছ। চা খাও।

বেয়ারা ডেকে চায়ের কথা বলে অনিলবরণ ঘোষচৌধুরী সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে কৃষ্ণেন্দুর দিকে। নাও, মগজে ধোঁয়া দাও। তুমি তো সত্যিই একটা মার্ডার স্টোরির কথা বলছ, হ্যাঁ একজন গ্যাস সিলিন্ডার এবং ওভেন অন করে কিচেনের দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। তারপর ভিকটিম হয়তো জ্বলন্ত সিগারেট, মহিলা হলে কিচেনে ঢুকে ওভেনে — আচ্ছা গন্ধ তো পাবে, ঢুকলেই তো টের পাবে? তোমার কি মত?

কৃষ্ণেন্দু বলল, আমার কোনো মত নেই, খুন নিয়ে আলোচনা করতে, পরিকল্পনা করতে আমার ভালো লাগে না, তুমি কি পাগল! এসব নিয়ে ভাবো কেন?

অনিলবরণ বলে, ভাবতে ভালো লাগে।

তোমার ওয়াইফ ফিরেছে?

অনিলবরণ অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ে, বিড়বিড় করে, কঙ্কনা ইদানীং আমাকে পছন্দ করছে না, আর আমার ইচ্ছে আর একটা বেবি, ও বলছে হবে না। দুই মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি।

কৃষ্ণেন্দু হাসে, এটা কোনো সমস্যা হল, তোমারই তো দোষ, আবার বাচ্চা, দুটোতে হচ্ছে না, তোমার বউ তো ঠিক বলছে।

অনিলবরণ বলল, একটা ছেলে হলে খারাপ হত?

এই বয়সে ছেলে। হাসতে থাকে কৃষ্ণেন্দু, পারো বটে, যাও শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নিয়ে এসো ওদের।

অনিলবরণের ঘরে চা আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, ওভাবে তো মার্ডার করা যায়, যায় না?

কৃষ্ণেন্দু বোঝে তার শেষের বাক্যগুলি শোনেনি অনিলবরণ, তার মাথার ভেতরে আবার মার্ডার-মিস্ত্রি ঢুকে গেছে। সুদামাই-বা কী করে ভাবল কাজটা অনিলবরণের? ওভেন খুলে দিয়ে বাড়ি গিয়ে অনেক পরে ফোন করছিল। কিন্তু নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শুনে টের পেয়েছে তার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। সুদামার মাথার ভেতরটাও যেন বিগড়েছে। চা খেয়ে কৃষ্ণেন্দু ওঠে। তাকে আর বসাতে পারে না অনিলবরণ।

একা রহস্য ঔপন্যাসিক জানালা দিয়ে রোদে পোড়া আকাশের দিকে তাকায়। মনে হয় যেন আকাশই সব জানে। আকাশই বলে দিতে পারে পরিকল্পনাটা কেমন হতে পারে। আচ্ছা কুকিং গ্যাসের গন্ধতেই তো টের পেয়ে যাবে ভিকটিম, যদি না সে খুব উদ্বিগ্ন থাকে, ডিস্টার্বড থাকে, যদি না তার মনে খেলা করে অন্য কোনো বিষয়। ভাবতে ভাবতে কিচেনে ঢুকে সিলিন্ডার অন করতে গিয়ে অন করা দেখেও তখন তার মনে

কোনো সন্দেহ আসবে না। সে ওভেনের নবে হাত দিয়েও অন্য প্রসঙ্গে জড়িয়ে থাকবে মনে মনে, তারপর দেশলাই জ্বালতেই ঘর আগুনে ভরতি। খুন সম্পন্ন হল। একজন খুন হয়ে গেল।

সুদামা যেভাবে ভেবেছে, কৃষ্ণেন্দু যা ভেবেছে তা কি টের পায়নি অনিলবরণ? প্রকারান্তরে তাকেই যেন সন্দেহ করল। সন্দেহ তার উপরে পড়ায় অনিলবরণের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনার জন্ম হল। সে পর পর সিগারেট ধরায়। তার মনে হল ওভাবে হতে পারে। কিন্তু তার জন্য ভিকটিমকে থাকতে হবে চরম অসতর্ক। তার চেতনায় বাস্তবতা তখন, সেই মুহূর্তে, যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হবে। এই রকম কোনো পরিবেশ হলে তবে হতে পারে তা। তা হলে খুনিকে আর একটা কাজ করতে হয়। তার শিকারকে অসতর্ক, উদ্বিগ্ন করে তোলা। সুদামা কি সেইদিন তেমন ছিল? তার আর সুহাসের তর্কে সুদামা নিজে হয়ে উঠেছিল উত্তেজিত, ফলে অসতর্ক। তা হলে তো ঘটেও যেতে পারত ভয়ংকর কিছু, যদি সিলিন্ডার খোলা থাকত, কিচেনে জমে থাকত গ্যাস।

অনিলবরণ সাদা কাগজে ডটপেন দিয়ে নানারকম আঁকিবুকি কাটে। নানারকম ভাবে। বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, ভিকটিম অসতর্ক, উদ্বিগ্ন, কোনো কারণে উত্তেজিত থাকবে না। স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু তার কিচেন ভরতি হয়ে আছে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসে। তখন আলো নিভল, হয়তো লোডশেডিং বা কেবল ফল্ট। না, তা হবে না। কোনো পরিকল্পনার সঙ্গে আকস্মিকতাকে জোড়া যায় না। খুনিকে কেউ সাহায্য করে না। খুনির কোনো ভাগ্য নেই। ভাগ্য বলে খুনি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে না। সবই তাকে নিজে করতে হয়। নিখুঁত পরিকল্পনায়। একেবারে একা একা। ফ্ল্যাটের ইনভার্টার খারাপ, এমারজেন্সি লাইটও খারাপ, কারণ তা এখন ব্যবহার হয় না। লোডশেডিং তো উঠেই গেছে। এখন বিদ্যুৎ অতিরিক্ত। এখানে যা হতে পারে, তা হল হত্যাকারী নীচে নেমে মেইন সুইচটা অফ করে দিল। আলো নিভতেই হতচকিত ফ্ল্যাটের দুই মানুষ, স্বামী-স্ত্রী। কোনো রকমে একটি মোমবাতি জোগাড় হল এখানে ওখানে খুঁজে। তা জ্বালিয়ে অনেক পুরোনো লণ্ঠনের খোঁজ করতে পারে স্ত্রী। তা আছে কিচেনের সেলফে। মোমবাতি হাতে কিচেনের দরজা খুলতেই আগুন জ্বলে গেল বাতাসে ভাসা গ্যাসে।

ভাবতে ভাবতে শিহরিত, উত্তেজিত হয় অনিলবরণ। উত্তেজনায় সে ঘেমে যায়, তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে ওঠে। শরীরে ভাঙতে চায় যেন। অনিলবরণ চেয়ার থেকে উঠে তার অফিস চেম্বারের অপরিসর খালি জায়গাটিতে পায়চারি করতে থাকে। তারপর কী হল? হত্যাকারী বাড়ি ফিরে গিয়ে ফোন করল। ফোন বেজেই যায়। অথবা ফোন বাজেই না। বাজে না কেননা তখন আগুন ছড়িয়ে গেছে ফ্ল্যাটটির সব ঘরে। টেলিফোন পর্যন্ত পুড়ে গেছে। অথবা ফোন কেউ তোলে, স্বামী, খবরটা দিল। কণ্ঠস্বরের উত্তেজনাতে ধরা গেল কিছু হয়েছে। ফোন রেখে দিল অপরাধী।

এইভাবে হত্যা যদি করা হয় তা কি নতুন ধরনের কিছু হবে? লোকে তো ধরবে এটি দুর্ঘটনা। সূত্র একটি, সূত্র আছে, প্রথমত হত্যাকারী সেই সন্ধ্যায় ওই ফ্ল্যাটে ছিল। আর ফোন এসেছিল একটা। সেই ফোনটি বেজেছিল, কিন্তু ফ্ল্যাট থেকে সেই ফোন তোলা হলে ওপারে লাইনটি কেটে দিয়েছে কেউ। সে অপরাধী, জানতে চাইছিল তার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে কিনা।

সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে অনিলবরণের। তার মনে হতে থাকে সুদামার সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়। সন্দেহ করতেই পারে। ওই সন্ধ্যায় যদি খুনের এই বিচিত্র পরিকল্পনাটা মাথায় আসত, তা হলে তো সে এই পরিকল্পনাটা যাচাই করে নিত সুদামার কাছে। আলোচনা করত তার সঙ্গে।

অনিলবরণ টেলিফোনের সামনে যায়। কিন্তু ডায়াল করতে তার হাত কাঁপে। সে ভাবছে জিজ্ঞেস করবে সুদামাকে এমন আশ্চর্য বিষয়টি তার মাথায় এল কী ভাবে? সেও কি নানারকম খুনের কথা ভাবে? অনিলবরণ অনেকদিন আগে তার একটি উপন্যাস পড়তে দিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু-সুদামাকে। কেউই পড়ে উঠতে পারেনি। তাতে তো শুধু রিভলবার পিস্তলের ব্যবহার ছিল। না, ওই বইটা পড়তে হবে না সুদামাকে। নতুন উপন্যাস সে আরম্ভ করবে খুব শিগগির। সেই উপন্যাসে মৃত্যু নিয়ে তার নিজস্ব মতামত থাকবে।

অনিলবরণ সিগারেট ধরিয়ে ঘরের বাইরে আসে। লম্বা করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে। করিডোরটাকে কেমন রহস্যময় মনে হয় তার। ফালি ফালি আলো, অন্ধকারে ঢাকা। এপার থেকে ওপারের মানুষকে ঠিক চেনা যায় না। এমন একটি করিডোরকে হত্যাকাণ্ডে চমৎকার ব্যবহার করা যায়। খুনি বেরিয়ে যাচ্ছে কাজ শেষ করে। তার জামার রং সবুজ। দূর থেকে জামার একটি কোণ দেখা যায়। যে লোকটিকে দেখে মনে হয় তার গাত্রবর্ণ অন্ধকারের মতো কালো —।

এ সব কী ভাবছে সে! এ তো অন্য গল্প, অন্য খুন। সুদামার বানানো গল্পটির সঙ্গে এর মিলটা কোথায়? অনিলবরণ করিডোর ধরে হাঁটে একটির পর আর একটি খুনের কথা ভাবতে ভাবতে। খুনের পিঠে খুন চাপাতে গিয়ে বিভ্রমে পড়ে যাচ্ছে সে। চিন্তা গুলিয়ে যাচ্ছে। গুনগুন করতে থাকে সে, চাঁদের পরে চাঁদ লেগেছে ...। গুনগুন করতে করতে হাঁটে।

নয়

অনিলবরণের দেওয়া রহস্য উপন্যাসটি ছুঁয়েও দেখেনি সুদামা। পড়ার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। হাস্যকর, অগভীর, অহেতুক মারদাঙ্গা, যৌনতা। একেবারে মার্কিন থ্রিলার ভারতীয় ছদ্মবেশে।

আজ হঠাৎ কী খেয়াল হয়েছে অনিলবরণের বই হাতে নিয়ে সোফায় কাত হয়েছে সে। বইটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল বইটা। আজ পুরোনো খবরের কাগজ বিমলার হাতে চালান করার সময় হারানো রহস্য উপন্যাস অগভীর জলাশয়, কাদা-পাঁক ভরতি ডোবার মধ্যে থেকে হুস করে মাথা তুলল।

ধুলো ঝেড়ে সেই মহাগ্রন্থে মনোনিবেশ করতে চায় সুদামা। আসলে এ ছাড়া কী বা করার আছে তার। খেয়াল পূরণই তো সময় কাটানোর উপায়। এই দীর্ঘ দুপুর নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা থাকে না। দীর্ঘ দুপুর, দুপুরের আগে অনেকটা সকাল, দুপুরের পর অনেকটা বিকেল, সন্ধেয় তার কাজের, অকাজের কোনো নিয়ম থাকে না। আর এই নিয়ম নেই বলেই বই পড়ার অভ্যেসও চলে যাচ্ছে। যেমন চলে যাচ্ছে অনেক রকম অভ্যাস। একটা কাজে থাকলে আর একটা কাজে উৎসাহ হয়। উৎসাহই নেই যেন। ফেব্রুয়ারির শেষে নার্সিংহোম থেকে ফিরে কদিন ডায়েরি লিখতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কী লিখবে? তার ঘরের ধুলোবিহীন চকচকে হালকা গোলাপি দেওয়ালের কথা, সিলিং ফ্যানগুলির কথা, টেলিভিশন, ভি সি আর-এর কথা! টেলিফোনের কথা, ওয়াশিং মেশিন গ্যাস সিলিন্ডারের কথা। সেই ডায়েরির পাতা সাদা রয়ে গেছে। পড়তে পড়তে মনে হয় আরও কিছু কথা লিখে রাখে — যে সব কথা কৃষ্ণেন্দুকে বলতে পারেনি সেইগুলি। যে সব কথা কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, সেইগুলি।

যেমন নারীর শরীর। প্রকৃতির দেওয়া শরীর নষ্ট করতে চায় না সে। এবারই তো কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, তা হলে সামান্য অপারেশনটি হয়ে যাক। তা হলে সুদামার আর ভয় থাকবে না কনসিভ করার। তা নিয়ে তর্ক হয়েছিল। প্রকৃতি যা দিয়েছে, প্রকৃতিই তা ফিরিয়ে নেবে, বয়স হলে তো সব আপনা আপনিই যাবে। সে রাজি হয়নি। আর রাজি হয়নি মানে কি তার মাথার ভিতরে গোপন ইচ্ছেগুলি এখনও ঘুমিয়ে আছে। সে আরও সন্তান চায়। এসব কিছুই লেখা হয়নি তার। একা একা কী-ই বা ভালো লাগে। এখন নয় তখন লিখব করতে করতে কিছুই হয়নি। সুদামা পাতা উলটোচ্ছে অনিলবরণের উপন্যাসের।

সে কখনও ভাবতেই পারেনি এই উপন্যাস নিয়ে দুপুর কাটাতে হতে পারে। বই পড়ার ইচ্ছেগুলি চলে গেলে মাঝে মধ্যে খেয়াল চাপলে এসবই নেড়ে-চেড়ে দেখে মানুষ। পড়তে পড়তে সুদামার হাসি পায়, অবাক হয় সে। কীভাবে লিখল এসব অনিলবরণ। কোত্থেকে জোটাল এইসব পাত্রপাত্রীদের?

বই রেখে দিয়ে চুপ করে বসে থাকল সুদামা। ডায়েরির পাতা ফরফর করছে সিলিং ফ্যানের হাওয়ায়। ধুস! লিখতেই ভালো লাগে না। অভ্যাসটাই চলে গেছে। না হলে এই ভয়াবহ উপন্যাস পাঠের প্রয়াস সম্পর্কেও তো সে লিখতে পারত। কৃষ্ণেন্দু তাকে শিখিয়েছিল ডায়েরি লেখা, কৃষ্ণেন্দুই যেন নিয়ে নিয়েছে সেই অভ্যাসটি —অথবা স্বাভাবিকভাবে, অনভ্যাসের কারণে ডায়েরি হারাচ্ছে মন থেকে। যেভাবে যৌবন যায় সেই ভাবেই যেন চলে যাচ্ছে মনের অক্ষরগুলি।

সুদামার দিনযাপন এখন এইরকম। নানা অনভ্যাসের অভ্যাস। তার দিনযাপনে কোনো রং নেই, সেই অনুভূতিময়তা নেই, যা আসে রক্তের ডাক থেকে। তার সন্তান নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই। সন্তান পালনের কোনো অভ্যাসই নেই তার। তা হতো হয়তো, হয়নি। নিঃঝুম ফ্ল্যাট এখন আরও নিঃঝুম। সিলিং ফ্যানের সূক্ষ্ম শব্দের সঙ্গে হার্টবিট অহেতুক পাল্লা দিতে চায়। পারে না। বয়স বাড়লে হৃদয়ের শব্দও তো বিলম্বিত

হয়, হয়ে যায়। একটি ধ্বনির সঙ্গে আর একটি ধ্বনির তফাত হয়ে যায় অনেক —তাই-ই যেন হচ্ছে ক্রমাগত।

টেলিফোনটা বেজেই থেমে গেল। সুদামা উঠতে গিয়েও উঠল না। যদি আবার বাজে। বাজল না। ভুল লাইন আচমকা চলে এসেছিল এদিকে। সে আবার চোখ দেয় অনিলবরণের রহস্যে। এই উপন্যাসের পুরুষ রহস্যভেদী, ঠিক তাও নয়, যেন রহস্য উদ্ধারে অভিযাত্রী মানুষটি, নিজেই একের পর এক খুন করে যাচ্ছে আসল খুনিকে ধরার জন্য। খুন যেন জলভাত। কল্পনা শক্তিও আছে বটে লোকটার, বিচিত্র সব খুনের বিবরণ। মানুষ খুন অতই সহজ। খুনে কোনো বিকার নেই খুনির সন্ধানে বেরোনো রহস্যভেদীর। সুদামার যে কী হল। বইটি হাতে করে কিচেনে এল। ভাবে দেশলাই ঠুকে দেয়। গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে তার উপর ধরে বইয়ের পাতাগুলো। কিন্তু বই তো প্রাণে লাগে। সে বুকে করে ফেরত এল আবার।

কাল রাতে কৃষ্ণেন্দু বলছিল, অফার আসছে।

কী অফার?

না যে সব বহুজাতিক সংস্থা এখানে ব্যবসা করতে চায়, তাদের কাছ থেকে। যেমন এল পি জি সংস্থা এসেছে।

তারপর?

প্রচুর মাইনে, এখন যা পায় কৃষ্ণেন্দু তার দ্বিগুণ, তিনগুণের কাছাকাছি। ভাবাই যায় না যে ওর কত সুযোগ দিতে পারে। ওরা তো প্রফিট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি, লাভের জন্য ব্যবসা করে, লাভের জন্য প্রডাকশন করে, দিতে পারে অনেক।

সুদামা ভাবল কৃষ্ণেন্দুকে ফোন করে। ফোন করে জানতে চায় সেই অফারের কী হল। কিন্তু তাও তো হাস্যকর। তাতে কী হতে পারে? এই ফ্ল্যাটটা আরও বড়ো, আরও উঁচুতে, কিন্তু তা কি আকাশের কোলে, হাত বাড়ালেই ছায়াপথ। ছায়াপথে হাঁটা যাবে তখন। আর কৃষ্ণেন্দু এইরকম কথা গত ছ-আট মাস ধরে বলছে, তেমন অফার পেলে চাকরি ছেড়ে দেবে। সরকারি চাকরির কত আর মাইনে। যে কাজ করে সেও মাইনে পায়, যে করে না, সেও। ওই সব বহুজাতিক সংস্থার, দেশীয় বিকাশশীল সংস্থার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, তারপর বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এ পৌঁছনো, তারপর চেয়ারম্যান — এক মহিলা ষাট লাখ টাকা পান পার অ্যানাম, একজন পায় এক কোটির কাছাকাছি — ও সবের সুখই আলাদা। টেলিফোনে হাত দিয়েও তুলে নেয় সুদামা। কৃষ্ণেন্দু কীই-বা বলবে? ও তো কথার কথা। আজই কি কোনো সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে? ওসব তো স্বপ্ন। তা কখনও সত্যি হয়।

টেলিফোনের কাছে বসে আছে সুদামা। তার মনে হচ্ছে আবার বাজবে। কে করবে? খবরের কাগজের সেই প্রুফ রিডার, যার কতকগুলি প্রতিবেদন পড়ে সে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়েছিল। লোকটা লেখাকে পেশা করবে বলেই কাগজে সামান্য চাকরি নেয় — তারপর যে কী হল তার।

আবার ফোনটা ভেঙে ভেঙে বাজল। সুদামা ছোঁয়ার আগেই থেমে গেল। কেউ খুব চেষ্টা করছে সুদামার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কে? কৃষ্ণেন্দু! কৃষ্ণেন্দু, তার প্রেমিক কি আবার পুরোনো প্রেম নিয়ে ফিরে এল। সে তো জানে এই সময়ে ঘুমোচ্ছে সুদামা। ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভাঙাতে চাইছে কৃষ্ণেন্দু। না, চোদ্দ বছর আগে ফোনের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তখন তো কৃষ্ণেন্দু সবে কাগজ ছেড়ে সরকারি পদে। সে যে কাগজে প্রুফ দেখত, তা আর চলল না। উঠেই গেল। সরকারি পদে ঢুকে বিয়ে করল কৃষ্ণেন্দু। তখনও লেখা থামায়নি। একবার লিখল কংসাবতী তীরে বর্ষা — সেই বরষার কথা এখনও ভোলেনি সুদামা। ভোলেনি মেঘের বিবরণ। দুপুরে আটকে রেখেছিল যুবক স্বামীকে তার স্ত্রী। বেলগাছিয়ার ফ্ল্যাটে। সেদিন দুপুরে তারা শ্বশুর-শাশুড়ির ভালো ঘরটি পেয়ে গিয়েছিল। এক সপ্তাহ ধরে পেয়েছিল। কী আশ্চর্য দিনই না গেছে! এক সপ্তাহ ধরে স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলছিল। সে বার বর্ষায় শ্বশুর-শাশুড়ি দিন সাতের জন্য পুরী, সঙ্গে অর্ধেন্দুরাও গেল। পুরীর রথযাত্রা দেখতে তাকে কম লোভ দেখায়নি বড়ো জা যূথিকা। সে যায়নি। তার লোভ হয়েছিল অন্তত দিন-সাতের জন্য পুরো ফ্ল্যাটটা তো তাদের। সাতদিনই কৃষ্ণেন্দু তার সঙ্গে ছিল। তাকে ছুটি নেওয়াতে বাধ্য করেছিল সুদামা। মধুচন্দ্রিমা যাপন হবে।

টেলিফোনের সামনে বসে সেই ঘন বরিষণের দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল সুদামার। এখন বাইরে মেঘ আর রৌদ্র একসঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। মেঘ আসবে আসবে করেও আসছে না এই বালির মাঠের আকাশে। ভ্যাপসা গরম। এর থেকে পরিত্রাণের জন্যই কি সেই বাদল দিনের কথা মনে পড়ল। নাকি কৃষ্ণেন্দু জন্য? কৃষ্ণেন্দু তাকে ছুঁতে চাইছে, পারছে না। তার কণ্ঠস্বর শুনতে চাইছে, পারছে না। কৃষ্ণেন্দুরও হয়তো মনে পড়ে গেছে সেই বাদল মেঘের কথা। টেলিফোনে সেই কথাই বলতে চাইছে কি? টেলিফোনে জানাতে চায় পুরাতন প্রেম? মনে পড়ে গেছে পুরাতন কথা, ঢাকা পড়েনি এখনও সব।

খেয়াল! এ সব খেয়াল। এলোমেলো সময়হীন জীবনযাপনের খেয়াল, বোধহয় এই ভাবনাও। না হলে দগ্ধ প্রকৃতির ভিতরে মেঘের অনুষঙ্গ ভাবনায় আসে কী করে?

কৃষ্ণেন্দু মনে পড়ে তোমার? অর্ধেক আকাশ দিয়েছিলে তুমি আর দিয়েছিলে ... ফ্ল্যাট বাড়ির বাইরে টালা পার্ক খোলা। খোলা মাঠের ধারে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া শিরিষ আকাশমণির ছায়া। তার ভিতরেই লুকিয়েছিল কোথাও একটি কদম গাছ। সেই যে চোদ্দ-পনেরো বছর আগের খবর। আমরা সেই সাতদিন তিনটি ঘরের মালিক। নিজের ঘর ছেড়ে সবচেয়ে ভালো ঘরটায় সকাল দুপুর সন্ধে কাটাচ্ছি। জানালা খুললেই মেঘ বর্ষা।

তুমি এক ভোরে কী কাজে বেরিয়ে ফিরে এলে কোষবদ্ধ ভালোবাসা নিয়ে। বাদল দিনের প্রথম কদমফুল একটি একটি করে নব পরিণীতার কোষবদ্ধ দু-হাতে তুলে দিয়েছিলে —

সুদামা একটা ফুল তোমার, আর একটা তোমার, আর একটা তোমার — পাঁচটা ফুলই তোমার, এতদিন ধরে জানতামই না এদিকে কদমফুল ফোটে। জানতে হল তোমার জন্য, ভালোবাসা চিনিয়ে দিল ফুলগুলিকে।

সুদামা টেলিফোন তুলে পটপট ডায়াল করতে থাকে। রিং হতে থাকে ওপাশে। রিং হয়েই যাচ্ছে। বেজে যাচ্ছে টেলিফোন, কেউ ধরছে না। আশ্চর্য! কৃষ্ণেন্দু ঘরে নেই! সুদামা কানে চেপে থাকে রিসিভার। যদি বেরিয়ে থাকে টয়লেটের দিকে, এখনই ফিরবে। দোরগোড়ায় তো পিয়ন থাকে, থাকে একজন ক্লার্ক একদম পাশের ছোট্ট খুপরিতে। সায়েবের পি আর ও-র কাজ করে। সে-ই বা গেল কোথায়? ফোনটা তো সেই ধরবে সায়েব না থাকলে। বাজতে বাজতে ফোন ক্লান্ত হয়ে থেমে গিয়ে অপ্রীতিকর এনগেজড সাউন্ড। সুদামা ফোন রেখে দিল। কৃষ্ণেন্দু অফিসে নেই, সে না থাকলে পিয়নও থাকে না, ক্লার্কও অন্য কোথাও গিয়ে তাস খেলে।

তা হলে ফোনটা কার? কৃষ্ণেন্দুরই। অন্য কোনো জায়গা থেকেও তো ফোন করতে পারে। হয়তো এতদিন বাদে তার মনে হয়েছে বাচ্চাটা রেখে দিলেই হত। আর একবার না হয় মা হত সুদামা। নাকি তার মনে হয়েছে কংসাবতী তীরে বর্ষার কথা। কী চমৎকার লিখেছিল।

পুরো ফ্ল্যাটে জা-শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাসুর কেউ নেই, তারা দুজন। কদমফুল সাজানো রয়েছে মেঝের উপর পর পর। সেই ফুলের দিকে চেয়ে বসে আছে দুজন। আহ! বৈশাখে বিয়ের পর সেই প্রথমই যেন দুজনে নিবিড় হতে পারল। তাদের ঘর তো গ্যাস-চেম্বার, সেখানে বর্ষা বসন্ত একইরকম, শীত-গ্রীষ্মের তফাত নেই। ঘরে সারাদিন, হ্যাঁ ছুটির দিনেও হয় শ্বাশুড়ি, না হয় জা, না হয় জা-এর মেয়েটি আছেই। রাত এগারোটার আগে কেউ কারওর মুখই ভালো করে দেখতে পেত না যেন। দুপুরে খোলা জানালার কাছে শুয়ে দুজনে মেঘ দেখছিল তারা। ভরন্ত-মেঘ, যুবতি-মেঘ, কুমারী-মেঘ, গর্ভিনী-মেঘ। গর্ভের ভাবে শ্লথ-গমনা মেঘ-নারী। কৃষ্ণেন্দু শোনাচ্ছিল এই সব, কবে সে দেখেছিল কংসাবতী তীরে জেগে উঠছে মেঘ। তারা যেন বিন্ধ্য পর্বতের কোল থেকে উঠে এল, এল নির্বাসিত যক্ষের হৃদয়বেদনা ধারণ করে। মিলিত হয়েছিল পরস্পরে। কুমারী মেঘ গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। সেদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণেন্দু খাতা-কলম নিয়ে বসে লিখেছিল সেই অলস-গমনা মেঘের কথা। যে বিবরণ শুনিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু, তার ভিতরে যেন নিজের মুখ দেখতে পেয়েছিল তরুণী বধূ।

সুদামা নিজেকে আছড়ে ফেলল বিছানায়। এখন যদি কৃষ্ণেন্দুর ফোনটা আবার আসত। তাকে সে এই সব কথা শোনাত। এসব কি এ গ্রহেই ঘটেছিল, এই জন্মেই?

আবার ফোন বাজল। এবার পরিষ্কার বাজছে। হাত বাড়িয়ে, অনেকটা নিজেকে এগিয়ে সুদামা ফোন ধরে। হ্যাঁ সুদামা বলছি, তুমি কোথায় ছিলে কৃষ্ণেন্দু, তোমার ঘরে ফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরেনি, কেউ নেই। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই যে সবাই পুরী গেল, ঘন বর্ষার দিন, মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের জানালায়, তুমি বলছ একটা তোমার, আর একটা তোমার ... কদমফুল গো কদমফুল, মনে আছে? এবারে আমরা বর্ষায় কদিন বেলগাছিয়ায় গিয়ে থাকি বরং, দাদারা ক-দিনের জন্য এই ফ্ল্যাটে ...। আচ্ছা নীলের চিঠি কী হল, পড়া হল ...?

নীলের কথা আবার মনে পড়ে গেল সুদামার। আচমকাই। সেই আশ্চর্য রোমান্সের সঙ্গে নীলের কী সম্পর্ক, নীল তো তখন জন্মায়নি। কিন্তু মনে হল যেন ছিল। চারপাশের বাতাসে ভাসছিল সে ...।

আমি সুহাস, সুহাস বোস ম্যাডাম।

কে! সুদামার হাত থেকে টেলিফোনের রিসিভার পড়ে গেল। সে ঘন নিশ্বাস ফেলে। তারপর আস্তে আস্তে রিসিভারটি তুলে কানে চেপে ধরে, তুমি মানে আপনি। বলবেন তো আপনি, আমি ভাবছি।

সুযোগ দিলেন কই ম্যাডাম, আপনি কি ফোন করেছিলেন?

কেন বলুন দেখি, কেউ তো ধরল না, আপনার স্যার কোথায়?

উনি বাইরে গেছেন নতুন একটা প্রজেক্টের ব্যাপারে। ফিরবেন এখনই, বেশি দূরে নয়, বাইপাসের দিকে। আমি ফোনটা ধরতে এলাম, অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল, কেটে গেল, মনে হল আপনি, কিছু বলবেন?

বলব! আপনাকে বলব! আপনাকে বললে কি বুঝবেন, শুনুন সুহাস, বলতে পারেন বর্ষা আসতে আর কত দেরি, অফিসিয়ালি বর্ষা কবে আসছে। খুব গরম! মেঘ কবে নাগাদ ঢুকবে এই শহরে, জানেন আপনি ...?

দশ

সুহাস বলল, খবর নিতে হবে, ম্যাডাম।

কী খবর নেবেন?

কবে নাগাদ বর্ষা নামবে?

আপনি কি হাওয়া অফিসে খবর নেবেন? সুদামা জিজ্ঞেস করে।

না, অন্য জায়গায়।

আর কোনো জায়গা আছে, যারা খবর দিতে পারে?

সুহাস বলল, খুঁজে বের করতে হবে।

সুদামা হাসতে লাগল, আপনার এখন কোনো কাজ নেই?

আছে তো।

কী কাজ?

এই যে কথা বলছি মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে, আচ্ছা আপনি এখন কী করছিলেন, ঘুমিয়েছিলেন?

সুদামা হালকা হয়ে যাচ্ছে। খারাপ লাগছে না তো কথা বলতে। ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান। চমৎকার কথা বলে। কী সুন্দর বলল, খোঁজ নেবে, খুঁজে বের করবে যারা বলতে পারে মেঘের খবর।

সুদামা বলল, হ্যাঁ ঘুমিয়েই তো ছিলাম।

তা হলে যে ফোন করলেন স্যারকে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?

হাসে সুদামা, আপনার যে খুব সাহস, হ্যাঁ আপনার সেই ঘোষচৌধুরী সাহেবের খবর কী, রহস্য ঔপন্যাসিক।

উনি এখন রহস্য তৈরি করছেন।

ইস, কী খারাপই না লেখেন, উনি কি খুনের পরিকল্পনা করেন সবসময়?

না, না তা কেন হবে। সুহাস হাসে, লোকটা উনি খারাপ নন।

এ তো আপনার বসের কথা, যাক গে উনি খারাপই হন আর ভালোই হন, আমার তাতে কী, তবে আমার যেন মনে হয় ..., যাকগে সে কথা, হ্যাঁ খোঁজটা কোথায় নেবেন?

সুহাস বলে, কত জায়গা আছে।

কত জায়গা মানে, আছে তো এক হাওয়া অফিসই।

সুহাস বলল, ধরুন, কোনো এক গাছের কাছে। কদমগাছ তো বলতে পারে।

সুদামা বলল, আপনি কি কবিতা লিখতেন?

সুহাস বলল, মনে হয় তা?

কী করে জানব, আপনার বস, মানে চ্যাটার্জি সাহেব লিখত। না কবিতা নয়, প্রোজ, আপনার সেই প্রজেক্ট কতদূর?

সুহাস বলল, যাবেন দেখতে?

আমি ওর কী বুঝি! সুদামা মাথার চুল কপাল থেকে সরিয়ে দেয়, আঁচলের খুঁট দিয়ে গলা মোছে, আর ধোঁয়া চিমনি, কারখানা কি দেখার মতো জিনিস, দানব দানব মনে হয় না?

সুহাস বলল, দানব এখনও জন্মায়নি, জায়গাটা খুব সুন্দর।

সুদামা বলে, সুন্দর জায়গাটা নষ্ট করার ব্যবস্থা করছেন।

তা কেন হবে?

গ্রিন তো থাকবে না।

কিন্তু একটা প্রজেক্ট, খুব বড়ো প্রজেক্ট, চারপাশ রাতারাতি বদলে যাবে।

তা যাক, কিন্তু সুন্দর কি থাকবে?

এক একজন সৌন্দর্যকে এক এক রকম ব্যাখ্যা করে।

যা-ই ব্যাখ্যা হোক, নদী পাহাড় সমুদ্র, সবুজ মাঠই তো লোকে দেখতে যায়, কারখানাকে দেখতে ছোটে?

আপনি দেখুন না।

সুদামা বলল, আপনার স্যারকে বলুন, উনি যদি নিয়ে যান।

একদিন গেলেই হল, হ্যাঁ ওদিকে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে মেঘের, কাছেই গঙ্গা, মেঘ তো নদী থেকেই আকাশে ওঠে।

কারখানা হলে গঙ্গা থাকবে?

বাহ কেন থাকবে না?

আপনি সবুজ রক্ষা করতে পারলেন না?

ওপারে সুহাস হাসে, আমি খুব ইমোশনাল। সত্যি সেদিন খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম। যাক আপনি আসুন মেঘের খবর নেব, নদীতে অনেক নৌকো, পাল তোলা, তারা হয়তো খবর দিতে পারে।

থাকুক গঙ্গা, থাকুক মেঘ, থাকুক নৌকো, সাদা পাল — ফোন রেখে দিল সুদামা। অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় কথা আর কত সময় ধরে চালানো যেতে পারে। সুহাস বোস কৃষ্ণেন্দুর জুনিয়র। বয়সে অনেক

ছোটো, অন্তত বছর আট তো হবেই। ফোন রেখে শ্বাস নিল সুদামা। হ্যাঁ, হালকা লাগছে অনেক। ঘরের ভিতরে যে গুমোট বাতাস ছিল তা যেন এই মিনিট-কয়ে-র ভেতরে উধাও। বন্ধ জানালা কি খুলল সুদামা। না, সব তো তেমনই রয়েছে। কথা হয়েছে কিছু সময়। কিন্তু সুহাসের কথা তো তার কানে কানে — সুদামা অবাক হয়ে গেল। কী সব ভাবছে সে! ঘরে যেন আলো অনেক। তা কী তার কথার জন্য! সে বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল। দুপুরে ফোন এলে তেমনই করে থাকে সুদামা। ইচ্ছে করেই কণ্ঠ উচ্চে তোলে কেননা প্রথমে কৃষ্ণেন্দু, পরে বিমলা চলে যাওয়ার পর এই ফ্ল্যাটে তো আর কেউ কথা বলে না। পাশের ফ্ল্যাটের অনিন্দিতা আসত ক-দিন। তার উদ্দেশ্য হল টিভি খুলে সিনেমা দেখতে দেখতে সুদামার সঙ্গে সিনেমার গল্প করবে। তাতে সিনেমাও হল, আড্ডাও হল। এখন তো সব সময় সিনেমা। সুদামার কোনো উৎসাহ নেই সিনেমায়, তা টের পেয়ে অনিন্দিতা এখন তার ঘরেই ডেকে নেয় তিনতলার মাধুরীকে। আবার মাধুরীও ডাকে অনিন্দিতাকে। সুদামাকেও ডাকে। গেল কবে সে?

সুদামার মনে হচ্ছিল এই ঘরে বহু সময় ধরে আলাপ হয়েছে। হাসতে হাসতে কথা হয়েছে। সেই আলাপের ভিতরে ছিল মেঘ-বিষয়ক কিছু কথাবার্তা, কদম ফুল, পুরোনো এক বরষা। আলাপ এখনই থামল। একজন চলে গেছে, একজন আছে।

সুদামা মনে করতে চেষ্টা করে কী কী কথা? হ্যাঁ, কংসাবতী তীরে বর্ষার কথা হয়েছে। বাইরে কী চকচকে রোদ, গরম বাতাস! এই সময়ে এই ঘরে নদী এসে ঢুকেছিল, মাথায় মেঘ, কী মেঘ! কুমারী মেঘ, মেঘ নারী, বর্ষণে বর্ষণে যে শীতল করে পোড়া পৃথিবী। কী যে হয়েছে তার। কখন এসব কথা হল। সুহাস বোস জানবে কী করে, 'একটা তোমার, আর একটা তোমার, এইটা তোমার, এইটাও তোমার ... সব ফুলই তোমার'।

সুহাস বোস তো নিতান্ত উচ্চাশী চাকুরে। বুদ্ধিমান। কিন্তু কত-বা আর বুদ্ধি ধরে? যে কৌশলটি প্রয়োগ করল সে তা তো বহু পুরাতন। বসকে খুশি করতে হলে তার অন্দরমহলকে খুশি কর। বড্ড ঘ্যানঘেনে ব্যাপার। বহু চর্চিত ওই কৌশলই তো রপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে সুহাস। প্রয়োগ করেছে সময় বুঝে। ঠিক দুপুর, একা ঘরে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। এই সময়ে যে মানুষই ফোন করুক, তার কণ্ঠস্বর প্রার্থিত মনে হয়। সুহাস সেই সুযোগই নিয়েছে। সকালে কিংবা রাতে ফোন করলে তো এত সময় কথা বলার সুযোগ পেত না। সুদামা নিজেই সে সুযোগ তাকে দিত না। টেলিফোন কৃষ্ণেন্দুর কাছে চলে যেত।

খামোকা ফোন করতে গেল ছেলেটা। উন্নতি করবে নিশ্চিত। কৃষ্ণেন্দুই তো বলে অতি বিনয়ী সুহাস তাকে 'স্যার' না বললেও ক্ষতি ছিল না। একই সার্ভিসের লোক। কিন্তু সুহাস চেয়ারের মর্যাদা দেয়। সে খুব সতর্ক। জানে কৃষ্ণেন্দু কিসে খুশি হবে।

তা হোক। চাকরি যখন করতে ঢুকেছে বীরভূমের কৃষক-পুত্র, সে তো উপরে উঠতেই চাইবে। যত উচুতে সম্ভব। তাতে সুদামারই বা কিসে মাথাব্যথা। সে ঘুরতে লাগল ফ্ল্যাটের ভিতর। মনে হচ্ছে, যেন আরও মিনিট নয়, আরও ঘন্টাই কথা হয়েছে। যতক্ষণ এই ফ্ল্যাট একাকী পড়ে আছে, ততক্ষণ। সেই বিমলা চলে যাওয়ার পর থেকেই সুহাস আলাপ জুড়ল ধীরে ধীরে। এখনই যেন মনে হচ্ছে সে একটু একা হয়ে গেল। ঘরে অতিথিকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল।

কী চমৎকার না কথা হল? বর্ষায় তো কদম্ব ফোটে, কদম্বে কুঁড়ি এসে যায় এই সময়েই, এখন জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। মে মাস শেষ হতে গেল। এই ঘরে বসে সুহাস যেন বলছিল, কদম্ব গাছের কাছেই জানা যেতে পারে কবে নাগদ মেঘ এসে শহর ভাসিয়ে দেবে। কদম্বও তো মেঘের অপেক্ষায় আছে।

কদম্বটা কোথায় আছে?

বেলগাছিয়ায়, মাঠের ধারে। সুহাস বোস তখনই উঠে যায় সোফা থেকে, ম্যাডাম যদি বলেন, দেখে আসি।

কী চমৎকার সব কথা হল। আলাপে আলাপে ঘর দুয়ার সব আলো হয়ে উঠল। মাধুরীদের ফ্ল্যাটের টিভিতে সিনেমার নাচ বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন যেন কানে আসছে উপরের টিভি-র শব্দ। যতক্ষণ সুহাস ছিল ততক্ষণ কানেই যে আসেনি। সুহাস বোস হোক বা যে কেউ হোক, সে অনেক কথা বলেছে অনেক সময় ধরে। হেসেছে হা-হা শব্দে। ডাইনিং কাম লিভিং-এ, শোওয়ার ঘরে, আর একটি ঘরে, আর একটি ঘরে।

কী আশ্চর্য মেঘ উঠেছিল তখন। মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল আকাশ। ফাঁকা ফ্ল্যাট। শ্বশুর, শাশুড়ি, জা, ভাসুর গেছে পুরীতে — ফ্ল্যাটে শুধু দুজন কথা বলছে। কথা বলছেই না অনেক সময়, চুপ করে বাইরে চোখ ভাসিয়ে আছে। মেঘ দেখছে। কথা যখন বলছে না তারা, তখনই যে বেশি কথা।

সুহাস বোস তো কত সময় চুপ করেই থাকল। সুদামা জানালার কাছে যায়। পরদা সরিয়ে দিতেই বাইরে ছায়া ছায়া ভাব। আশ্চর্য! রোদ কি মরে গেল। বিকেল হয়ে গেল, না তো, এখন যে দুপুর, ভীষণ দুপুর। পোড়া দুপুর, সমুদ্রতীরে বৈশাখ মাসের দুপুর যেমন তেজি থাকে, তেমনি দুপুর। বালিতে আগুন ধরে যাচ্ছে। সেই রোদ তো নেই। ছায়া ঘনিয়ে এল। সুদামা পটাপট পরদা তুলে দিতে থাকে। ছায়া ছায়া ছায়া! ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। বন কোথায় এখানে? কৃষ্ণেন্দু কী সুন্দর গাইত!

ছায়া কি সত্যি এল? নাকি বেলা পড়ে এল? নাকি সুদামার চোখে ঘোর এল। মেঘের স্বপ্ন এল। ফিরে এল সেইব দিনরাত্রি। নিঝুম হয়ে বাইরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে দু-চোখের পাতা নরম করে আনে সুদামা। আঁখি পল্লব ক্রমে বুজে এল, পাখি যেমন গোটায় রৌদ্র শেষ হলে, তেমনি। জানালার ওপারের প্রকৃতি ধীরে ধীরে

মুছে যায়। আকাশ মুছে যায়। সত্যিই মেঘ এসেছে কিনা তাও জানে না সুদামা। ঢলে পড়ে সে পরদার ওপরে জানালার গ্রিল জালে।

কৃষ্ণেন্দু ... ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। নীল ... মেঘ বলেছে যাবো যাবো ... মেঘ উঠেছে মা দেখো। কৃষ্ণেন্দু ... নীল। হ্যাঁ, ওরা দুজন। দুজনই শুধু। নীলকে লিখতে হবে অবশ্যই যেন আসে। আয় নীল আয়। আমার ভয় করছে। চমকে ওঠে সুদামা। চোখ খুলে যায়। সত্যিই তো মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সব। এ তার ঘোর নয়। এ তার ঘুম নয়, মুদিত চোখের অন্ধকার নয়।

এগারো

দু-হাতে পরদা সরিয়ে সুদামা বাইরে তাকায়।

বাইরে মেঘ এসে গেল! কখন? যখন তারা কথা বলছিল এ ঘরে ও ঘরে, কদম্বের কাছে খবর নেওয়ার কথা বলছিল সুহাস, তখন! না তো সুহাস তো কদম্বের কথা বলেনি, বলেছে তো শুধু খোঁজ নেবে। না, কি বলেছিল, তারই মনে নেই, কী যে ছাই বলেছে। ভুলেই গেছে সে। ভুলে যাওয়াই তো ঠিক। কৃষ্ণেন্দুর অফিসের একটা বাচ্চা ছেলে, (হ্যাঁ বাচ্চাই তো, বড়োজোর একত্রিশ, বত্রিশ হবে না বোধহয়। তার নিজের তো আটত্রিশ, না না ঊনচল্লিশ) টেলিফোনে কী না কী বলল তা নিয়ে ভাবছে সে। নীলের চেয়ে আর কত বড়ো হবে। সতেরো আঠেরো — হেসে ফেলেছে সুদামা, কম কি সতেরো আঠেরো?

সুহাস বোস আচমকা ফোনটা করল কেন? কী চমৎকার একটা ছুতো খুঁজে নিল। টেলিফোনে এই সুবিধেটা আছে। ... আপনি কি ফোন করছিলেন, ম্যাডাম? করছিলাম তো কৃষ্ণেন্দুকে। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কথা আছে।

সে যদি ফোন না-ও করত, সুহাস এই সূত্রতেই ফোন করতে পারত, আপনি কি ফোন করছিলেন? কৃষ্ণেন্দুর ঘরে তো মুহূর্মুহূ ফোন যায়। সে থাকলে সে ধরে, নতুবা অন্য কেউ ছুটে আসে। জরুরি ফোন থাকে অনেক। যখন ঘরে বা আশপাশে কেউ থাকেন না, ফোন বেজে বেজে থেকে যায়। জরুরি ফোনও বেজে বেজে থেকে যেতে পারে। তেমন হলে আন্দাজ করে কাউকে রিং ব্যাক করা যেতে পারে, সেক্রেটারি, ডিরেক্টর, মিনিস্টারের ফোনও তো থাকতে পারে। কিন্তু সুহাস কিনা আন্দাজ করল ফোনটা করেছিল ম্যাডাম চ্যাটার্জি — হাসি পেয়ে যায় সুদামার। কোন আকাশ সুহাসকে ওই খবর দিল? আসলে সুহাস ফোন করতই। শুধু প্রথম কথাটা খেটে গেল আচমকা। যদি সুদামা বলত সে কোনো ফোন করেনি, তা হলে কী বলার ছিল সুহাসের? সে কি ফোন রেখে দিত? নাকি কথা খুঁজে আলাপই করে যেত, যেমন করল। সুহাস তার ম্যাডামের সঙ্গে সহজ হয়ে কৃষ্ণেন্দুর অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইছে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! ছেলেটার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা ভাব আছে না। দূরাগত ধ্বনির মতো। বিপ বিপ বিপ ...। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওর গলা জড়িয়ে যায়। আজ গিয়েছিল খুব। তার সঙ্গে বারবার কথা বলতে চায়। অর্থহীন তুচ্ছ কথাকেও মূল্যবান অর্থপূর্ণ মনে করে। সুদামা জানালা থেকে আচমকা সরে আসে। এসব কী ভাবছে সে! কেন ভাবছে? ভাববে কেন? কৃষ্ণেন্দুর অফিসের একটা ছেলে ফোন করেছিল। করতেই পারে। শুধুই তো ফোন। সে তার ঘরে আসেনি। হাত ধরেনি। দু-কান গরম হয়ে ওঠে সুদামার। আবার কী ভাবছে সে? হাত ধরবে কেন? ও তো সুহাস বোস। কৃষ্ণেন্দুর অধীনে চাকরি করে। বীরভূমের সুহাস। খুব আলাপি। খুব উচ্চাশী। বসের স্ত্রীকে খুশি করছে। আর কিছু না। এরপর যেদিন ফোন করবে, সুদামা আচমকা ফোন রেখে দিয়ে শুয়ে পড়বে। ফোন রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। আশ্চর্য! কেন ঘুমিয়ে পড়বে সে? ঘুমোনোর কী আছে? ঘুমোবে বলেই ঘুমোতে পারবে? বরং বলে দেবে পরে কথা বলবে, সে খুব ব্যস্ত আছে। কিন্তু কিসে ব্যস্ত সে? তার কোনো ব্যস্ততাই যে নেই। তখন সে জিজ্ঞেস করবে, কখন ফোন করবে? তার চেয়ে যা বলার বলুক। ওর কথাগুলো তো সুন্দর। শুনতে ভালো লাগছিল তার। আশ্চর্য! ভালো লাগারই বা কী আছে? সে কি পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি? কতজন ফোন করে। কৃষ্ণেন্দুর অফিসের কতজন। তার সঙ্গে কথা বলে। অনিলবরণও তো কথা বলে। আরও কে কে যেন! কারা কারা? কৃষ্ণেন্দুর পরিচিত কারা কারা? তার পরিচিত কে কে? সুদামা নাম মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ না। কারওর নামই তো মনে পড়ছে না। তাহলে কি সুহাসই করে? সব ফোন সুহাসের? কলকাতা থেকে, কলকাতার বাইরে থেকে — সব সুহাসের কণ্ঠস্বর। মাথা ঝাঁকায় সুদামা। খোপা ভেঙে দেয় হাত ঘুরিয়ে। চুল ছড়িয়ে দেয় পিঠময়। চুল তার মুখমণ্ডলে উড়ে আসে। চোখের উপরে উড়ে আসে। চুল সরাতে সরাতে সে জানালার কাছে আবার সরে যায়। যদি নীল বাড়ি থাকত, ফোনটা সেই ধরত। নীলই সব ফোন ধরত। তাকে তুচ্ছ কথায় সময় নষ্ট করতে হত না সুহাস বোসের সঙ্গে। নীলের কথা নিয়ে মনের ভিতরে খেলতে চায় সুদামা। এখন ছেলেটা নেই, তাকেই ফোন ধরতে হবে। সুহাস তার সঙ্গেই কথা বলবে। নীল থাকলে বোধহয় নীলের সঙ্গে ভাব জমাত। সত্যিই কি তাই! তাহলে ওর গলা কেঁপে যাবে কেন, জড়িয়ে যাবে কেন? কী যে তার ভাবনা। অর্থ নেই কোনো। সুহাসের ফোন নিয়ে এত ভাবনার কি আছে?

সুদামা সব জানালার পরদা তুলতে তুলতে বলল, যা হোক, ফোনটা করেছিল বলে সময় তো কাটল। একঘন্টা, দু-ঘন্টা কেটে গেছে যেন। তার যে নিজস্ব সময় ধারণা আছে, সময় সম্পর্কে কল্পনা আছে, তা ঘড়ির সঙ্গে চলে না। ঘড়িতে তো সময় বাঁধা। সুদামার মনে হয় ঘড়ি নামিয়ে রাখে। ঘড়ি নামালেই সময় তার ব্যাপ্তি ফিরে পাবে। ওই যে সামান্য কয়েক মুহূর্তের কথা, ফালতু, অপ্রয়োজনীয় কথা, যা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়ার মতো, তা যেন বহু সময় ধরে বয়ে যাচ্ছে এখন। ওই কথার সময়ও ছিল অনেক, অনেক। না ঘড়ির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কী আশ্চর্য! ঘড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না কেন? কতটুকু কথা বলেছে সে? দশ মিনিট বড়ো জোর। নাকি তার চেয়েও কম সময়। নানা, আরও বেশি সময়। আধ-ঘন্টা, এক ঘন্টা, দু-ঘন্টার, তিন ঘন্টা, চব্বিশ ঘন্টা ধরে, দিন রাত্রি ধরে। কথা তো এখনও চলছে। বয়ে যাচ্ছে কথার রেশ।

সুদামা দেখে লবণ হ্রদের আকাশ ছায়াময়। রোদ নিভে কেমন একটা থমথমে ভাব। আশ্চর্য। আজই মেঘের প্রার্থনা করছিল সে কদম্বের কথা মনে করে, প্রার্থনা মঞ্জুর হল। এই মেঘ জল দেয় না কিন্তু ছায়া করে। তাও বা কম প্রয়োজনীয় কিসে? সুদামা ভাবে, সুহাসের ওখানে কি মেঘ এল?

ঘন, পূঞ্জীভূত মেঘ। আষাঢ়ের মেঘ। ডাক দেওয়া মেঘ। প্রিয় পুরুষ ডেকে ডেকে ফেরা মেঘনারী। ঘোর গর্জনে আকাশ পৃথিবী মন্দ্রিত। মেঘ কি নারী? না পুরুষ! কৃষ্ণেন্দু বলত, মেঘ নারী। কংসাবতীর তীরে মেঘনারী মিলনের পিয়াসে ডেকেছিল পুরুষকে। সেই কবে যেন। কতকাল আগে? কত জন্ম আগে। কিন্তু নারী কি ডেকে ডেকে ফিরতে পারে? নারীর কণ্ঠস্বর কি অমন ঘনগম্ভীর। মেঘ তো পুরুষ। ওই যে পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে জানালার ওপারে। সরে আসে সুদামা জানালা থেকে। তার কী হয়েছে। বুকে এমন কাঁপছে কেন? নীল ... নীল থাকলে ফোনটা সে-ই ধরত। ফোনের ধারে কাছে যেত না সুদামা। নীলের চিঠি লেখা হয়নি এখনও। নীলের কথা ভাবা হচ্ছে না এখন। নিঝুম দুপুরে সন্তানের কথা মনে করে বিষণ্ণ হয়নি সে। তার চোখে মুখে বিষাদ ছায়া ফেলেনি। চিঠিটা এখনও কৃষ্ণেন্দুর কাছে। ফেরত দেয়নি সে। কৃষ্ণেন্দু ফেরত দেয়নি বটে, সেও কি চেয়েছে? কেন চেয়ে নেয়নি? চিঠি তো লিখতে হবে। এখন চিঠি লিখতে বসলে নিশ্চিন্ত। দুর্ভাবনায় মাথা খারাপ হবে না। এলোমেলো ভাবতে হবে না। কিন্তু চিঠি তো চাই। এখনই চাই। চিঠিটা পেলে সে বেঁচে যেত। কৃষ্ণেন্দুর ফিরতে তো রাত। তাহলে কি রাতে লিখবে? অনেক রাতে একা একা, জেগে জেগে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু যদি ফেরত না আসে। অফিসের ড্রয়ারে রেখে দেয়নি তো? অফিসের ড্রয়ারে নানান কাগজের ভিড়ে পড়ে আছে নীলের চিঠি। তাহলে বরং ফোন করা যাক কৃষ্ণেন্দুকে। ফোন করে সে বলবে, এখনই চিঠিটা নিয়ে চলে আসতে। সুদামা টেলিফোনের দিকে এগোয়। রিসিভারটা তোলে। এখনও ঘাম লেগে আছে যেন। ডায়াল করলেই তো ফোন পৌঁছে যাবে সুহাস বোসের কাছে। কৃষ্ণেন্দু অফিসে নেই। সুহাসকেই বরং বলে দেবে চিঠিটার কথা। কিন্তু ওপারে বসে সুহাস তো তারই ফোন ধরবে। কেমন যেন শিথিল হয়ে যায় সুদামা। আস্তে আস্তে রেখে দেয় রিসিভার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

এখন সে কী করবে। সুহাসের ভয়ে ফোন করল না তার স্বামীকে। আচ্ছা, সুহাসে তার কিসের ভয়। সে এত গুটিয়ে যাচ্ছে কেন? সুহাসকে ডেকে সেও তো মেঘের খবর দিতে পারে। মেঘের খবর নিতে পারে। নিলে কী? ওই সুন্দর যুবক, তাকে মুগ্ধ করেছে। করতেই পারে। এক পুরুষের ভেতরে সব পুরুষের গুণ কি সমাবিষ্ট হয়? সে তো অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারে, সুহাস তোমার ওখানে কি মেঘ এসেছে?

না, না সুহাস কেন? কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দু তুমি কি মেঘ দেখছো ওখানে? বাইপাস তো সল্টলেকের গা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে চলে গেছে। উড়ে গেছে দক্ষিণে। কতদূরই বা যেতে পেরেছে? মেঘ নিশ্চয়ই এসেছে ওইদিকে। কিন্তু ফোনটা সে করে কী করে? কৃষ্ণেন্দু তো নেই। কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণেন্দু ... তোমাকে ডাকতে গিয়ে সুহাসকে ডাকতে যাচ্ছি কেন? কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণেন্দু, তোমার বদলে সুহাস আমার ঘুম ভাঙাচ্ছে কেন? নীলের চিঠিও কি তুমি সুহাসের হাতে দিয়েছ? সুদামা মেঝেয় বসে পড়ে। ফোন বেজে উঠল।

ফোন বাজছে। কার ফোন হতে পারে? সুহাস বোস কী খবর দিচ্ছে মেঘের। তার কথা আকাশ শুনতে পেয়েছে। নাকি সুহাস বোস বলবে গঙ্গার গা দিয়ে ভাসা মেঘ সে পাঠিয়ে দিয়েছে লবণ হ্রদের দিকে, দেখা হয়েছে তা?

অথবা কৃষ্ণেন্দুর ফোন। এসে শুনেছে ফোন করেছিল সুদামা, তাই হয়তো। সুদামার মনে হল কৃষ্ণেন্দুই। সুহাস হয়তো হাসতে হাসতে বলেছে, স্যার, ম্যাডাম খুব মেঘ ভালোবাসেন, স্যার ম্যাডাম বলছিলেন মেঘ কবে আসবে, কবে বৃষ্টি নামছে ... হা-হা-হা, ম্যাডাম কী চমৎকার কথা বলেন স্যার, উনি কি কবিতা লেখেন, পোয়েট? শুনে কৃষ্ণেন্দু হাসতে হাসতে ফাইলে চোখ নামায়।

সুদামা ফোন ধরল, কে কৃষ্ণেন্দু, নীলের চিঠি তুমি কার হাতে দিলে? কোথায় ছিলে, জানো আজ সেই যে বর্ষার মেঘ, কংসাবতী তীরে বরষা ... কদম্ব পুষ্প ...।

ওপারে নারীকণ্ঠ হা-হা করে হাসছে, কদম্ব পুষ্প। পারিসও বটে, বয়স তো হল রে আমাদের। হ্যাঁরে সুদামা, তুই কি স্বপ্ন দেখছিলি?

চম্পা। তার বাপের বাড়ির পাড়ার বন্ধু। অফিস থেকেই করছে। মাঝেমধ্যে এমন করে। একেবারে অনিন্দিতার স্বভাব। অনিন্দিতা টিভি দেখতে দেখতে, তা 'পথের পাঁচালী' ছবি হোক আর 'বাজিগর' হোক কথা বলবেই — চম্পা অফিসের ফোনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে ফোনে গল্প করে। ফাইল খোলা, চম্পা বলছে, তুই এখনও খুকি হয়েই আছিস সুদামা, কদম ফুল নিয়ে স্বপ্ন দেখিস, ভালোবাসাবাসি করিস, পনেরো বছরের পুরোনো বর আর কত প্রেম দেবে রে, হ্যাঁরে আছিস কেমন? উফ কী গরম। আমাদের এ সি আছে বলে রক্ষা, এ সি-র জন্যই তো অফিসে আসি, আমি আবার একদম গরম সহ্য করতে পারি না ...।

বারো

দিন সাত গেছে। সুহাস ভাবছিল তার ঘর থেকে আবার একটা রিং করবে কিনা সুদামা চ্যাটার্জিকে। সেদিনের আলাপের বিবরণ দিয়েছে সুহাস তার সাহেব স্যারকে। স্যার, ম্যাডাম কী সুন্দর কথা বলেন।

কৃষ্ণেন্দু তাকিয়েছিল তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে। শুনেছে কথাগুলো। শুনে হাসতে হাসতে বলেছে, তোমার তা হলে একটা কাজ বাড়ল, তুমি বরং প্রজেক্টের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে খোঁজ নাও কবে নাগাদ মেঘ আসতে পারে।

সুহাস সিগারেট এগিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুর দিকে। বলল, ও আমি বরং ফোনেই খোঁজ নিতে পারব স্যার, কৃষ্ণমূর্তি কি ফোন করেছিলেন?

কেন? কৃষ্ণেন্দুর দুই ভ্রূতে ভাঁজ।

ওঁদের ডিরেক্টর মিঃ মেটা আসবেন শুনেছিলাম, রাজারামপুর যাবেন প্রজেক্ট সাইট দেখতে।

কৃষ্ণেন্দু হাসে, তোমার বেশ মনে থাকে, না ফোন করেননি, তুমি তো জানতে পারবে। হ্যাঁ ওরা দশ লাখ টাকা জমা দিয়েছে, জানো।

জানি স্যার, ট্রেজারি অফিসার রবিন বলছিল, স্যার আর একটা কথা?

কী! কৃষ্ণেন্দুর কপালে উদ্বেগের ছায়া হয়তো।

কেউ কেউ বলছে আপনাকে ওরা অফার দিয়েছে, ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় অনেকগুলো প্রজেক্ট করছে।

তোমার মাথা খারাপ, গভর্মেন্ট সার্ভিস ছেড়ে, ও সব শোনা যায়।

কিন্তু ওদের ওখানে স্কোপ তো অনেক বেশি।

এই বয়সে হয় না। কৃষ্ণেন্দু বলেছে।

না, না, এই বয়সটাই তো কাজের সময়, আপনার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাবিলিটি ওরা কাজে লাগাতে পারবে, বয়স কোনো ফ্যাক্টরই নয়, যে এজ-এ সকলে তো দক্ষতার শীর্ষে উঠে যায়, অথচ সুস্থ, কর্মঠ মানুষকে ঘরে বসিয়ে দেয় গভর্মেন্ট ...।

কৃষ্ণেন্দু প্রসঙ্গ ঘোরায়, তুমি মাঝে-মধ্যে ফোন কোরো সুদামাকে। ও তো একা, ওর বন্ধুই না হয় হয়ে যাও। ওর একটা ভাই আছে, ব্যাঙ্গালোরে থাকে। তোমারই বয়সী হবে হয়তো। শি লাইকস য়্যু। এসব মেঘের গল্প আমি শুনেছি, খুব প্রশংসা করছিল তোমার।

কথা এইরকম। এর পরে সুহাস আবার এলপিজি প্রজেক্টের দিকে কথা ঘোরায়। কৃষ্ণেন্দু হুঁ-হাঁ উত্তর দেয়। সুহাস প্রজেক্ট বিষয়ে তার মতামত দেয়, কমপেনসেশন খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ল্যান্ড নিয়ে কিছু জটিলতা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৃষ্ণেন্দু বলে, ল্যান্ডের জটিলতা থাকবেই, যাকগে মিঃ মেটাকে ভালো করে সাইটটা দেখানো দরকার, ওঁরা বাইপাসের কাছে জমি চাইছেন। অসমে একটা এলপিজি প্ল্যান্ট করছেন, ওড়িশতে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, বিহারে থার্মাল পাওয়া — একটাই কোম্পানি, কত ব্যবসায় নামছে?

সুহাস বলল, প্রাইভেট সেক্টরের প্রসার যেভাবে হচ্ছে, এরপর গভমেন্ট সার্ভিসে কেউ থাকবে না স্যার, মহারাষ্ট্রে এক সিনিয়র আই এ এস, চাকরি ছেড়ে মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করেছে, খবরটা দেখেছেন?

কৃষ্ণেন্দু চুপচাপ। সুহাস তখন উঠে এসেছিল কৃষ্ণেন্দুর সামনে থেকে। সুহাস ভেবেছিল খবরটা দেয়। কী খবর, না তার 'স্যার' হয়তো ...। কিন্তু তা বোধহয় কৃষ্ণেন্দুর অভিপ্রেত নয়। কোথাও অফার পাওয়া, অফার নেওয়া বা না নেওয়া, এ সব কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আজ আবার ভাবছে সুদামাকে ফোন করে। না, অন্য খবর দেবে। ভাবছিল ডেকে বলে, খোঁজ পেয়েছি ম্যাডাম।

কিসের খোঁজ?

মেঘের খোঁজ।

আপনি কি সেই হাওয়া অফিসের খবর, আরে ওরা তো বিভ্রান্ত, এক-একদিন এক-একরকম খোঁজ দিচ্ছে, কোনোদিন বলছে দু-দিনের ভিতরে বৃষ্টি, পরের দিন বলছে মেঘের দেখা নেই, বৃষ্টির সম্ভাবনাই নেই, ওদের যন্ত্রপাতি সব বিগড়ে গেছে সুহাসবাবু।

ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম, ওরা বলছে সের দরে সব বেচে দেবে, একটা বোর্ড লাগিয়ে দেবে, 'ফর সেল'।

কী সেল করবে? যন্ত্রপাতি কে কিনবে?

যন্ত্রপাতি নয় ম্যাডাম, অন্য কিছু, হয়তো মাথার আকাশটা।

ওপারে হাসির শব্দ। সেই শব্দে কী যে মধুরতা। আটত্রিশ-ঊনচল্লিশের মহিলা কুড়ি-বাইশের তরুণী হয়ে গেছে। বলছে, আপনি সিভিল সারভেন্ট হয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিন্দে করছেন।

স্যরি ম্যাডাম, আপনি আমার বসকে জানাবেন না, বস আবার ভীষণ সরকারি, ধরুন কেউ যদি তাঁকে অফারও দেয় ... (না, শেষের কথাগুলো বলা যাবে না। কৃষ্ণেন্দু বিষয়ে কোনো কথাই বলবে না, ভালোই লাগবে না।)

বরং সুহাস বলবে, হাওয়া অফিসের ভার নেবেন মিঃ অজিত আগরওয়াল, ভোপালে তাঁর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে, ইউপি-তে আছে সুগার ফ্যাক্টরি, মহারাষ্ট্রে কাপড় কল, আর আসামে বাঁশবাগান।

বাঁশবাগান! খিলখিল করে হাসছে সুদামা, কী সুন্দর কথা বল তুমি সুহাস, বাঁশবাগান কেন?

এমনি! বাঁশ কেটে চালান দেন, কত বাঁশ প্রয়োজন ভারতবর্ষে, এ নিয়ে আর একটা ডিসকাসন হতে পারে, হ্যাঁ আমাদের দেশের রোদ্দুরও কিছুটা কিনছেন অজিত আগরওয়ালজি, নরওয়ের এক কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ, শীতের দেশে রোদ্দুর সাপ্লাই করবেন, ওফ, কী রোদ না হয়েছে ম্যাডাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মালদহে খরা, জল নেই, এত রোদ আর কোনো দেশে হয়, গ্রিনল্যান্ডে সাপ্লাই যদি করা যেত —

কী চমৎকার বলছ, চেরাপুঞ্জির মেঘ গোবি সাহারার বুকে, সুহাস তুমি কি কবিতা লেখো?

নো ম্যাডাম, আপনি এখন কী করছিলেন?

কী আর কিছুই না, তুমি?

কিছুই না ম্যাডাম, কিছুই না, আমাদের এখানে ক-দিন খুব দৌড়-ঝাঁপ চলে, আবার ঠান্ডা, ভাঁটা পড়ে কদিনের জন্য, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, দিন-রাত, জোয়ার-ভাঁটার মতো, আপনি এখন কি ঘুমিয়েছিলেন?

না, না তোমার ফোনের জন্য বসেছিলাম।

ভাবতে ভাবতে রিসিভার তুলবে সুহাস, তো ঘরে ঢুকল অনিলবরণ, শোনো সুহাস, মার্ডার ইজ অ্যান আর্ট, তুমি কি বিশ্বাস কর?

টেলিফোন নামিয়ে সুহাস বলল, কেউ কি বিশ্বাস করে এ কথা?

আমি করি, অনিলবরণের কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়, মাথায় দশটা খুন বিজবিজ করছে।

সুহাস চুপ করে থাকে। তার খুব ইচ্ছা করছিল সুদামার সঙ্গে কথা বলে। হ্যাঁ, ওই কথাগুলোই হবে। কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জির স্ত্রী খুব খুশি হবে তার ফোন পেয়ে, রাগ করবে, কী ব্যাপার, আর তো ফোন করলেন না?

ব্যস্ত ছিলাম ম্যাডাম।

কিসে ব্যস্ত?

আপনি একটা কাজ দিয়েছেন।

কী কাজ?

মেঘের খবর।

ও তাই নাকি। ওপারে নারীকণ্ঠে উচ্ছ্বাস শোনা যায়, জানলেন কিছু?

সুহাস বলে, জানি না আপনি ছাড়া আর কেউ এসব বিশ্বাস করে কিনা।

অনিলবরণ চেয়ার জুড়ে বসে, বিদেশে এসব নিয়ে রীতিমতো গবেষণা হয়।

আমি তো শুনিনি স্যার।

ইন্টারেস্ট থাকলে তো শুনবে, এখন তো সিরিয়াস ব্যাপারে কারওর মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সুহাস তুমি কি জানো, হোয়াট ইজ পয়জন?

সুহাস হাসবে, না খুব গম্ভীর হয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো অনিলবরণের সামনে বসে থাকবে তা ঠিক করতে পারছিল না। অনিলবরণ মাঝে-মধ্যে এইরকম বিচিত্র বিষয় নিয়ে কথা আরম্ভ করে। আর সব কথাই ধ্বংসাত্মক। একদিন সেই কথা নিয়ে অনিলবরণ দু-ঘণ্টাই কাটিয়ে দিল পাঁচটার পর, পুলিশ রেপ এবং মার্ডার, লকআপে পিটিয়ে মারা। মেজাজই খারাপ করে দেয় মানুষটা। সময় পেলেই যত সব হিংস্রতা নিয়ে কথা বলে। হাওড়ায় যে একটা মানুষকে কিছু লোক পিটিয়ে পুড়িয়ে দিল, অনিলবরণ বলে, একটা-দুটো এসব ব্যাপার হলে অ্যান্টি-সোশ্যালরা সতর্ক হবে, হিংস্রতা চরমে উঠে গেলেই মানুষ আবার তার নিজস্ব ভূমিতে ফিরবে, শান্ত হবে, নরম হবে। অনিলবরণ সাপোর্ট করে এসব। দেশকে একটা ভালো জায়গায় আনতে হলে ড্রাসটিক স্টেপস নেওয়া প্রয়োজন। কিছু বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষের হাতে ক্ষমতা যাওয়া দরকার। শুনতে শুনতে রাগ হয় সুহাসের। সে তর্ক জোড়ে।

সুহাস ইদানীং ভয় করে অনিলবরণকে। এখন সে যেভাবে বসেছে তাতে ঘন্টা-দেড়েকের আগে উঠবে না। সন্ধের পর চ্যাটার্জি সায়েবই তো ফিরে যাবেন ঘরে, তার তো ইচ্ছে করছিল ফোন করে। সুদামা, তুমি কী করছিলে? সুহাস দাঁতে ঠোঁট কাটে, আপনি কি অমিতাভ ঘোষ পড়েছেন ম্যাডাম, বিক্রম শেঠ? কী ছবি দেখলেন ইদানীং, রশোমন দেখেছেন কুরোসোয়ার, কী নাটক, নাটক দেখতে ভালোবাসেন?

অনিলবরণ বলে, তুমি আগাথা ক্রিস্টি পড়েছ, কোনান ডয়েল?

হ্যাঁ স্যার।

মার্ডার মিস্ট্রিগুলো অদ্ভুত না! খুনিরা খুব ইনভেনটিভ হয়, আনার মনে হয় পয়জনিং একটা আর্ট, তুমি কী বল?

জানি না স্যার, গাঁয়ে দেখেছি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে চাষি বউরা খেতের পোকা-মাকড় মারার বিষ তেল, এনড্রিন খেয়ে মরো-মরো, কী কষ্ট, একটা কেস আমি সিউড়ি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম, আপনি হঠাৎ যে এ নিয়ে ভাবছেন?

অনিলবরণ বলে, একটা রহস্য উপন্যাস আরম্ভ করব। খুনটা কী দিয়ে হবে, বিষ! নিঃশব্দে মৃত্যু অথবা গুলি বন্দুক, গলায় ফাঁস দিয়ে, কতরকমভাবে মার্ডার করা যায় জানো তুমি? অনিলবরণের মাথায় চাঁদের পরে চাঁদ লেগেছে ...।

নো স্যার।

একশো পঁচানব্বই রকমের উপায় আছে, যাকে খুন করা হবে তার উপরেই নির্ভর করবে কীভাবে তাকে খুন করা হবে, ধরো কোনো বাচ্চা সবে জন্মাল, জাস্ট বেরিয়েছে, তাকে যদি সরাতে চাও, সেরেফ লবণ, কমন সল্ট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, আমি তুমি লবণ ছাড়া কিছুই খেতে পারব না, অথচ ওই লবণই হল আর একজনের কাছে বিষতুল্য।

সুহাস অবাক হয়ে অনিলবরণের মুখে তাকিয়ে আছে। কীরকম নির্বিকার হয়ে সদ্য জন্মানো শিশু-খুনের কথা বলে গেল। ভেবেছে নিশ্চয়ই। অনিলবরণ বলছে, আন ওয়ান্টেড বেবিকে এভাবেই তো শেষ করে দেওয়া হত, বিষ আমাদের চারপাশে আছে, শুধু কেস বুঝে প্রয়োগ করতে হবে। হিটলারের জার্মানিতে অসুস্থ মানুষ, দুর্বল মানুষ, অসুস্থ বাচ্চাদের মেরে ফেলা হত, তা জানো? মার্সি কিলিং শব্দটা শুনেছ? বিষ ইনজেকশন দিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হত চিরকালের মতো, আরে বাচ্চাদের ফ্যামিলির লোকই রাষ্ট্রের কাছে মার্সি কিলিং-এর আবেদন জানাত, নাৎসি জার্মানির মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল অসুস্থ দুর্বল মানুষ সমাজের বোঝা।

সুহাস বলল, ভয় লাগে শুনতে, এসব আমার ভাবতে ভালো লাগে না।

অনিলবরণ হাসে, ভাবতে ভাবতে আমার তো ঘুমই আসে না, খুন করা খুব সহজ ব্যাপার, তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিলেই হল, তোমাকে যদি আচমকা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই টেনথ ফ্লোর থেকে, মরে যাবে। তোমাকে ধর মেট্রো রেল স্টেশনে ছোট্ট একটা ধাক্কা, নীচে পড়ে গেলে, হাই ভোল্টেজ লাইন, সঙ্গে সঙ্গে শেষ, ওডেসা ফাইল-এ এইরকম একটা দৃশ্য ছিল না?

মনে নেই স্যার।

অনিলবরণ হাসে, তোমার ইন্টারস্টেই নেই তাই মনে নেই, ছুরি বন্দুক তো এখন হয়েছে, আগে তো এসব ছিল না, মার্ডার হতই, তখন ছিল পয়জন, আসলে কী জানো, ছুরি বন্দুক আমার খুব খারাপ লাগে। মৃত্যু ঘটানো উচিত রক্তপাতহীনভাবে, ঘুমের ঘোরে নিঃশব্দে মারা যাক মানুষ, হাসতে হাসতে মারা যাক। হার্টের রোগীকে আচমকা ভয় দেখিয়ে মারা যায়, হাই প্রেসারের পেশেন্ট-এর টেনশন বাড়িয়ে বাড়িয়ে মেরে ফেলা যায়, এ হল মার্ডারের সবচেয়ে সূক্ষ্ম টেকনিক, ধরতেও পারবে না, মার্ডার না অ্যাকসিডেন্ট। নাৎসিরা এসব নিয়ে গবেষণা করত, তাদের মতো ক্রিয়েটিভ খুনি পৃথিবীতে আর জন্মায়নি।

না জন্মানোই তো ভালো। সুহাস বলে।

অনিলবরণ শোনে না সুহাসের কথা, বিড়বিড় করে, কতরকম যে খুনের পদ্ধতি ছিল, তাদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে কত মানুষ একসঙ্গে মেরেছে। মেয়েদের পাঠাল স্নানঘরে, বাথ হাউসে, চুল কেটে, জামাকাপড় খুলে, হাতে সাবান তোয়ালে নিয়ে তারা ঢুকে যাচ্ছে মৃত্যু গহ্বরে — ওফ ভাবতে পারো, মানুষ খুনের কী বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করেছিল হিটলারের পুলিশ, সেনাবাহিনী, নিশ্চিন্তে মৃত্যুর দিকে হাঁটছে নগ্ন নারীরা।

সুহাস বলল, আমার সত্যিই এসব শুনতে ভালো লাগে না স্যার।

অনিলবরণ হাসে, তুমি একটা ফোন করতে যাচ্ছিলে, আমি ঢুকে পড়ায় ফোনটা রেখে দিলে, জরুরি ছিল? ফোনটা করে নাও, আসলে আমি কীভাবে খুনটা করব তা ঠিক করতে পারছি না, এ তো স্রেফ ডিসকাসন, জাস্ট ডিসকাসন, তার বেশি কিছু নয়। আমি ঘুরে আসছি, তুমি ফোনটা সেরে নাও। বেয়ারা ডেকে চা বলে দাও দেখি।

তেরো

কেউ একজন খুব হবে, কাউকে খুন করা হবে, কিন্তু কীভাবে? মানুষ খুন করার সবচেয়ে পুরোনো পদ্ধতি হল বিষ প্রয়োগ। বিষ কী? বিষ তো প্রতিদিন একটু একটু করে আমরা আমাদের শরীরে গ্রহণ করে থাকি। যে জীবনদায়ী ওষুধ ব্যবহার করছি জীবন বাঁচানোর জন্য, তাই-ই পরিবেশ এবং পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেলে হননের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। আবার এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যে উপকরণকে বিষ বলে জানি আমরা, তাই-ই কোনো কোনো সময়ে জীবনদায়ী উপাদান হয়ে ওঠে। আর্সেনিক-পারদ-সিসা, কিছু অ্যালকালয়েড যেমন, মরফিন, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি তো তীব্র বিষ, অথচ এই বিষই আবার অনেক ক্ষেত্রে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে ব্যবহার হয়ে থাকে। বিষ এক আশ্চর্য জিনিস। যাকে খুন করা হবে, তার শরীর-ই বলে দেয় তার উপরে কোন বিষ প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনিলবরণ লিখছে।

অনিলবরণ লিখছে, বিষ বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের গতি বদলে দিয়েছে। অবলুপ্তির পথে পাঠিয়েছে বহু রাজবংশকে। প্রতিষ্ঠা দিয়েছে নতুন শাসককে। মধ্যযুগ, প্রাচীন যুগ, আদিম যুগে বিষচর্চা ছিল রীতিমতো শিক্ষার বিষয়। বিষ প্রস্তুত এবং প্রয়োগ কৌশল-নিপুণ মানুষ সম্মানিত হত ইতিহাসখ্যাত নগরে। আশ্চর্য। সেই যে যুগে নারীরাই প্রধান ভূমিকা নিতেন বিষচর্চায়। তাঁদের সেইভাবে তৈরি করত রাষ্ট্রশাসকরা, নারীর কোমল রূপটিকে বিষ প্রয়োগ কর্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতে সুবিধে হত অনেক। অন্ন, জলদাত্রী, স্নেহ-মায়াদাত্রী নারীর হাতে যে বিষপাত্র থাকতে পারে, এ ছিল কল্পনার অতীত। ইতিহাসে কত বিষকন্যার কথাই না আছে। খ্রিস্টজন্মের চারশো বছর আগে পারস্য দেশের রানি ছিলেন বিষ প্রয়োগে সিদ্ধ। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে এক আশ্চর্য উপায়ে হত্যা করেন। খ্রিস্টজন্মের দুশো বছর আগে রোমের অভিজাত পরিবারের নারীরা বিষ প্রস্তুত এবং প্রয়োগে ছিল নিপুণা। সম্রাট নিরোর মা আগরিপিনা বিষ প্রস্তুতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন রোমেরই আর এক বিষকন্যাকে। তারপর সে-ই বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন স্বামী ক্লদিয়াসকে। রোমের সেই বিষকন্যাকে সম্রাট নিরো সিংহাসনে বসার পর পুরস্কৃত করেন রাষ্ট্রীয় সম্মানে। রাষ্ট্রীয় বিষকন্যা রীতিমতো শিক্ষণপ্রণালী চালু করে দেয় বিষ প্রস্তুত এবং প্রয়োগ বিষয়ে। নানারকম বিষরে খবর রাখত সে। সম্রাট তার কাছে দাসদের পাঠাতেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। সেইসব দুর্ভাগা দাসদের উপর সে বিষ প্রয়োগ করে তার বিষের গুণাগুণ নির্ধারণ করত। কী আশ্চর্য দিনই না ছিল! কীভাবে খুন করা যেতে পারে তা নিয়ে চর্চা হত রীতিমতো। এখন এইরূপ দেখা যায় না।

অনিলবরণ লেখে, মানুষের জ্ঞানচর্চার একটি মূল্যবান দিকই অবহেলিত। মৃত্যু তো স্বাভাবিক সত্য। বিষচর্চা তো মৃত্যুচর্চা। বুদ্ধিমান মানুষ গোপনে জ্ঞানের এই মূল্যবান শাখাটিকে আবার চর্চা করতে পারে। আমাদের পরিবারে এইরূপ চর্চা ছিল। শোনা যায়, আমার পিতামহ নগেন্দ্রর অনুজ সুরেন্দ্রকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন তাঁরই আর এক অগ্রজ নরেন্দ্র। দুজনে একই ব্যাবসা করতেন। আবার নরেন্দ্রর পুত্র জীবেন্দ্রকে সেঁকো বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন সুরেন্দ্রর বিধবা পত্নী। এই রকম আরও অনেক ঘটনার কথা জানা যায়। প্রতি পরিবারেই বিষের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। হননের ইচ্ছা মানুষের জন্মগত। শিশুরা তো কীটপতঙ্গ। ছোটোখাটো প্রাণী হত্যায় উল্লাস অনুভব করে। কৈশোরে উপনীত হলে সেই ইচ্ছাটি চাপা পড়ে যায় অন্য অনেক অনুভূতির ভেতরে। যৌবনে মানুষ প্রেম ভালোবাসায় জড়ায়। মধ্যবয়সের পর আবার তার ভিতরে হননের ইচ্ছা জেগে উঠতে থাকে। হ্যাঁ, এটাই সত্য।

অনিলবরণ লেখে, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আনুকূল্য না পাওয়ায় নারীর সেই নিজস্ব প্রকৃতি আজ যেন অন্তর্হিত। বিষ প্রস্তুত এবং প্রয়োগের বিদ্যাটি আজ অবলুপ্তির পথে। নরহত্যার নানা উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় বিষের ভূমিকা ক্রমশ গৌণ। আমার মাতুলালয়ে, বড়ো মাতুল স্বর্গীয় বিমানবিহারী গুহ মহাশয়কে পারদ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তিনি গলিত দেহে যন্ত্রণাকাতর হয়েছিলেন অনেককাল। না মাতুলানী তো তখন বেঁচেই ছিলেন না। মা বলতেন, মাতুলকে হত্যা করেছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ

একজন। তারা সন্দেহ করত তাদের বাড়ির মেয়ে, আমার মাতুলানী স্বর্গীয়া রানিবালা দেবীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন তাদেরই জামাই, আমার মাতুল।

অনিলবরণ লেখে, বিষ প্রয়োগ করা হত কেবলমাত্র শক্তিমানকে হত্যার জন্য। বিষ অতি মহার্ঘ বস্তু, তা যত্রতত্র প্রয়োগ করা হত না। নারী হত্যায় বিষপ্রয়োগের কথা তেমন শোনা যায় না। দুর্বল অরক্ষিতা নারীকে বিষ প্রয়োগে হত্যার প্রয়োজন হত কিনা সন্দেহ আছে, নারী হত্যার জন্য আগের দিনে অর্থাৎ একশো দুশো বছর, কি পঞ্চাশ বছর আগেও বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন হত না। এখনও হয় না। বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে হলে হত্যাকারীকে নানান পরিকল্পনা করতে হয়, বিষ প্রয়োগের জন্য সময় নির্বাচন করতে হয়। হত্যাকারীকে তার মনোবাসনা গোপন রাখতে হয়। হতভাগ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। এবং এই ঘনিষ্ঠতা নারীর দ্বারা স্থাপন করা সবচেয়ে সহজভাবে সম্ভব ছিল। এমন ঘটনাও শোনা গেছে হতভাগ্য পুরুষের সঙ্গে মিলনের পর নারীকে তার হাতে তুলে দিতে হয়েছে বিষ পানীয়।

নারী হত্যার জন্য আগুনই যথেষ্ট। গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার পদ্ধতি অনেক পুরোনো। নারীকে জন্তু জানোয়ার কীটপতঙ্গের ন্যায় হত্যা করাই হল সামাজিক পদ্ধতি। কখনও পেট্রল ও দেশলাই কাঠি, কখনও রিভলবারের একটি গুলিই সেখানে যথেষ্ট। অতি সম্প্রতি জনৈক রাজনীতির কারবারি নেতা নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে হত্যা করে হোটেলের তন্দুর চুল্লিতে দাহ করে দেহটি নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। শেষ রক্ষা হয়নি বটে, কিন্তু সে যদি দাহ কাজটি সম্পন্ন করে ফেলতে পারত, ওই হত্যাকাণ্ডের কিনারা হত না। আর একটি ঘটনার কথা শোনা গেছে, স্ত্রী হত্যা করে সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করে কুমীর দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে কোনো এক ক্ষমতাধারী রাজনৈতিক নেতা। বিষ প্রস্তুত এবং প্রয়োগের কারণে নারীকে যেহেতু ব্যবহার করা হত নিপুণভাবে, নারীও আত্মহত্যার জন্য বিষ ব্যবহার করত। এখনও আত্মহত্যার জন্য বিষ কিংবা অ্যাসিড ব্যবহার করে থাকে স্ত্রীজাতি।

একটি কথা মনে হয়, বিষ প্রস্তুত এবং প্রয়োগে খুনির উদ্ভাবনী শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যেত, তা ক্রমশই অন্তর্হিত। এই সব হত্যাকাণ্ডে অপরাধী এবং রহস্যভেদী যেন গোপনে পরস্পরে বুদ্ধির খেলায় রত হতেন। সেইরূপ এখন আর দেখা যায় না। পরবর্তীকালে খুনি, অপরাধী আত্মপ্রকাশ করেই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে থাকে। সেক্ষেত্রে কোনো রহস্যই আর থামে না রহস্যভেদীর জন্য। তবে হ্যাঁ, অপরাধীর খুনের বিচিত্র সব উপায় উদ্ভাবন কিন্তু কখনওই থেকে থাকে না। এই বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল হিটলারের জার্মানিতে গ্যাস চেম্বারে লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যার ভেতর দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেক অপরাধী ও অপরাধকে আলোয় এনেছে। অপরাধী অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজন আর বোধ করেনি তখন থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকাল হল হননের নানারূপ পদ্ধতি উদ্ভাবনের সময়। গ্যাস চেম্বার, বিষ ইনজেকশন, অনাকাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমা দিয়ে জনপদের

পর জনপদকে ধ্বংস করেও অপরাধীর মনোবিকলনের কোনো চিহ্নের খবর আমরা পাইনি। গণহত্যাকে রাষ্ট্র নায়কদের সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ মানা হতে লাগল মহাযুদ্ধের পর থেকেই। গণহত্যার পক্ষে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রশাসকরা যুক্তি সাজিয়ে আসছেন গত পঞ্চাশ বছর ধরে। সাতের দশকের প্রথম ভাগে এই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতাভোগী রাজনীতিক এবং পুলিশ বাহিনী গণহত্যার যে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তার রেশ এখনও কাটেনি। সেই সব হত্যাকারীর রক্তই এখনও পুলিশ বাহিনীর ভেতরে যত্রতত্র জেগে ওঠে। এই পৃথিবীতে হত্যাকারীর মৃত্যু অতি সহজে হয় না। হত্যাকারী আগে হত্যাকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি সাজাতে ভয় পেত, এখন তারা অসংখ্য যুক্তি সাজিয়ে হত্যাকাণ্ডকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেহারা দিতে পারছে। নাৎসি জার্মান জাতি পরাস্ত জাতি, জনগোষ্ঠী, ইহুদিদের নির্মূল করার পক্ষে অনেক যুক্তি সাজিয়েছিল। হত্যার পক্ষে হত্যাকারীর যুক্তি সাজানোর আরম্ভ যেন সেই প্রথম। তারপর সেই ধারাই চলছে। পুলিশ বাহিনী কী চমৎকার না যুক্তি উত্থাপন করে। লকআপে পিটিয়ে মেরে, ধৃতের চক্ষুতে অ্যাসিড ঢেলে অন্ধ করে দিয়ে পুলিশ বাহিনী কিন্তু অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় না।

বিষ প্রয়োগে হত্যার ভেতরে হিংস্রতার প্রকাশ হত কম। ধীরে ধীরে হতভাগ্যর প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে আসত। ঘুমিয়ে পড়ত সে। আমার মনে হয় মানুষ এখন হিংস্রতা চায়, এবং সেই কারণেই বিষের ব্যবহার কমে গেছে। বিষ প্রয়োগে যে হিংস্রতা ছিল না তা নয়, যে কোনো হত্যার ভেতরে লুকোনো হিংসা থাকেই। কিন্তু তা লুকোনোই মাত্র। ওই হত্যাকাণ্ড আর পাঁচজনকে অপরাধে প্রবৃত্ত হতে প্ররোচিত করতে পারত না। গ্যাস চেম্বার, হিরোসিমা, নাগাসাকি, ভিয়েতনামের গ্রাম — হিংস্রতাকে আলোয় এনেছে। হত্যাকারীর জান্তব উল্লাসে রহস্যভেদী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। বিষপ্রয়োগে হত্যাকারীর জান্তব উল্লাস প্রকাশ যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়। বরং অস্ত্রের সাহায্যে রক্তপাত ঘটালে সেই রক্তদর্শনে আর একটি হত্যার ইচ্ছা তার ভেতরে জেগে উঠতে পারে। পুলিশকে ক্ষমতা প্রকাশ করতে একটি হত্যা করলে তো চলে না। হননের অভ্যাস বজায় রাখার কারণে পিটিয়ে মারাই তাদের কাছে প্রিয়তম পদ্ধতি।

অথচ বিষের কী শক্তিই না ছিল। বিষচর্চা অব্যাহত থাকলে আজ যাবতীয় হত্যাকারীর বিরুদ্ধে এত প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারত না। আহা কী দিনই-না পার হয়ে গেছে! ধুতুরা, কলকে ফুল, লাল চিত্রা, আকন্দ, রক্তকরবী দিয়ে কী ভাবেই না নর হত্যা করা হত। প্রকৃতিদত্ত এই বিষভাণ্ড ত্যাগ করে হত্যাকারী তার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটিই হারিয়েছে যেন। ফুল যেমন মন স্নিগ্ধ করে, ফুল তো জীবনহানিও করতে পারে। প্রকৃতিতে এগুলি আছে ব্যবহারের জন্যই। মানুষের মাথার ভেতরে কাঠগোলাপ, রক্তগোলাপ, জুঁই, চামেলি, বেলি, রজনীগন্ধা, কাঁটালি চাপা যেমন ফোটে, আকন্দ, ধুতুরাও তো ফোটে। কিন্তু সে কথা কে মনে রেখেছে? পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ধনী রাষ্ট্রগুলি বারুদের গন্ধই পছন্দ করে বেশি। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা অস্ত্র উৎপাদন করে যাচ্ছে, আর তা ব্যবহারের জন্য যুদ্ধ বাধাচ্ছে। যুদ্ধ চলছে, গণহত্যার জন্য বিষ উপযুক্ত নয়, তাই অস্ত্রের এত রমরমা। এতে খুনির উদ্ভাবন শক্তির দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে বেশি, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

মানুষ এখন অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল বেশি, ফলে বিষচর্চা, মৃত্যু চর্চার জটিলতা ক্রমশ অন্তর্হিত। সমাজে তার ছায়া। সিনেমা বায়োস্কোপে তার প্রয়োগ। হিংস্রতা কত প্রখর হতে পারে তা উদ্ভাবনেই ব্যস্ত যেন হত্যাকারী। আমার ভয় হয়, হিংস্রতা শিখর ছুঁয়ে গেলে হত্যাকারী তা নিজের উপরেই না প্রয়োগ করে বসে। কেননা হতভাগ্যের আর্তনাদ, হতভাগ্যের বেদনা কত তীব্র হতে পারে তা শ্রবণ, দর্শনের জন্যই তো হত্যাকারীর হিংস্রতা চর্চা। মৃত্যুচর্চা এখন হিংস্রতা চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হতভাগ্যের আর্তনাদ, কান্না যেন সংগীতের মতো হত্যাকারীর কানে বাজে। রহস্যভেদীর সামনে থেকে যাবতীয় রহস্য উধাও হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এই হিংস্রতা চর্চা নরহত্যা থেকে অন্যদিকেও সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। নরনারীর ভালোবাসার প্রকাশে এর ছায়া পড়ছে দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি। পুরুষ নারীর দিকে ধাবিত হচ্ছে হিংস্র ভালোবাসা নিয়ে। সমাজে এই ছায়া গোপনে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। নারীও যেন পুরুষের কাছে হত হওয়ার জন্যই নিজেকে নিবেদনে আগ্রহী। নারীর শরীর খণ্ড খণ্ড করে ভক্ষণ করায় যেন পুরুষের আগ্রহ। মৃত্যুচর্চার গোপনীয়তা অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার কারণেই কি ভালোবাসার গোপনীয়তা, নারী, সৌন্দর্যের গোপনীয়তাও বিলীয়মান? আশ্চর্য! পণ্যের গুণাগুণ প্রচারেও হিংস্রতাই মূল মাধ্যম। কখনও তা প্রত্যক্ষে, কখনও তা পরোক্ষে। সাবান থেকে ওয়াশিং মেশিন, জীবনদায়ী টনিক থেকে শীতল পানীয় — সর্বত্রই এই প্রবণতা।

অনিলবরণ লিখতে লিখতে ওঠে, জল খায়। লিখতে লিখতে সে বিভ্রান্ত বোধ করে। সে যা লিখছে তা তার বিপক্ষে যাচ্ছে, কেননা মৃত্যু চর্চাই যদি পৃথিবীতে না থাকে, তাহলে সে লিখবে কী? তার রহস্যভেদী কোন রহস্য উদঘাটন করবে? তার উপন্যাসের হত্যাকারীই-বা কে? হত মানুষটিই-বা কে? সে ধরতে পারছে তার উপন্যাসের আসল জটটি কোথায়? হতভাগ্য নারী হলে, সে তো নিজেই হত হওয়ার জন্য হত্যাকারীকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন। আর হত্যাকারী তো হত্যার কথা হিংস্র কণ্ঠে দশদিককে জানিয়ে দিচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি সাজাচ্ছে, যেমন সাজায় পুলিশ, যুদ্ধবাজ দেশ, যেমন সাজিয়েছিল হিটলারের নাৎসি পার্টি, যেমন সাজিয়েছিল অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমার প্রয়োগকর্তা, ধনী রাষ্ট্রের প্রধান। এখন তাহলে রহস্যভেদীর কাজ রহস্য উদঘাটন নয়, হত্যাকারীর সঙ্গে যুক্তির লড়াই-এ বসা। অনিলবরণ কলম থামিয়ে নিঝুম হয়ে বসে থাকল।

রহস্যভেদী হত্যার বিপক্ষে হত্যাকারীর সঙ্গে আলোচনায় বসবে। তর্কে। রহস্যভেদী কি অতিমানব হিটলারের মুখোমুখি বসবে, গ্যোয়েরিং, গোয়েবলস হিটলারের বিপক্ষে বসবে। সে কি রাষ্ট্রনায়কদের মুখোমুখি, সেনাবাহিনী, পুলিশের মুখোমুখি বসে হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে বলবে? কী বলবে? অনিলবরণের মনে হয় রহস্যভেদীর চেয়ে হত্যাকারীর হাতে যুক্তি অনেক বেশি — তা তো সে এতকাল শুনছে। কলম থামিয়ে মাথা নামিয়ে বসে আছে অনিলবরণ। রহস্যহীন হত্যাকাণ্ডের জালে পড়েছে সে। হিংস্রকণ্ঠে হত্যাকারী তাকে যুক্তির জালে ফেলেছে। অথচ সে নিজেই তো হত্যাকাণ্ডের পক্ষে থাকতে চায়, অন্তত তার উপন্যাসের

অপরাধী তো থাকতেই চায়। অপরাধীকে সেইভাবেই তো সে নির্মাণ করতে চায়। অনিলবরণ আবার বিশেষ কথা ভাবতে চেষ্টা করল। আরম্ভ করতে চাইল প্রথম থেকে।

চোদ্দ

কলম নিয়ে চুপচাপ অনিলবরণের কলমটি ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় নিজের লেখাটি আগাগোড়া পাঠ করে। সে তো তার নিজের কথার বাইরে চলে গেছে। একটি খুনের কথাই তো ভাবতে হবে তাকে। গণহত্যা, রাষ্ট্রীয় হত্যা, হিংস্রতার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না তার রহস্যভেদী। তার অপরাধীও অতদূর পৌঁছতে পারবে না।

অনিলবরণ প্রথম থেকে আরম্ভ করে — একটি খুন হবে। তার রহস্যও ভেদ করা হবে। খুন হবে কেননা মানুষের মনে হননের ইচ্ছা মাঝে মধ্যেই জেগে ওঠে। কত সামান্য কারণেই না মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার প্রতিবেশী, সহবাসীকে হত্যা করার কথা ভাবে। হত্যা না করুক, কত জনের মৃত্যুকামনা করছে গোপনে। একাকী মানুষ দুই কামনার ভেতরেই দিন অতিবাহিত করে। যৌনতা এবং মৃত্যু। বিবাহের পূর্বে আমার প্রেমিকা কঙ্কনা আমার কল্পনায় যে কতরকম ভাবে এসেছে। ভালোবাসা, যৌনতা, অথচ এখন! আচমকা আমার মনে হয়, আমার স্ত্রী কঙ্কনা যদি মরে যায় তো আমি বেঁচে যাই। যেদিন কঙ্কনা দুই মেয়ে নিয়ে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে ট্যাক্সিতে চেপে বাপের বাড়ি বালিগঞ্জ প্লেসের উদ্দেশ্যে রওনা হল, আমি ভাবছিলাম ফোন বাজবে। ফোনে খবর হবে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বাইপাসে, এক মহিলা মারা গেছেন, বাচ্চা দুটি আঁচড়বিহীন। বাচ্চা দুটি অক্ষত।

এইরকম একটি ঘটনার কথা কয়েকদিন আগেই পড়েছিল অনিলবরণ। হ্যাঁ, ফোন বাজল। ফোন বাজতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। নিশ্চয়ই সেই খবর এসেছে। ফোনের রিসিভার কানে ধরতে ওপার থেকে কঙ্কনার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বাড়ি পৌঁছেছে সে। বাড়ি পৌঁছনোর শব্দে কী নিশ্চিন্তই না হয়েছিল সে। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগে মৃত্যু ভাবনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

মাসখানেকের উপর হয়ে গেছে কঙ্কনা এই ফ্ল্যাটে নেই। অনিলবরণ একটু আগে ফোন করেছিল, ধরেছিল শ্বাশুড়ি। তুমি নিজে এসে নিয়ে যাও, হ্যাঁ, তুমি কি পাগল, দু-বারের পর তৃতীয়বার মা হয় কেউ? সিজার বেবি দুটোই, থার্ড টাইম সিজার করতে গেলে আমার মেয়ে বাঁচবে না, তুমি কি তাকে খুন করতে চাও?

চায়ই তো অনিলবরণ! তার তো মনেই হয় তা। সবসময় নয়, কোনো কোনো সময়। কঙ্কনারও যে তা মনে হয় না, একথা মনে করার কারণ নেই। মানুষ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কতজনকে মনে মনে হত্যা করছে।

সে তো সামান্য রহস্য ঔপন্যাসের লেখক। এ পৃথিবীর ইতিহাসই তো চরম হত্যাকাণ্ড নির্ভর। প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে গেলে তার মৃত্যু ঘটায় মানুষ মনে মনে।

অনিলবরণ এই অবধি লিখে থামল। ধীরে ধীরে ফোনের দিকে ঝুঁকল। রিসিভার তুলে পটাপট ডায়াল করতে থাকে, আমি অনিলবরণ বলছি, ঘোষচৌধুরী, চ্যাটার্জি আছে?

ওপারে হাসি, রহস্য ঔপন্যাসিক? সুদামার মনের মেঘ কেটে গেছে, ওই লোকের যে অত বুদ্ধি হবে না তার ওর লেখা পড়লে ধরা যায়।

অনিলবরণ বিস্মিত হয়, সুদামা চ্যাটার্জি তার সঙ্গে যে এইভাবে কথা বলতে পারে, তা তার ভাবনার অতীত। মহিলা তো দাম্ভিক। তবে তার তো ভালোই লাগে। ওকে। ইদানীং লাগছে। কী চমৎকার একটি সূত্র দিয়েছে তাকে। ওই সূত্রটিকে নিয়ে খেলা করা দরকার মনে মনে। ওই সূত্র থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে সুদামা চ্যাটার্জিও গোপনে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা সাজায়। সাজাতে পারে।

সুদামা বলল, ও নেই, দেরি হবে ফিরতে, বেলগাছিয়া গেছে।

ফোন ধরে কয়েক দণ্ড নিশ্চুপ অনিলবরণ। তাহলে সে কার সঙ্গে কথা বলবে? সুদামা কি তার কথায় কথা যোগ করতে পারবে? এপার থেকে সুদামা জিজ্ঞেস করে, কী দরকার?

অনিলবরণ বলল, দরকার আছে, আচ্ছা ডেথ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

সুদামা হাসতে আরম্ভ করে, কোনো ধারণাই নেই। দেখেছি লোকে মরে যায়।

অনিলবরণের মাথার ভেতরে নতুন একটা সূত্র যেন জেগে উঠতে থাকে। সে বিড়বিড় করে, ডেথ সম্পর্কে জানা গেলে, মানুষের সব সমস্যা মিটে যায়।

সুদামা আবার হাসে, কোনে সমস্যাই মেটে না, আপনি কী জানেন ডেথ নিয়ে?

অনিলবরণ বলে, মৃত্যুটা খুব জরুরি মনে হয় আপনার?

সুদামা বলে, জানি না, এ সব কথার কোনো অর্থ হয় না। আপনার কি কোনো কাজ নেই, মৃত্যু হত্যা এসব নিয়ে ভাবেন সর্বক্ষণ।

অনিলবরণ বলে, মৃত্যু না থাকলে এসব নিয়ে ভাবতেই হত না। আপনি কি বাড়ি আছেন এখন, বেরোচ্ছেন না তো?

সুদামা কপট ভয়ে বলে ওঠে, ও বাবা আপনি এসে আমাকে মৃত্যু বোঝাবেন নাকি, মৃত্যুর কথা ভাবতেই পারি না আমি।

অনিলবরণ বলে, আমি একটু বাদে আপনাকে আবার ফোন করছি, একটা পয়েন্ট মনে পড়ছে, দেখুন মার্ডার এবং মার্ডারারের চরিত্রই বদলে গেছে এখন, যেভাবে বদলে যাচ্ছে প্রেম এবং প্রেমিকের। আমার মনে হয় প্রেম এবং মৃত্যু, একে অপরের উপর নির্ভরশীল, প্রেম নিঃশেষ হলে মৃত্যু অশেষ হয়ে এগোতে পারে, আবার মৃত্যু দুর্বল হলে ভালোবাসা গভীর হয়। — রাখছি, একটু বাদে আমি আপনাকে আবার ধরছি সুদামা, আমাকে এখন হত্যাকারীর সঙ্গে বসতে হবে, মুখোমুখি বসতে হবে, এখন হত্যাকারীই নিজেকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী বলে ঘোষণা করে হত্যার সপক্ষে যুক্তি সাজাচ্ছে —

আশ্চর্য লাগে সুদামার, তার কৌতূহল বাড়ে, সে জিজ্ঞেস করে, কীরকম?

এই ধরুন না, নানান দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা খুন হয়ে যাচ্ছে, তার দায় নিয়ে হত্যাকারীরা ঘোষণা করছে দেশের জন্য, ঈশ্বরের জন্য এই হত্যাকাণ্ড, এই দেখুন না ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ঘুমন্ত শহরের মানুষকে শেষ করে দিচ্ছে শক্তিমান রাষ্ট্র। টেলিভিশনে সেই ধ্বংস লীলার লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে, লোকে দেখছে, শুনছে আক্রমণের পক্ষে কী চমৎকার যুক্তি সাজাচ্ছে হত্যাকারী — তার সঙ্গে আমাকে বসতে হবে, এখন রহস্য উপন্যাস বলুন, হত্যাকাণ্ডের কিনারায় উদ্যোগী রহস্যভেদীর কাহিনি বলুন, তার প্রকৃতিই বদলে যাচ্ছে তা লক্ষ করেছেন? রাখছি।

টেলিফোন রেখে দেয় অনিলবরণ। আবার কলম নিয়ে বসে কাগজের সামনে। মাথা নীচু করে নিঝুম হয়ে বসে থাকে। মৃত্যু! ধ্বংস! হত্যা! প্রেম! ধীরে ধীরে মাথা তোলে অনিলবরণ।

অনিলবরণ লেখে, মৃত্যুর রূপটি কেমন? আমাদের পুরাণে লিখছে মৃত্যু হলেন নারী — পিঙ্গল বর্ণা, রক্তনয়না, রক্তাননা স্বর্ণকুণ্ডল ধারিণী। ব্রহ্মা তাঁকে প্রাণী সংহারের কারণে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে জন্ম দিয়েছিলেন। মৃত্যু হলেন ব্রহ্মার ক্রোধাগ্নিজাত। কী আশ্চর্য! মৃত্যুর সৃষ্টি হয় ভয়ার্ত পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য। এখন পৃথিবীকে ভয়ার্ত করে তোলার জন্যই মৃত্যুকে ব্যবহার করা হয়। পুরাণকথিত এই নারী ব্রহ্মার কথামতো সংহার কর্ম করতে ভীত হয়েছিলেন। তিনি নারী, নারীর হৃদয় কোমল, তিনি কী করে এই ভয়ংকর কাজ করবেন। সুস্থ প্রাণীকে বধ করবেন কী করে? শেষ অবধি তো মৃত্যু রাজি হন ব্যাধির সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে। যম ও ব্যধি সংহার কর্মের সূত্র হিসেবে থেকে গেলেন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, দ্রোহ, মোহ, অলজ্জা ইত্যাদি দোষে দেহ বিদ্ধ হলে মৃত্যু সংহার কর্মে প্রবৃত্ত হবেন বলে ব্রহ্মাকে বললেন।

পুরাণ কথিত সেই মৃত্যুদেবীরই মৃত্যু ঘটেছে বোধহয় আধুনিক পৃথিবীতে। অথবা মৃত্যুকে সংহার কর্মে কোনো ক্রমে রাজি করিয়ে স্রষ্টা ব্রহ্মা এ জগতে এক চরম আঁধারের সূচনা করে দিয়েছিলেন। জন্মের পর সৃষ্টি কর্তার কাছে সংহারকর্মের কথা শুনে, কোমলপ্রাণ সেই নারী বেদনায় যে অশ্রুপাত করেছিল, সেই অশ্রুবিন্দুই হল ব্যাধি। আজ পৃথিবীময় ব্যাধির প্রতাপ। মানুষ কখনও স্ব-ইচ্ছায় গোপনে, কখনও অজান্তে ব্যাধির জন্ম দিয়ে চলেছে নিরন্তর। ভীষণ সব অসুখ মানব সভ্যতার শত্রু হয়ে জন্মাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি

মুহূর্তে। সভ্যতা উজাড় হয়ে যেতে পারে আগামী এক শতাব্দী ভেতরে। এইভাবে তো হয়েছেও। চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে চীন দেশে যে মৃত্যুর সূচনা হয় প্লেগ — ব্ল্যাক ডেথ দিয়ে, উটের ব্যবসায়ীদের হাত ধরে মরুভূমি গিরিপথ ধরে সেই অসুখ তুরস্কে যায়। তুরস্ক থেকে একপথে যায় অস্ট্রিয়ায়, একপথে বাগদাদ থেকে মিশর, সার্দিনিয়া হয়ে সাইপ্রাস, ইতালির ভেনিস শহরে। তেরো বছরের মধ্যে চীন থেকে এই মহামারী চলে এল সিসিলি, স্পেন, ফ্রান্সে, ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে, ইংল্যান্ড থেকে জার্মানি, জার্মানি থেকে রাশিয়ায়। চতুর্দশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে, ১৩৪৭ থেকে ১৩৫০, এই তিন বছরে ভয়াবহ ব্ল্যাক ডেথ শেষ করে দিয়েছিল ইউরোপকে। প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষকে খেয়ে ফেলে এই দৈত্য। ইংল্যান্ডে মৃতের কবর দেওয়ার মতো জায়গাই অকুলান হয়ে পড়েছিল, মৃতদেহ তখন টেমস নদীতে ফেলে দেওয়া হতে থাকে। কী ভয়ংকর ছিল সেই মৃত্যুর উল্লাস। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণে ইওরোপের সামাজিক গঠনই বদলে যায় সেই সময়। অসংখ্যা প্রভুর মৃত্যুতে দাসরা হয়ে যায় মুক্ত, জমি হয়ে যায় মালিকানাবিহীন। শ্রমিকের অভাবে কারখানা অচল, ফলে শ্রমের মজুরি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে যায়। চার্চের প্রভু, যাজকদের মৃত্যুর জন্য খ্রিস্টধর্মের ভিতই প্রায় আলগা হয়ে যায়। সর্বশক্তিমান চার্চের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে।

অনিলবরণ লেখে, এত মৃত্যুর পক্ষে প্রকৃতির কি কোনো যুক্তি থাকে? থাকে না, ছিল না। কিন্তু ছিল হিরোসিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা প্রয়োগের পক্ষে। মানুষ এখন নিজেই মৃত্যুদেবীর ভূমিকা নিয়েছে। বিজ্ঞান ব্যাধিকে যত নির্মূল করার পথে এগিয়েছে, মানুষ তত ব্যাধির জন্ম দিয়ে অন্য পথে সংহারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমার আশ্চর্য লাগে, বিজ্ঞান যত মানুষকে ব্যাধি থেকে রক্ষা করেছে, মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে, তার চেয়ে বেশি মানুষকে বোধহয় যাতনা দিয়ে মেরেছে। এসবের পক্ষে হত্যাকারীর কী যুক্তি থাকতে পারে? প্রকৃতি যখন ব্যাধি দিয়ে সংহার কর্মে প্রবৃত্ত হয়, প্রভু, দাস বিচার করে না, আধুনিক পৃথিবীতে হত্যাকারী কিন্তু বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে মৃত্যু দেবতা অনেক হিসেবি। মৃত্যুকে অন্য চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করছে মানুষ অবিরত। ফলে মৃত্যু তার মহিমা হারিয়ে ফেলেছে, হত্যাকাণ্ডের নিবিড় কল্পনা উধাও হয়ে গেছে, এর জন্য বিষকে ফিরিয়ে এনে পুরাকালের মৃত্যুচর্চায় মগ্ন হতে হবে হত্যাকারীকে।

অনিলবরণ উঠে পড়ে, ডায়াল করে, হ্যাঁ আমি অনিলবরণ বলছি।

আবার! কী হল আপনার মার্ডারের? ওপাশে সুদামা আসছে অনিলবরণের ডাক পেয়ে।

আচ্ছা আমার একটা ব্যাপার মনে পড়ছে, মৃত্যু, হত্যার অন্য চেহারা দিচ্ছে এখন হত্যাকারী। আমার মার্ডারার, যেন বলতে চায় যে এ মৃত্যু আসলে মৃত্যুই নয়, এটা একটা দায়িত্ব পালন করা হল মাত্র ...

বুঝতে পারছি না। সুদামা বলে।

আচ্ছা আপনার কখনও কাউকে খুন করতে ইচ্ছে হয়, হয়েছে?

সুদামা হাসতে আরম্ভ করে, হয়নি আবার, কত হয়েছে।

অনিলবরণ বলে, কী রকম হয় বলতে পারেন?

সুদামা আবার হাসছে, মনে হয় বিষ দিয়ে — ইঁদুর মেরেছেন বিষ দিয়ে?

অনিলবরণ চমকায়। আশ্চর্য! তার কথার প্রতিধ্বনিই যেন শুনতে পাচ্ছে সে। ওপার থেকে সুদামা জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ এইসব জিজ্ঞাসার মানে?

অনিলবরণ বলে, আমি একটা বিষয়ে লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, আমার মনে হয় মৃত্যু ছিল প্রাকৃতিক একটি ঘটনা, তা এখন হয়ে গেছে মানুষের হাতে বন্দী কোনো অভুক্ত পশু, এক সময় একটি দুটি মৃত্যু ঘটিয়ে মানুষ অদ্ভুত সব কল্পনার পরিচয় দিয়েছিল। বিষ ছিল সেই কল্পনা প্রয়োগের উপাদান। মার্ডার হয়ে উঠেছিল বিস্ময়কর ঘটনা। এখন তা হয়ে উঠেছে ভয়ংকর। হত্যাকারী ঘুরছে, রহস্যভেদী লুকিয়ে পড়ছে, বিজ্ঞান যত মানুষকে সুখ দিয়েছে ...

সুদামা বলল, আপনি এইসব ভাবেন? সবসময় খুনের পরিকল্পনা করেন, ভাবেন?

হ্যাঁ ভাবি, আমার মনে হয় এক হত্যাকাণ্ড একসময় শিল্প হয়ে ওঠে, বিশ্বাস করেন?

কী জানি, আমার তো ভাবতেই ভয় করে।

ভয় তো আমারও করে, কিন্তু ভয়ই তো আনন্দের বিপরীত অভিব্যক্তি, আমরা জানিও না যে গোপনে কেউ কেউ আমাদের হত্যা করার জন্য ভাবে।

ওপারে সুদামা চুপ। অনিলবরণ ডাকে, হ্যালো, এটাকে সিরিয়াসলি নিতেও পারেন, না নিতেও পারেন। কত লোক আশি-নব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচে, তাদের খুনিরা তাদের আগেই মরে যায়, এই রকমই হয় বেশিরভাগ। ধরুন আমাকেও অনেকে খুন করার কথা ভেবেছে, মৃত্যু-কামনা করেছে আমার, পেরে ওঠেনি। তাই বলে আমার পিছনে যে একজন দুজন খুনি নেই, একথা আমি বিশ্বাস করি কী করে?

সুদামা বলল, থামুন দেখি, আপনার বউ কোথায়? কঙ্কনা?

বালিগঞ্জ প্লেসে, ছেড়ে চলে গেছে, এখনও ফেরেনি।

বাচ্চারা?

মায়ের সঙ্গে গেছে।

কেন গেছে তা জানেন?

অনিলবরণ বলল, জানি। জানি এটাও, আমার বউ মনে মনে আমার মৃত্যু-কামনা করে, আমাকে খুন করতে চায়।

আপনি কি পাগল! সুদামা চিৎকার করে ওঠে।

তা কেন, পাগল হব কেন। বলছি আমাদের মনের ভেতরে কতরকম খেলা, আমিও আচমকা ভেবে বসি কঙ্কনা মরে যাক, আমি তাকে খুন করি, হয়ে ওঠে না, পারি না।

কিন্তু কেন, ও কী করল?

কিছুই না, আমার মনে হয় শুধু।

এইরকম মনে হতে হতে যদি কোনোদিন সত্যি ঘটে যায় তা। সুদামা চিৎকার করে, আপনি প্রেমের উপন্যাস লিখুন।

আমি তো মৃত্যুর চর্চা করি, আপনি ব্ল্যাক ডেথের কথা শুনেছেন, ফোরটিনথ সেঞ্চুরিতে —

সুদামা বলে, শুনতে চাই না, আচ্ছা আপনি এত খারাপ কথা ভাবেন কেন সবসময়?

সবাই ভাবে।

না, ভাবে না।

হ্যাঁ ভাবে, হাসে অনিলবরণ, আপনিও ভাবেন, শুনুন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, অদ্ভুত একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে, ওই রকমভাবে খুনের কথা, বুঝতে পারছেন তো গ্যাসের কথা বলছি। আপনি কী করে ভাবলেন, তাই মনে হচ্ছে আপনিও বোধহয় খুনের কথা ভাবতে পারেন। মানে ভাবেন, পরিকল্পনা করেন।

সুদামা কী বলবে বুঝতে পারে না, লোকটা কি চতুর, হিংস্র, না পাগল! সে চুপ করে থাকে। অনিলবরণ ডাকে, শুনেছেন, আপনি যা বলেছেন, তা হল একেবারে আধুনিক পরিকল্পনা। কিন্তু আমার হয়েছে মুশকিল, একটা করিডোর দেখি অফিসে, লম্বা, এপার থেকে ওপার প্রায় দেখা যায় না, মনে হয় ওখানেও একটা খুন হতে পারে, আবার ভাবছি বিষের কথা। মধ্যযুগে কী চমৎকার বিষ তৈরি হত। নানারকম বিষয় মিশে যাচ্ছে, আলাদা করে উঠতে পারছি না। একটা কোনো বিষয়ে স্টিক করে থাকতে পারি না। বিষ থেকে ব্ল্যাক ডেথ, অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমা, লকআপে হত্যাকাণ্ড, নানান দিকে মন ঘুরে যায়, গোলমাল হয়ে যায় সব।

সুদামা বলল, যে কোনো মানুষ দেখলে খুন করতে ইচ্ছে হয় আপনার?

অনিলবরণ বলে, ওইটাতে হয়েছে মুশকিল। ভিকটিম খুঁজে বের করাও একটা প্রব্লেম। ধরুন, খুনের তো একটা কারণ থাকবে। সেই কারণটা আবিষ্কার করাও সহজ নয়। আমার মাথায় ভিকটিমের আদল আছে ছায়া ছায়া, কিন্তু তার মুখখানিকে ট্রেস করতে পারছি না। তবে করে ফেলব ঠিক, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, মুখের সঙ্গে মুখ মিশে যায়। আচ্ছা আপনার এমন মনে হয়?

সুদামা বলল, আপনি তো ভেবেই বসে আছেন আমি বসে বসে মানুষ খুন করার কথা ভাবি — রাবিশ! আপনি ভালো গান শুনুন, সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আসুন। হাওয়া খান ভালো করে।

তখন অনিলবরণ বলে, সি-বিচটাকে আমার মনে হয় খুনের পক্ষে উত্তম জায়গা ঠিক দুপুর বেলা, বালি পুড়ছে, নোনা বাতাস, লোকজন বিশেষ নেই, একটা লাশ ভেসে এল জলে, হাঙরে মাছে খাওয়া ... কী দারুণ দৃশ্য রচনা হবে বলুন!

সুদামা ঝপ করে টেলিফোন রেখে দেয়। অনিলবরণ তখনও বিড়বিড় করছে, পোড়া আকাশ, পোড়া বালি, ভাটায় জল সরে গেছে অনেক দূর, ভেসে এল একটি তরুণী যুবতির লাশ, আবিষ্কার করল এক জেলে, মস্ত কালো শরীর। চারদিকে শুধু লবণ লবণ ভাব ...। অনিলবরণ টের পায় ওপাশে কোনো শব্দ নেই।

ফোন রেখে আবার তোলে অনিলবরণ। পটাপট ডায়াল করতে থাকে। সুদামা পুরোটা শুনুক। এভাবে ফোন রেখে দিল কেন? ওপারে রিং হচ্ছে। হ্যাঁ তুলল কেউ ...। আমি অনিলবরণ।

হঠাৎ মনে পড়ল, দ্যাখো বাবলির কদিন ধরে জ্বর, বাবা বাবা করছে। রহস্য ঔপন্যাসিক তুমি কি তোমার মেয়েকে দেখে যাবে?

অবাক হয় অনিলবরণ, সে না ডায়াল করল সুদামাকে। ফোন গিয়ে বাজল বালিগঞ্জ প্লেসে। এ তো কঙ্কনার গলা। আশ্চর্য! এ কী করে হয়? অনিলবরণের মাথায় একটি সূত্র খেলা করতে থাকে। চাঁদের গায়ে ...। বাবলির জ্বর। কিন্তু তুমি কী করে ফোনটা ধরলে কঙ্কনা, আমি তো অন্য নম্বর ডায়াল করেছিলাম।

ওপারে হাসি, অনেক পাগলামি হয়েছে, যা বললাম তা শুনলে তো।

পনেরো

দুপুরে ঘুম না এলেও ঘুমোতে হয়। এই দীর্ঘ প্রসারিত গ্রীষ্ম দুপুর সে কাটায় কী করে? দুপুরে ঘড়ির কাঁটাও যেন সরে না। সরলেই-বা কী, সুদামার হাতে অফুরন্ত সময়, সেই সময় যে ফুরোয়ই না। তাই ঘুমে ডুবতে হয়। ঘুমের ভিতরে পার করে দিতে হয় দুপুরের কিছুটা অংশ। মাধুরী, অনিন্দিতা, দুই ফ্ল্যাটের দুই বউ এসে

ফিরে গেছে অনেকবার, এখন তারা আর আসে না। নিজেরাই টিভি চালিয়ে গল্প করে, তারপর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, বাস থেকে বাচ্চা নামলে, সেই বাচ্চাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সুদামার এইসব নেই। নেই বলে বেঁচে গেছে সে। বলে অনিন্দিতা-মাধুরী। কী সুখেই আছে সুদামা। ছেলেকে পড়াতে হয় না, তার খাতা দেখতে হয় না, রেজাল্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয় না। আগে ছেলেকে বড়ো চিঠি লিখত। চিঠিতে আলো বাতাসের বর্ণনা থাকত। ঋতুচক্রের ছায়া থাকত। রোদ হলে রোদ, ছায়া হলে ছায়া, মেঘ, বৃষ্টি, আলো, শীত-বসন্ত — এখন, এই সময়ে তো তাও লিখতে হয় না। কী সামান্য কথাই না লিখেছে সে। কৃষ্ণেন্দু চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছে। সুদামা আন্দাজে আন্দাজে পনেরো লাইন — কত কাজই না কমে গেছে। ছেলেকে বড়ো চিঠিও লিখতে হচ্ছে না। তার জ্বর হলেও জানতে পারে না। কী আরাম! সে দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলেও ঘুম ভেঙে মাকে উঠতে হয় না।

কী আরামেই না আছে সুদামা, বলে তার কলেজের বান্ধবী বিনতা। কোনো ঝামেলাই নেই, স্বামী অত বড়ো চাকরি করে। শীতের সময় কয়েকদিন তার বাড়ি একা একা চলে গিয়েছিল সুদামা দুপুরবেলা। বিনতার অনেক ঝামেলা, বেকার দেওর, বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি। ছেলে ক্লাস সিক্স। তাকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা। ছেলেটা প্রায়ই ভোগে। ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয় মাঝেমধ্যে। সেই ছেলে আবার দুরন্তও খুব। এত সবের ভেতরেই রান্নাবান্না, ঘরের কাজ। সময়ই পায় না। দুপুর সকাল বলে তার আর কিছু নেই। বিয়ের পর চাকরির চেষ্টা করেছিল। পায়নি। স্বামীর সামান্য মাইনের চাকরি, ফলে বিনতাকে সবদিক সামাল দিতে হয়। টিউশানিও করে এর মধ্যে। না কাজের লোক নেই। কী করে পারে বিনতা? বিনতা বলে হয়ে যায়। কোথা থেকে কী হয়ে যায় তা সে খেয়ালও করতে পারে না। সুদামার সুখ কি সে পাবে? দুপুরে ঘুমোনোর উপায়ও নেই তার। হ্যাঁ, তবে ফাঁক বের করে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নেয়।

সুদামা, তোর স্বামী, মানে তোর বর, মানে তোর প্রেমিক, তোকে কী ভালোই না বাসে। কী দেয়নি বল দেখি? বলে সুদামার বন্ধু অর্চনা। সে একটা প্রাইভেট ফার্মের কেরানি। নড়তেই পারে না। তার কাছে গিয়ে যে গল্প করবে সুদামা, সে উপায়ও কি আছে।

উপায় একমাত্র ঘুমের কাছে সমর্পিত হওয়া। ঘুমের ভেতরেই সে শুনতে পাচ্ছিল টেলিফোন বাজছে। এখন এই রোদে বিনতা হয়তো বেরিয়েছে বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে। মাধুরী-অনিন্দিতা আড়ামোড়া ভাঙছে গলির মুখে দাঁড়িয়ে। স্কুলবাস এসে নামিয়ে দেবে তাদের বাচ্চাদের। অর্চনা সেই মাড়োয়ারি ফার্মে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। অর্চনা বলেছিল, মাইনে খুব একটা ভালো দেয় না, খাটিয়ে নেয়। কাজে ভুল হলে এমনভাব করে যেন সে তার বাড়ির বাসন মাজার ঝি।

সুদামা অলস হাতে টেলিফোনটা তুলল, কার ফোন? বলছি।

দিন দশেক না, না প্রায় পক্ষকাল পেরিয়ে ফোন এল দূর রাজারামপুর থেকে। আজ ভোরে ওদিকে প্রোজেক্ট সাইট ভিজিটে গেছে এল পি জি সংস্থার কর্তাব্যক্তির সঙ্গে সরকারি কর্তারা, কৃষ্ণেন্দু গেছে, সুহাস গেছে। সে তো ভোরের ব্যাপার, এখন তো তিনটে।

ওপার থেকে কথা উড়ে এল, সুহাস বলছি, আপনি কি ঘুমিয়ে আছেন?

মনে হচ্ছে তো তাই।

ম্যাডাম, আমি রাজারামপুর থেকে বলছি।

মেঘের খবর পেলেন? ঘুমের ভেতরে যেন কথা বলে সুদামা।

পেয়েছি।

কে দিল?

পাখিরা, সমুদ্র থেকে আসছিল একদল পাখি...

সুদামা নিঝুম হতে থাকে। কী আশ্চর্য! সে কার সঙ্গে কী কথা বলছে? এইসব কথার অর্থ কী? এইসব কথা কেন বলা? কী এমন জরুরি! আটত্রিশ পার হওয়া কোনো মহিলার সঙ্গে তিরিশ-একত্রিশের এভাবে কথা হয়? রেখে দেবে নাকি টেলিফোন?

ওপার থেকে সুহাস বলল, কী হল?

সুদামা বলল, সমুদ্রের পাখির সঙ্গে দেখা হল কোথায়?

সুহাস বলল, টেলিফোনে। একজন আকাশে, অন্যজন ...। থেকে গেল সুহাস।

সুদামার মনে হল পা যেন একটু টলল। আর একজন কোথায় ছিল? সুদামার গলায় বাতাস জড়িয়ে যায়। সে যে জিজ্ঞেস করবে আর একজন ছিল কোথায়, তা ভুলেই গেল। কথা বলতে পারে না। তার সমস্ত শরীর ভারি হয়ে উঠছে। চোখ বুজে গেল তার। ওপারও নিঝুম। ওপারের নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। যেন সৌর ঝড়। মহাব্রহ্মাণ্ড তোলপাড়। অচেনা কোনো গ্যালাক্সির ভেতরে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে নক্ষত্র দল।

বলুক সে কথা, সুদামা শুনে যাবে।

কী হল, হ্যালো ম্যাডাম?

ম্যাডামের কণ্ঠস্বর এবার বাজল, আমার নাম নেই নাকি!

আছে, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঘুমিয়ে পড়ছি।

হা হা করে হাসছে ওপারে কোনো এক ভিন গ্রহের মানুষ হয়তো-বা। আবার ভিন গ্রহের মানুষ! কোথায় কৃষ্ণেন্দু? কৃষ্ণেন্দু মনে আছে, সেই কতকাল আগে এক ভিন গ্রহের মানুষ ধরা দিয়েছিল সামনে। কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল আমার। কথা ফুরোনো মানে অনেক অনেক কথা বলা। নৈঃশব্দ্য কথা বলে বেশি। বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দুজন। সারা শহর থেমেছিল তখন। এখন যেন মহাবিশ্ব থেমে আছে, মহাবিশ্ব পার হয়ে আরও অসীমে কোথায় ঝড় উঠছে। আমি কে? আমি কী করে টের পাচ্ছি সেই ঝড়ের শব্দ? বিপ বিপ বিপ — কে যেন কিছু বলতে চাইছে আকাশের ওপার থেকে।

ঘেমে যাচ্ছে সুদামা। হাত ঘেমে যাচ্ছে তার। কে যেন শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে তার করপুট। কী তপ্ত হাত! টেলিফোনের রিসিভার আরও জোরে চেপে ধরে সুদামা। ওপার থেকে আবার ডাক এল, সুদামা কী হল আপনার?

সুদামা বলল, কোথা থেকে ফোন করছেন?

আমরা রাজারামপুর ছাড়িয়ে বেরিয়েছি সবে, স্যার সামনের গাড়িতে প্রজেক্টের মহাজনদের নিয়ে, আমি গাড়ি থামিয়েছি একটা জায়গায়, হঠাৎ মনে হল ফোন করি, পাবলিক বুথ।

জায়গাটা কেমন?

চমৎকার, কাছেই একটা-দুটো গ্রাম আছে, মাইলটাক ভেতরে, যেখানে সবাই বাজি তৈরি করে।

বাজির গ্রাম?

হ্যাঁ, কতরকম বাজি, ফুলঝুরি, তুবড়ি, রংমশাল, চরকি, হাউই, ছেলে-বুড়ো সবাই বাজি তৈরি করে, সব আলোর বাজি।

কেন বোমা তৈরি করে না, দোদোমা, পটকা, চকলেট বোম?

না, এখানে যে হাউই তৈরি হয়, তা মাদ্রাজের আকাশেও উড়ে যায়, মহারাষ্ট্রের আকাশও আলো করে দেয়, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে পরপর উড়ে যায়।

তারপর?

তারপর অন্ধকারে আচমকা বিস্ফোরিত হয়ে একটা ছায়াপথ তৈরি করে দেয়, তাতে কত তারা, সব ভেসে থাকে অনেকটা সময় ধরে।

কী চমৎকার বলছ তুমি, তারপর কী হয়?

তারপর আবার একটা হাউই উঠে আছে উপরে, একটা ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা, গ্রামের সবচেয়ে বড়ো মহাজনের ছেলের বিয়ে, বাজিতে আকাশ আলো।

বাহ, বাহ! তারপর?

কথা চলতে থাকে। চলতেই থাকে। হাউই-এর বিবরণ থেকে ভুঁই চরকির কথা। ভুঁই চরকি থেকে ফুলঝুরি। ফুলঝুরিরই-বা কী সুন্দর বর্ণনা। ফুলঝুরি থেকে তুবড়ির আলোয় নাচতে থাকে ছেলেবুড়ো সবাই। সুদামা, বললে কি বিশ্বাস হবে, সেই আলোয় মানুষগুলোও যেন আলোর ফুলকি।

বাহ! কী সুন্দর বলছ তুমি!

আমি কী বলব, বাজির গ্রামে যেমন বাজি তৈরি হয় তেমন কথাই তো বলছি, বাজিই এত সুন্দর যে কথা বলতে হয় না, আপনা-আপনি হয়ে যায়, ওরা চিরকাল আলোর বাজিই তৈরি করত, এখন 'সাউন্ড' করতে আরম্ভ করেছে।

সাউন্ড।

সে ভীষণ শব্দ! শব্দে কানে তালা লেগে যায়, পাখিরা উড়ে যায় ভয় পেয়ে, বাতাস পালায়, মেঘও, বুড়ো মানুষ কেঁদে ফেলে। কী শব্দ! গুম গুম গুম — যেন মেঘে মেঘে লড়াই হচ্ছে, সাউন্ড কি আপনি পছন্দ করেন সুদামা?

সুদামা বলল, খুব দূরের শব্দ!

কত দূরের?

বহু দূরের।

বহুদূর, কতদূর?

সুদামা চাপা গলায় বলল, অনেক অনেক আকাশ পার হয়ে দূর কোনো গ্যালাক্সির বিপ বিপ — তুমি টের পাও তো?

ওপারে কণ্ঠস্বর থেমে আছে। সুদামা চোখ বুঝে ঘন শ্বাস নেয়। গাঢ় নিশ্বাসে ভেসে যায় টেলিফোনের কথা বলার মুখটি। টেলিফোন থেকে কানে যেন ভাপ এসে লাগে। গরম বাতাস। থরথর করে কাঁপে সুদামা। তার যে এ কী হল। কার সঙ্গে কথা বলছে সে? এ কি কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর!

মনে পড়ে যাচ্ছে বিয়ের পর পর, সেই আলোহীন বাতাসহীন ঘরে কৃষ্ণেন্দু ঘুমোলেও সে জেগে থাকত কত রাত। কান পাতত কৃষ্ণেন্দুর বুকের উপর। কী আশ্চর্য এক শব্দ! কতদূর থেকে উঠে আসছে তা।

কখনও মনে হত শব্দটি যেন আসছে পাতালের অতল থেকে। সে যেন মাটিতে কান পেতে আছে। আবার মনে হত সেই শব্দ যেন আসছে অনন্ত জাগরণে জেগে থাকা কোনো এক নক্ষত্রের ভেতর থেকে। তখন এক নারী তার পুরুষকে নিয়ে বহু রাত পর্যন্ত রচনা করত অখণ্ড এক নক্ষত্রের সমগ্রতা। এখন তো কৃষ্ণেন্দু নিজের জগৎ আলাদা করে নিয়েছে। এখন সেই নক্ষত্র থেকে তারা ছিটকে বেরিয়ে দুটো গ্রহপিণ্ডের মতো দুদিকে, মহাবিশ্বে ঘুরছে আর ঘুরছে।

ওপার থেকে আবার কথা এল, আপনি কি অনেক রাত পর্যন্ত জাগেন?

না, ঘুমিয়ে পড়ি।

আপনার ঘুম ভেঙে যায় আচমকা?

যায়।

এমনি এমনি!

না, মনে হয় যেন কেউ ডাকল?

কেউ কি ডাকে?

চুপচাপ হয়ে যায় সুদামা। ডাকে হয়তো কৃষ্ণেন্দু। দু-হাত দূরের কৃষ্ণেন্দু ডাক দেয় পনেরো-ষোলো বছর পিছন থেকে। নাকি অন্য কেউ! দু-হাত দূরে ঘুমিয়ে থাকা পুরুষ তো পনেরো-ষোলো বছর আগে ছিল না। এ তো অন্যজন। এ জীবনে বারবার, নানা সময়ে নানাজনের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হয় যেন। নানারকম মুখ, নানারকম চোখ, নানারকম মন ...

সুদামা জিজ্ঞেস করে, তোমার ঘুম ভাঙে?

ভাঙে।

এমনি এমনি?

জানি না।

কেউ কি ডাকে?

জানলার বাইরে অন্ধকার, অনেক দূরে আকাশ, পামট্রির সারের ফাঁকে চাঁদ, তারা। অন্ধকার দেখলেই মনে হয় ডাকে যেন — থাক, এখন, শুনুন, আজ আমাদের ভিজিট ছিল সাইটে, ঠিক আমাদের নয়, যে কোম্পানি মানে ওই যে এলপিজি বটলিং কোম্পানিকে জমি দিচ্ছি আমরা, তাদের টপ বস এসেছিল বোম্বে

থেকে। ওদের নানান প্রজেক্ট নামছে নানা জায়গায়। এখন ফাইনাল চেকিং সেরে নিচ্ছে, ফরেন কনসার্ন তো, অনেক ভেবেচিন্তে চয়েস করে। তো আজই একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছিল।

কী সমস্যা জিজ্ঞেস করছেন সুদামা, বলছি, খুব বড়ো সমস্যা তৈরি হওয়ার আগেই সবটা ট্যাকল করা গেছে। আজ নারীবাহিনী, রাজারামপুরের জমিহারা মানুষেরা একজোট হয়ে আমাদের পাঁচটা গাড়ি ঘিরে ধরেছিল। খুব তপ্ত জনতা। জানেন তো জনতা মানেই জনরোষ! রোদে মানুষের মাথার সব কলকব্জা বিগড়ে যাচ্ছে, পিটিয়ে মারছে, শুনতে পাচ্ছেন তো, কাগজে দেখছেন তো সুদামা, ঠিক সেই রকম সব, আগে মেয়েরা ঝাঁটা-খুনতি হাতে, কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে ...।

বলতে লাগল সুহাস। যা বলবে তাই-ই ভালো লাগবে এখন। সে যেন শিশুর কণ্ঠস্বর শুনছে। দেড় দু-বছরের বাচ্চা। সে যেন ...। সুদামার বুক কাঁপে। একত্রিশ বছরের পুরুষের কণ্ঠে শিশুর ভাব থাকে না। জোর করে ভাবলেও ভাবা যায় না শেষ পর্যন্ত। ও তো পুরুষই। প্রখর যুবক। টেলিফোন বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিল সুদামা। ভিজে গেছে হাত। শাড়িতে মুছতে লাগল সুদামা। হ্যাঁ, কী হল বল তারপর?

অর্থহীন আর কয়েকটা কথার মতো এটিও। এইভাবেই অর্থহীন আলাপকে অর্থময় করে তোলার সুখটি কতকাল বাদে ফিরে আসছে যে!

ষোলো

কৃষ্ণেন্দুর ফিরতে একটু দেরি হল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, দারুণ বুদ্ধিমান, আজ সুহাস না থাকলে যে কী হত! ফোন করেছিল সুহাস?

সুদামার মনে হল সে সতর্ক হয়। তার মন যেন তাই-ই চাইছে। বুক দুরুদুরু হতে আরম্ভ করেছে সেই প্রথম বয়সের মতো। সে কৃষ্ণেন্দুর কথায় জবাব দেয় না। কৃষ্ণেন্দু তার জবাবের অপেক্ষা না করে বলছে, সে সারাদিনে এই প্রথম বসতে পারল, বিশ্রাম পেল, দিনটা যে কী গেছে!

কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে, সুদামা শোনে। শোনে সামান্য, বাকিটা তার কানের পাশ দিয়ে উড়ে যায়। সে বিরক্ত হচ্ছিল। সে শুনল, কৃষ্ণেন্দু বলেছিল সুহাস যেন ফোন করে, তার একটু দেরি হবে।

দেরি তো হয়ই, রাজারামপুর গেছ, তাতে ফোনের কী আছে? সুদামা যেন মেজাজ হারাচ্ছে।

ফোন করেনি? কৃষ্ণেন্দু আশ্চর্য হয়।

করেছিল, আমি রেখে দিয়েছি। সুদামা সত্য বলল না, রাজারামপুরে কী হয়েছে তা শুনে আমি কী করব?

কৃষ্ণেন্দু খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। বোঝে, কোনো কারণে সুদামা অসন্তুষ্ট। সে আর কথা বাড়ায় না। জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানে যায়। স্নান করে কাচা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে নিজে হাতে চা করে আনে। সুদামা রাগলে

কৃষ্ণেন্দু নিজের কথা থামিয়ে এভাবেই রাগ ভাঙায়। বুদ্ধিমান পুরুষ। সুদামা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, ও ফোন করে কী বলত, ফোন করতে বলেছিলে কেন?

বাচ্চা ছেলে, ম্যাডাম ম্যাডাম করে তাই! কৃষ্ণেন্দু বোধহয় একটু তোতলায়, গ্রামের ছেলে তো, ওরা মাসি-পিসি-বউদিদের সঙ্গে মিশতে পারে ভালো। বউদি পাতাতে পারে ভালো। নিজেই তো বলল ফোন করবে, করেনি?

বললাম তো। সুদামা বিড়বিড় করে, আমার ভালো লাগছিল না, খুব ঘুম পাচ্ছিল দুপুরে, কী শুনব ভ্যাজোর ভ্যাজোর। তুমি নীলের চিঠিটা খুঁজে পেলে।

তুমি তো উত্তর দিয়েছ। বলল কৃষ্ণেন্দু।

কিন্তু চিঠিটা?

কৃষ্ণেন্দু শোনে না। বলে, সুহাস আজ মান রাখল, যে ভাবে সব ট্যাকল করেছে, আমাদের ছটা গাড়ি গিয়েছিল, এলপিজি-র লোকজন সমেত সকলকে ঘেরাও করে ফেলেছিল গাঁয়ের মানুষ। আগে নারীবাহিনী, কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে সব স্লোগান দিচ্ছে।

সুদামা চুপ করে থাকে। এসব কথা একটাও বলেনি সুহাস। কী দারুণ কাজই না করেছে সে। তার বিবরণ দিচ্ছে কৃষ্ণেন্দু, দিতে দিতে থামল। আশ্চর্য ও কিছু বলেনি! নিজের কথা বলতে বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল। শুনতে শুনতে সুদামার বুক থরথর করে। কাঁপে বোধহয় সে ভেতরে ভেতরে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, গাঁয়ের মানুষ খবরও রাখে বটে। তারা তো আচমকা ঘেরাও প্রোগ্রাম ঠিক করেছিল এল পি জি-র কর্তাদের আসার খবর পেয়ে। গত পরশু ঠিক হল, আজ যাওয়া হল ভিজিটে। পঞ্চায়েত কর্তারা কেউ ছিল না ধারে কাছে। তারা থাকলে তো সামাল দিতে পারত ক্ষুব্ধ জনতাকে। জনতা ঘিরে ধরে ক্ষতিপূরণ দাবি করল। খেতমজুরদের জন্য প্রজেক্টে কাজ দাবি করল। জমি হারানো পরিবার পিছু একটি করে চাকরি চাইল, পুনর্বাসনের নীতি জানতে চাইল যদিও এখানে পুনর্বাসনের কোনো সমস্যা নেই। কোনো ভিটে বাস্তু অধিগ্রহণ হয়নি। জমি তো শুধু জমির মালিককে অন্ন দেয় না। জমি মানে বহু মানুষের সম্পৃক্ততা। তিনশো বিঘে কত লোককে না কাজ দিত। সবাইকে খুশি করতে হবে। তখন সুহাসই সাহস করে এগোল। কৃষ্ণেন্দু বুঝে উঠতে পারেনি কীভাবে ট্যাকল করবে এত সকলকে। তার কাছে কাগজপত্রও রেডি ছিল না। ভিনদেশি মহাজনরা অবাক হয়ে তখন জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেছে, অ্যাফেকটেড পিপল-এর জন্য কী কী প্যাকেজ ভেবে রেখেছে গভর্নমেন্ট। কী ব্যবস্থা ভেবেছে কৃষ্ণেন্দু। তাদের তো জানতে চাওয়ার অধিকার আছে, কেননা কাজ আরম্ভ হলে, লোকাল পিপল ঝামেলা আরম্ভ করলে, সামাল দিতে হবে তো তাদের। তখন তো সরকার দেখবে না। তারা জমির টাকা দিচ্ছে গভর্নমেন্টের দাবি মতো, কিন্তু পরিবর্তে গভর্নমেন্ট

কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি-পরিবারের জন্য তাও তো জানতে হবে দেখতে হবে। কৃষ্ণেন্দু বোঝাতে আরম্ভ করেছিল। তখন সুহাস গাড়ি থেকে নেমে জনতার মুখোমুখি হয়।

কিন্তু ছেলের চিঠিটা তুমি হারালে কী করে? সুদামা প্রসঙ্গ বদলে দিতে চায়। তার বুকের ভেতরে মেঘ ডাকছে। ভয় করছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ঠিকমতো কৃষ্ণেন্দু তার কথা শুনতেই পায় না।

কৃষ্ণেন্দু বলে, সুহাস তো চাষির ছেলে, ওর মতো জমির চরিত্র কে জানবে? বাস্তব সমস্যা কে চিনবে? তাই সুহাসই জনতার মুখোমুখি হয়ে তাদের বোঝাতে লাগল। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ধরে বর্গাদার, খেতমজুর, মার্জিনাল পেজান্ট ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছে সুহাস জমিহারা মানুষদের সঙ্গে। ফলে তারা বুঝেছে সব। শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে ফিরে গেছে।

কৃষ্ণেন্দু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, ও বোধহয় ছাত্রজীবনে রাজনীতিও করত, ফলে বক্তব্য রাখতে পারে ভালো। রেখেছেও চমৎকার। এল পি জি প্রজেক্ট রূপায়িত হলে কী কী সুবিধে হবে স্থানীয় মানুষের তা জানিয়েছে নিজের কল্পনাকে ব্যবহার করে সত্য মিথ্যা বলে। নানারকম স্বপ্নের কথা বলেছে, উন্নয়নের কথা বলেছে, গ্রামের মানুষের জন্য কতটা ভাবা হয়েছে তা বাড়িয়ে বলেছে। গ্রামের মানুষ খুশি। এল. পি. জি. কর্তারাও খুশি। শেষ পর্যন্ত তারা বলেছে, হ্যাঁ বড়ো প্রজেক্টে এইরকম হয়ে থাকে, ব্যাপারটাকে ভালোভাবে সামাল দেওয়া দরকার। সুহাস বোস সম্পর্কে খোঁজও নিল। সুহাস তাদেরও বুঝিয়েছে, এই রকম ঘটনা দু-একটা হবে। কেননা যে চাষির জমি চলে যায় সে কি জমির মায়া সহজে ত্যাগ করতে পারে? জমি তো চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে। জমি চলে যাওয়া মানে তাদের নানান অভ্যাসও চলে যাওয়া। কালচারাল চেঞ্জ তো হবেই ...।

সুদামার মুখ আলো হয়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দুর কাছে সুহাসের প্রশংসা শুনতে শুনতে। সে উঠে গিয়ে টেলিফোনটা এক হাতে তুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে মোছে। তারপর সাবধানে রেখে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে একটু গাঢ় স্বরে কৃষ্ণেন্দুকে বলে, হয়েছে, এবার কদিন রেস্ট নাও দেখি। চলো, নীলের কাছে যাই।

মাথা নাড়ে কৃষ্ণেন্দু, সুদামার হাতটি নিয়ে খেলা করে। বলে, গেলে ওর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। আর আমার রেস্ট কী করে হবে? সেই পুজোর আগে তো নয়ই।

বাহরে, তোমার শরীর দেখেছ! সুদামা তার হাত ছাড়িয়ে নেয় কৃষ্ণেন্দুর মুঠি থেকে, ঠাণ্ডা হাত, স্নান করে এসেছে তাই হয়তো। শক্ত হাত। বয়স হলে পুরুষ মানুষের হাত এই রকম ভাবেই শিহরণহীন হয়ে ওঠে নাকি। সুদামা চমকে ওঠে। কী ভাবছে সে! আবার হাত বাড়িয়ে দেয় কৃষ্ণেন্দুর দিকে। কৃষ্ণেন্দুর হাত ছুঁয়ে বুকে হাত দেয় সে। বাঁদিকে। কোথায় হৃদয়ের শব্দ। বিপ বিপ বিপ! সুদামার যে কী হল, সে কৃষ্ণেন্দুর কাছে সরে আসে, কান রাখে ওর বুকে। কৃষ্ণেন্দুর হাত তার মাথার খোপা ভাঙে, ভাঙতে থাকে। চুলের

ভেতরে হাত ডোবায় কৃষ্ণেন্দু। সুদামা টের পায় ধক-ধক করছে কৃষ্ণেন্দুর হৃদপিণ্ড। কিন্তু সেই যে অতি পুরাতন শব্দ, যা তার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যেত গভীর রাতে, তা কই! আছে কি? সুদামা জোরে চেপে ধরে তার কান। তারপর আচমকা সরে যায়।

কী হল? কৃষ্ণেন্দুর মুখে কেমন বিপন্নতা, উদ্বেগ।

তুমি কি টেনশনে আছ? জিজ্ঞেস করে সুদামা।

না না, টেনশন কিসের, টেনশন যা হয়েছিল কেটে গেছে।

সুদামা উঠল। শ্লথ পায়ে অন্ধকার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায় একা একা। কৃষ্ণেন্দু রিমোট কন্ট্রোলে টিভি অন করে। টেলিভিশনের নারী নাচতে নাচতে পণ্য বিজ্ঞাপিত করতে থাকে। টেলিভিশনের নারী নিজেকে দেখায় পণ্যের গুণাগুণ দেখাতে গিয়ে। কৃষ্ণেন্দুর চোখ টেলিভিশনে।

সুদামা অন্ধকার আকাশে তাকায়। হালকা মেঘ এসেছে কলকাতার আকাশে। সেই মেঘ ময়লা করে দিয়েছে ঝকঝকে আকাশকে। গ্রহ তারা ঢেকে গেছে ধূসরতায়। সুদামা ঘাড় উঁচু করে আকাশ দ্যাখে। কিছুই দেখা যায় না, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। অন্ধকার ভূমিতল থেকে উঠে গেছে অসীমে। একটি তারাও নেই আকাশে। কোথায় সেই গ্যালাক্সি, যার কোনো এক জীবিত নক্ষত্র তার সঙ্গে রতে কথা বলত। ধ্বনিময় হয়ে উঠত রাতের নৈঃশব্দ। শুধু কি কৃষ্ণেন্দুর বুকের শব্দ! যখন নীল এল পেটে, মনে পড়ে যায় সুদামার। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত ভরন্ত শরীরের। বিপ বিপ বিপ —অদ্ভূত এক শব্দতরঙ্গ। তা কি নীলের বুকের শব্দ, নাকি সেই ভ্রূণ গ্রহণ করছিল গ্রহান্তরের ধ্বনিময়তা। মানুষের হৃদয়ের শব্দ কি গ্রহান্তর থেকে আহরণ করা! প্রেমের ধ্বনিময়তাও কি তাই! এই তখন যে শব্দ শুনে এল সুদামা, তার ভিতরে আছে উদ্বেগ, চিন্তা প্রেমহীনতা, হ্যাঁ যেন তাইই। সে ঘুমন্ত কৃষ্ণেন্দুর বুকে কান রাখলেও, তার প্রিয় পুরুষ সেই ঘুমের ভিতরেও টের পেত তা। ভালোবাসা আবেগে বুকের শব্দ বদলে যেত ধীরে ধীরে। বুকের শব্দের সঙ্গে অসীম গ্রহান্তরের ধ্বনিময়তা একাকার। অচেনা এক সংকেতে শিহরিত হত সুদামা। সন্তানের প্রাণের শব্দ আর প্রেমের শব্দ কি এক? কোথায় গেল সেই নক্ষত্র, সেই ছায়াপথ? সব তারা কি নিভে গেল এই কবছরেই। অথচ গ্রহ তারার আয়ু তো কোটি কোটি বছর। পরিমাপহীন সময়। ভালোবাসার আয়ুও তো তাই! মনে হত তো তাই। ভালোবাসার এক একটি মুহূর্ত তো এক এক কোটি বছরের সমান সময়।

সুদামার চোখে জল এল। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। অশ্রুপতনের শব্দ শুনতে পায় সে। ভেতরের ঘরে টেলিভিশনে প্রায় নির্মোক নৃত্য। সুদামা ঝুঁকে থাকে নীচের দিকে। তখন টেলিফোন বাজল। টেলিফোন বাজতে থাকল কর্কশ স্বরে। খুব খারাপ লাগে সুদামার। মনে হয় থেমে যাক টেলিফোন। তাকে কি কান্নার সময়টুকুও দেবে না?

কৃষ্ণেন্দু ডাকে, ফোনটা ধরো।

সুদামা অচল। সুদামা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কৃষ্ণেন্দু ডাকে, সুহাস হয়তো ফোন করেছে। সুদামা দাঁতে দাঁত চেপে আরও কঠিন। সে যেন শিলীভূত হয়ে যেতে চায়।

হাজার বছর ধরে যেভাবে মাটি জমে জমে পাথর হয়, তেমনই পাথর হয়ে যাক সে। সময় তার নতুন পরিমাপ খুঁজে নিক। এক একটি মুহূর্ত হয়ে যাক হাজার বছর।

বিরক্ত কৃষ্ণেন্দু নিজে উঠে টেলিফোন ধরল টিভি বন্ধ করে। সুদামা কান পেতে থাকে। বাঁচল সে। না সুহাস বোস নয়, ফোনটা আর একজনের। অনিলবরণ ঘোষের। অনিলবরণ বোধহয় জানতে চাইছে, কী হয়েছিল সাইটে।

সুদামা আঁচলে চোখ মুছে ঘরে ঢোকে নিশ্চিন্ত হয়ে। কৃষ্ণেন্দু হাসছে অনিলবরণের কথায়। অনিলবরণ নিশ্চয়ই কোনো খারাপ কথা বলেছে। কী বলতে পারে? সুদামা আন্দাজ করার চেষ্টায় থাকে। গুলি চালালে ঠিক হয়ে যেত। দু-চারটে লাশ না পড়লে পাবলিক ঠাণ্ডা হয় না।

ফোন রেখে কৃষ্ণেন্দু বলে, পাগল!

কেন কী হল?

বলছে জমি পজেশন নেওয়ার সময় দু-চারটে তুলে পেটালে আজ এসব করতে সাহস পেত না। আচ্ছা ও কি এসব সত্যি বলে?

আমি কী করে জানব?

আমাকে বলছে মানুষ খুন করার একশো পঁচানব্বই রকম উপায় বের করেছে ও, কী একটা লিখছে।

সুদামা টিভি চালায়। চালানোর অর্থ হল কৃষ্ণেন্দুর কথা না শোনা। পর পর চ্যানেল চেঞ্জ করতে থাকে রিমোট কন্ট্রোলে। গান, নাটকের ডায়লগ, খবরের অংশ, বিজ্ঞাপনের শীৎকার, ফুটবলের চিৎকার, রেসিং কার-এর উত্তেজনা সব পর পর পার হয়ে যেতে থাকে। তার ভিতরেই কৃষ্ণেন্দু বলে যাচ্ছে অনিলবরণের কথা। টেলিভিশনের শব্দ আর কৃষ্ণেন্দুর কণ্ঠস্বর একে অপরকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে যায় অবিরাম। তাতে ধ্বনির তীব্রতা বাড়ে। বাড়তে থাকে। ঘর গমগম করতে থাকে। আচমকা কৃষ্ণেন্দু তার কথা থামিয়ে দেয়, কী হয়েছে তোমার, শুনছো সুদামা? টিভিটা বন্ধ করো। চিৎকার করে ওঠে কৃষ্ণেন্দু।

সুদামা টিভি বন্ধ করে। ঘর আবার নৈঃশব্দ্যে ঢাকে, কিন্তু কানে যেন একটু আগের উত্তেজক শব্দগুলি তাদের রেশ নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে। সুদামা দু-হাতে কান চাপে। কৃষ্ণেন্দু বলে, কী হয়েছে বলো দেখি, অত জোরে টিভি চালায়?

সুদামা জবাব দেয় না। কৃষ্ণেন্দু ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে থাকে। চলে যায় ব্যালকনিতে। সুদামা কী করবে ভেবে পায় না। উঠে স্টিরিওতে ক্যাসেট চাপায়। দ্যাখেও না কী ক্যাসেট। ভল্যুম লো করে দেয়। কী আশ্চর্য! নিখিল ব্যানার্জি বেজে ওঠেন। সুদামা দু-চোখ বন্ধ করে বসে থাকে মেঝের কার্পেটে। সেতারে মেঘমল্লার বিলম্বিত লয়ে বেজে উঠেছে ঘরে ও বাইরে। কৃষ্ণেন্দু চুপচাপ।

কৃষ্ণেন্দু সুদামার গা স্পর্শ করে ডাকতে গিয়েও সরে যায়। একটু দূর থেকে অনুচ্চ স্বরে ডাকল, তুমি ঘুমোলে, ঘুমোলে নাকি?

বলতে বলতে কৃষ্ণেন্দু আরও এগিয়ে আসে। সুদামা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল। খোপাভাঙা মাথার চুল পাখার হাওয়ায় সামান্য উড়ছে। চুল ছড়িয়ে অছে কাঁধের দু-পাশে। গায়ের আঁচল ঈষৎ লিত। মুখখানিতে ক্লান্তি। সারাদিন ঘরে বসে সুদামার চোখ-মুখে এত ক্লান্তি! চোখের কোলে কালিও পড়েছে যেন। কৃষ্ণেন্দু একটু নিচু হয়ে হাত বাড়ায়। ব্লাউজের সীমারেখা যেখানে শেষ হয়েছে কাঁধ ও গ্রীবার সেই সংযোগস্থলে একটি শিরা দপদপ করছে যেন। কৃষ্ণেন্দু হাত আরও এগিয়ে দেয়। ছুঁয়ে, একটু নাড়িয়ে আচমকা ভয় পাইয়ে সুদামার আধো ঘুম ভাঙিয়ে দেবে? নাকি অন্যভাবে। খুব আলতো করে কপালের উপর একটি চুম্বন, কিংবা ঠোঁটে চুম্বন! চুম্বনের টানে জাগিয়ে দেবে সুদামাকে। শুকনো ঠোঁট দুটি দ্যাখে কৃষ্ণেন্দু। এইভাবে কতদিন আগে শেষ চুম্বন দিয়েছিল। সুদামাকে। মনে পড়ে না। ইদানীং কখনও এমন হয়েছে কি? মনে পড়ে না। কৃষ্ণেন্দু আরও এগিয়ে সুদামার খুব কাছে পৌঁছে গিয়ে অপেক্ষা করে। ঠোঁট দুটিতে আঙুল ছোঁয়াতে গিয়েও থমকে যায়। কী আশ্চর্য! সে যেতে চাইছে, তার পা সরছে না, শরীর ভাঙছে না। শরীর টানছে না। তাকে তো নীচু হতে হবে চুম্বনের জন্য। তাকে তো হাঁটু মুড়ে বসতে হবে ঠোঁট, গাল, চোখের পাতা, স্তন স্পর্শ করার জন্য। নীচু হতে পারে না কৃষ্ণেন্দু। সরে যায়। পিছিয়ে গিয়ে ডাকে সুদামাকে আবার।

সুদামা আচমকা চোখ খোলে। সে তো জেগেই ছিল প্রায়। সে টের পাচ্ছিল, এগিয়ে আসছে কৃষ্ণেন্দু। চুরি করে ভালোবাসা দিতে অগ্রসর হয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। ঘরে এখনও নিখিল ব্যানার্জির হাতের কারুকার্য ভেসে আছে, বাতাস মথিত করছে। সুদামা স্পষ্ট টের পেয়েছে, পিছিয়ে গেছে মানুষটা। সাড়া পায়নি তাই। সে উঠল। স্টিরিও বন্ধ করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার চোখে জল এল। মেঘের আস্তরণ কিছুটা পরিষ্কার হওয়ায় আকাশে এখন দু-একটি তারার চোখ। সুদামা নিঝুম হয়ে চোখের জল ঝরে যেতে দেয়। জানা হয়ে গেল নাকি সব! কে জানে? কৃষ্ণেন্দু তো এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সুদামা মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে থাকে। কেউই কোনো কথা বলে না।

সতেরো

আকাশে মেঘ এল অবশেষে। গতকাল ঘুমের ভেতরে মেঘ এসেছিল, আজ সকাল থেকে আকাশ ঘোর হয়ে আছে। বৃষ্টি কখনও টিপ টিপ, কখনও একটু জোরে। আবার অনেক সময় ধরে আকাশ গুম হয়ে থাকছে।

দেখে মনে হয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আচমকা। দুপুরে সুহাস ফোন করেছিল। গতকাল করেছিল সুদামা নিজে। এখন টেলিফোন প্রায়ই আসছে।

কৃষ্ণেন্দু ইদানীং উদ্বিগ্ন বেশ, চিন্তাক্লিষ্ট। সুদামা কিছুই জিজ্ঞেস করেনি তাকে। সেই যে দিন-কুড়ি আগে রাজারামপুর ভিজিট করে এল, তারপর দিন সাত-আট তো নিশ্চিন্তে ছিল কৃষ্ণেন্দু। এখন কী হল? কী হল তা ও-ই জানে। সুদামার কোনো কৌতূহল নেই। কথা হয় সামান্য। রাতে কৃষ্ণেন্দুর টিভির সামনে বসে থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে। উপগ্রহ যে ছবি ধরে। তার সময়কাল তো প্রসারিত হয়ে হয়ে মধ্য রাতে পৌঁছে গেছে। কৃষ্ণেন্দু জাগে প্রায় শেষ অনুষ্ঠানের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত। পর পর সিগারেট ধ্বংস করে।

একদিন সুদামা ডেকেছে তাকে, কী দেখছ আজে-বাজে ছবি। শুয়ে পড়ো।

কৃষ্ণেন্দু জবাব দেয়নি। সুদামা তখন ঘুরে শুয়েছে। কৃষ্ণেন্দু টিভির শব্দ বন্ধ করে শুধু ছবি দেখতে আরম্ভ করেছে গত কয়েকদিন। সুদামা ঘুমিয়ে থাকে তখন।

বৃষ্টি আবার নেমেছে টিপটিপ। কৃষ্ণেন্দু ফিরেছে একটু আগে। চা খেয়ে অফিসের ফাইল নিয়ে বসেছে টেবিলে। সুদামা ঘুরতে ঘুরতে তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, তুমি বাজির গ্রাম চেন?

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত মুখে তাকায় কৃষ্ণেন্দু, মাথা নাড়ে।

বাহ! এটাও জানো না, তোমাদের রাজারামপুরের কাছে।

সুহাস বলেছে? কৃষ্ণেন্দু ফাইলে চোখ বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করে।

সুদামা জবাব দেয় না। বলে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকলে এসব জানতে হয় না?

মাথা নাড়ে কৃষ্ণেন্দু, বলে, মেশিনারি আছে, দরকার পড়লে সার্ভে রিপোর্ট পর্যন্ত পেয়ে যাবে, যদি চাও কালই রিপোর্ট পেতে পার।

সুদামা ঘুরতে ঘুরতে আবার এল, চিনেম্যানতলা চেন? চিনেমন্দির আছে যেখানে।

ট্যাংরায় হবে বোধহয়? কৃষ্ণেন্দু দায়সারা জবাব দেয়।

জান না তুমি, মন্দিরটা তো বজবজের গঙ্গার কাছে।

কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করে, সুহাস বলেছে?

সুদামা ঘুরছে ঘরের ভেতরে, দূর থেকে বলল, হ্যাঁ ও-ই বলছে।

এই সব কথা বলে?

বলে, ফাল্গুনে মেলা হয় সেখানে। সুদামা বলল।

কৃষ্ণেন্দু শোনে না। সুদামা টেলিফোনের কাছে দাঁড়ায়। আঁচল দিয়ে যন্ত্রটিকে ধূলিমুক্ত করতে করতে বলে, সবে তো আষাঢ় এল, অনেকদিন ওয়েট করতে হবে ওই মেলার জন্য, হ্যাঁ তোমাদের ওই প্রজেক্ট সাইটে আর কোনো গোলমাল হয়নি তো?

কৃষ্ণেন্দু ফাইল রেখে ঘুরে বসে। সিগারেট ধরায়। কী যেন ভাবতে থাকে। কী যেন বলতে গিয়েও বলে না। ধোঁয়ায় ঘর ভরতি হয়ে যায়। ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকায় ঘরের ভেতরে। কৃষ্ণেন্দু অনেক সময় নিয়ে, সিগারেটে ছোটো ছোটো টান দিয়ে ধোঁয়া উগরে দিতে দিতে আচমকা বলে ফেলে, সুহাস খুব চতুর, ওকে দেখলে ধরা যায় না ও আসলে কী রকম!

ভয় পায় সুদামা। তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। এতদিনে কি টের পেল কৃষ্ণেন্দু? তার পৌরুষ আহত হল এই প্রথম! অসম বয়স বলে সন্দেহ করেনি, এখন কি সে সন্দেহের বিষে জ্বলছে? সুদামা কঠিন হতে থাকে। সে প্রতিরোধ করবে। হ্যাঁ, তাই, তাই। সম্পর্কটা স্বীকার করে নেবে। এই চোদ্দ বছরে যা যা হারিয়েছে সে, সব তো কুড়িয়ে এনে দিচ্ছে একত্রিশ বছরের ওই যুবক। সে না নিয়ে পারে কী করে?

তুমি বোঝো না, ও খুব ধূর্ত? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণেন্দু।

সুদামা শক্ত হয়। পায়ের উপর ভরসা না করতে পেরে বসে পড়েছে সোফায়। কী বলতে চাইছে কৃষ্ণেন্দু তা আন্দাজ করতে পারছে না সে। সে কি দুজনের সম্পর্কের কথা বলবে? কৃষ্ণেন্দুর মুখ দ্যাখে সে।

কৃষ্ণেন্দু আবার বলে, ও যে ধূর্ত তা তুমি বোঝো না?

কেন? রুখে দাঁড়ায় যেন সুদামা, ও তো তোমার ডান হাত, এই তো সেদিন ও তোমার মান বাঁচাল, নিন্দে করছ হঠাৎ?

কৃষ্ণেন্দু চেয়ার ছেড়ে ওঠে। পায়চারি করতে থাকে। জানালার কাছে যায়। গ্রিলজাল দু-হাতে চেপে ধরে। ঝাঁকুনি দেয় নিজেকে। তারপর বলে, অনিলবরণই ধরিয়ে দিল।

কী ধরিয়ে দিল? সুদামার বুক ধকধক করে।

সেদিনের ব্যাপারটা, আমি একদম ধরতেই পারিনি, মাথায় আসেনি, একটু খচ খচ করছিল সত্যি, ঠিক মেলাতে পারছিলাম না সব, অনিলবরণ আজ দুপুরে বলল আমাকে, এই বুদ্ধি নিয়ে চাকরি করো চ্যাটার্জি।

সুদামা ঠিক বুঝতে পারে না কোন দিনের ব্যাপার। তার মাথায় কিছু ঢোকে না। তবে সে বোঝে কোনো কারণে কৃষ্ণেন্দু চটেছে সুহাসের উপর। কেন? এমন হতে পারে, কৃষ্ণেন্দু ধরতে পেরেছে সুহাস বোস নামের তার অধঃস্তন অফিসার তার আটত্রিশ পার হওয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে। প্রেমে পড়েছে সুদামা। তাই ঈর্ষায়

ভুগছে কৃষ্ণেন্দু। ঈর্ষা সরাসরি প্রকাশ করতে সাহস হচ্ছে না তার স্বামীর। মনে মনে অসম্মানিতও হচ্ছে নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দু। সেই অসম্মানের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে সুহাসের সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে অন্য প্রসঙ্গে। অনিলবরণ কী বলেছে, তাদের সম্পর্কের কথা। সম্পর্ক তো টেলিফোনে। হ্যাঁ, এবার একদিন আবার আসবে বলেছে সুহাস। কবে তা কেউ জানে না। চমকে দেবে সুহাস। আবার বলছে বস না বললে বসের স্ত্রীর কাছে যায় কী করে? হা হা করে হাসতে থাকে তখন সুহাস বোস। অনিলবরণ জানল কী করে? সুহাস কি নবীন প্রেমিকের মতো অনিলবরণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, করে হালকা হয়েছে। সুদামা কপালে হাত দিল। কপালের ভার হাতে রাখল।

কৃষ্ণেন্দু বলে, আসলে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা কাজ করছিল না ঠিক ঠিক, আমার সন্দেহ সেদিনের ঝামেলাটা প্রি-প্ল্যানড, আমরা যে ভিজিটে যাব তা তো কয়েকজনই জানত, শুধুমাত্র টপমোস্ট লেভেলে, আমরা কয়েকজন মাত্র, গাঁয়ের মানুষ কী করে দলবদ্ধ হয়ে হামলা করল, খবর পায় কী করে, পঞ্চায়েত পর্যন্ত জানত না।

কী করে আবার? কথা খুঁজে পায় না সুদামা।

আশ্চর্য! সুহাস যেন তৈরিই হয়েছিল ঝামেলা সামলাবে বলে। কৃষ্ণেন্দু বলতে থাকে, ঝামেলা সামলে বাইরের লোকের কাছে, অর্থাৎ এল.পি.জি-র কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে কী চমৎকার নিজেকে প্রজেক্ট করল সুহাস বোস।

কৃষ্ণেন্দু বোঝাতে থাকে সুদামাকে, বলে, সুহাসই আগাম খবর পাঠিয়ে ওই প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছিল, সবাইকে চালিত করেছিল। কৃষ্ণেন্দুর ধারণা সুহাস সেদিনকার ব্যাপারে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে ভালোই সাহায্য পেয়েছে, গ্রামের মানুষ তো ওর কাছে আসে ক্ষতিপূরণ নিয়ে কথা বলতে, ডাইরেক্ট কনট্যাক্ট তো ওর সঙ্গেই হয়, যে ভাবে হোক, এটা করিয়েছে ও। না হলে গ্রামের মানুষ জানল কী করে ওইদিন ওই সময়ে তারা যাচ্ছে সাইট ভিজিটে, সবাই তো তৈরি হয়েই ছিল, এর ব্যাখ্যা কী? পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা হয়েছে কৃষ্ণেন্দুর, সে এসেছিল জানতে কী ঘটনা হয়েছে সেদিন। রহস্য ঔপন্যাসিক ঠিক ধরে ফেলেছে দুয়ে দুয়ে চার।

সুদামা বলল, তোমার অনিলবরণের কথা বাদ দাও দেখি, সেদিন যে অন্য কথা বলেছিলে।

তখন তো বুঝতে পারিনি, এখন সব মিলে যাচ্ছে।

সুদামা বোঝে ঈর্ষায় ভুগছে কৃষ্ণেন্দু। নিজের ক্ষমতা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারেনি বলে তার জুনিয়রের সম্পর্কে সন্দেহ করছে। কোনটা সাজানো তা জানার কোনো ইচ্ছেই নেই সুদামার। তার কোনো মায়াই নেই যেন। কৃষ্ণেন্দুকে ভুলতে শুরু করেছে সে হয়তো-বা। আসল সন্দেহটা প্রকাশ করতে

পারছে না কৃষ্ণেন্দু। ভীত পুরুষ। নির্বোধ পুরুষ। সুদামা কি বুঝতে পারছে না কেন কৃষ্ণেন্দুর এই বিদ্বেষ। অনিলবরণ হয়তো সুহাস আর তার সম্পর্ক নিয়েই কথা বলেছে। সেই কথাটিকে অন্য চেহারায় হাজির করছে কৃষ্ণেন্দু। বলতে পারছে না তাই আবোল-তাবোল বোঝাচ্ছে তাকে। কী লাভ সুহাসের? সেই দুপুরে তো রাজারামপুর নিয়ে একটি কথাও বলেনি যুবকটি। বলেছে হাউই-এর কথা। তুবড়ির আলোর কথা। আলো আর আলোর বাজির কথা।

কৃষ্ণেন্দু বসেছে আবার, বলছে, অনিলবরণ গেলে স্পটেই ঝামেলা পাকাত, সুহাসকে জেরা করত ও।

তোমার অনিলবরণের কথা রাখ তো, ও কি কোনো মানুষ। সব সময় খুন যখম, নরহত্যা নিয়ে ভাবে, আমাকে একদিন ফোন করে বিষ নিয়ে কথা বলতে লাগল, সন্দেহবাতিক লোক, মৃত্যুচর্চা করে।

কৃষ্ণেন্দু কিছু আর বলে না। টিভি চালিয়ে নিঝুম হয়ে বসে থাকে। রাত যায় দিন আসে। পর দিন দুপুরে ফোন এল সুহাস বোসের! সুদামা শক্ত করে রিসিভার চেপে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বসের সঙ্গে?

কই, কিছু না তো?

তোমার বস তোমার সম্পর্কে কিছু সন্দেহ করছে।

তা হলে তো তোমার সম্পর্কেও। বলল সুহাস।

না না, বিষয়টা এখানে নয়, শোনো সেদিন কী হয়েছিল রাজারামপুরে?

সুহাস বলতে চায় না। বলে দু-একটি কথা। তখন সুদামা তাকে জানায় কৃষ্ণেন্দুর সন্দেহের কথা। সুহাস ওপারে যেন একটু থমকায়, তারপর হা হা করে হাসে, স্যারের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ঘোষচৌধুরী সায়েবের কথা কেউ শোনে, ঘোষচৌধুরী সায়েব তাঁর রহস্য উপন্যাসের খুনি কী দিয়ে খুন করবে, কীভাবে খুন করবে তাই-ই ঠিক করতে পারছেন না, শুনেছ কি কোনো রহস্য উপন্যাসে অপরাধী অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমা, গ্যাস চেম্বার থার্ড ডিগ্রি — এইসব অ্যাপ্লাই করছে খুনের জন্য — পাগল। আচ্ছা ঘোষচৌধুরী সায়েবকে দেখলেই মনে হয় না কেমন রহস্যময় মানুষ। চোখ দুটো দেখেছ, মনে হয় না মরা মানুষের চোখ!

হাসতে থাকে সুদামা। কী চমৎকার কথা বলো তুমি, আমার তো মনে হয় ওই ঘোষচৌধুরী ভেরি মাচ লিভিং, জ্যান্ত মানুষ।

ঘোষচৌধুরীকে পছন্দ হয় তোমার?

হাসছে সুদামা, পছন্দ হলে কী করব, অত জ্যান্ত মানুষের সঙ্গ সহ্য করতে পারব কী করে। দেখছ না ওর সুন্দরী বউ বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছে, বিয়ে তো করনি। করলে টের পেতে, আর মেয়ে হলে আরও বুঝতে।

আহা আমি সে কথা বলছি না, ওপারে সুহাস বোসের গলা জড়িয়ে যায়। নিশ্বাস ঘন হয়, সে বলে, ঘোষচৌধুরীর সবসময় সন্দেহ।

বাহ সন্দেহ করাই তো ওর কাজ। খিলখিল করে হাসে সুদামা, তারপর বলে, তুমি সব ট্যাকল করেছ তাতেই বস রেগে গেছে, আমি বললাম, তুমি জানো তাই ট্যাকল করতে পেরেছ, তুমি ল্যান্ড অ্যান্ড পিপল বোঝ।

আমার তো চিন্তা হয়ে গেল, চাকরি থাকলে হয়।

না থাকবে, না থাকবে।

কী করব তখন?

লিখবে, লেখাও চমৎকার প্রফেশন, ধরো তুমি লিখবে কংসাবতী তীরে বর্ষা! বলতে বলতে সুদামা শিহরিত হয়। আরও কিছু বলতে ইচ্ছে হয়। ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। সে শুয়ে আছে প্রিয় পুরুষের কোলে মাথাটি ছুঁইয়ে। খোলা জানালার গায়ে মেঘ। সেই মেঘ এসেছে আবার। ঢুকছে শহরে। সুদামার নিশ্বাস গাঢ় হতে থাকে। সে ফিস ফিস করে, দেখেছ কংসাবতী তীরে বর্ষা?

হ্যাঁ দেখেছি। ওপারেও নিশ্বাস আগুন।

লিখতে পারবে?

যদি তুমি বলো। ফিসফিস করে ওপার থেকে কেউ, যেন ওদিকে শুরু হয়ে গেছে এককণা এককণা রোঁয়ার মতো বৃষ্টি, পাখির গা থেকে পালক ঝরে যাচ্ছে ক্রমাগত। পুরোনো পালক বৃষ্টির কণার মতো নামছে শুধু নামছে। দুজনে নিঝুম হয়ে গেছে। পরস্পরকে অনুভব করতে থাকে দুজনে যেন দুটি গ্রহে বসে। বাইরে বৃষ্টি জোরে এল। বৃষ্টির শব্দে টেলিফোন ভেসে যায়।

ওপার থেকে সুহাস বলল, আমি একটু টেনশনে আছি, দু-একদিন বাদে ফোন করছি। আজ রাতে খয়রাশোল যাচ্ছি, বাড়িতে।

আঠারো

আশ্চর্য! ক-দিনের জন্য যে মেঘ এসেছিল শহরে, তা আচমকা উধাও। আকাশ আবার খটখটে, রোদের ভিতরে ঘোলাটে ভাব। ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ হচ্ছে ঘরে থাকা মানুষ। সুদামা ভাবে সুহাস কি মেঘ নিয়ে চলে গেছে খরা-পীড়িত বীরভূমে! সুহাস কি এখনও ফেরেনি? কৃষ্ণেন্দু খুব গম্ভীর। ওর নাম উচ্চারণই করে না। মাঝে-মধ্যে টেলিফোন আসে সন্ধের পরে, রাত্রে। ঘোষচৌধুরী বা অন্য কেউ কথা বলতে চায় কৃষ্ণেন্দুর

সঙ্গে। কৃষ্ণেন্দু কী কথা বলে তা শুনতে চায় সুদামা। সুহাসের নাম যে উচ্চারিত হয় না, তা নয়। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুও যেন ধরে ফেলছে সুদামার কৌতূহল, খুব আস্তে কথা বলে।

সুদামার ঘরে থাকাই দায় এখন। ভাবে বেরিয়ে যায় বিনতার কাছে। তার কাছে উন্মোচন করে নিজের সব। কিন্তু বিনতার কি সময় হবে? শুনে বিনতা তাকে তিরস্কার করবে না! ছিঃ সুদামা, তোর না অত বড়ো একটা ছেলে, অত সুন্দর স্বামী। তুই না প্রেম করেছিলি বিয়ের আগে অনেকদিন। প্রেম কি ফুরিয়ে যায় কখনও! আমার তো বিয়ের পরে ভালোবাসা। বিয়ের আগে চিনতামও না লোকটাকে। কম দিন তো বিয়ে হয়নি, এখনও লোকটা দেরি করে ফিরলে ঘর-বার করি। ও যদি না ঘুমোতে পারে, আমিও ঘুমোই না। আমি যদি না ঘুমোই, ও-ও তো ঘুমোতে পারে না। ছিঃ সুদামা, সম্পর্ক কি দু-দিনেই বাসি ভাত। তোর কাছে সব তাই নেই নেই করিস। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তোকে কী ভালোই না বাসে তোর বর।

তুই আমার কথাটা —

কী আর বুঝব রে, বোঝা আমার হয়ে গেছে, সারাদিন ঘরে বসে বসে, এত সুখে থেকে, রাজরানির মতো থেকে তোর মাথা ঘুরে গেছে। ছিঃ, যদি শোনে কৃষ্ণেন্দু, তুই কী জবাব দিবি? সারাদিনে এত কাজ আমার, অন্য পুরুষ মানুষের মুখ কেন গলার আওয়াজ শুনতেও কৌতূহল হয় না। তুই বাড়ি যা, ভাব বসে। ভেবে দ্যাখ কী বলতে এসেছিলি আমার কাছে। যা তুই সুদামা, যা। বরং তুই ছেলেকে ডাক, না হয় ছেলের কাছে চলে যা। তোর মন খারাপ লাগে না বাচ্চার জন্য, তার কথাও তো ভাববি।

তা হলে কি সে যাবে অর্চনার কাছে। অর্চনা তো অফিসে একটা কথাও বলতে পারবে না। তা হলে কি অফিসের পরে, স্ট্র্যান্ড রোডে, গঙ্গার সামনে। কিন্তু অর্চনাও কি শুনবে? বলবে, কী আবোল-তাবোল বলছিস রে সুদামা, তোর কি মাথা খারাপ? যাই, ছেলেকে পড়াতে হবে ফিরে গিয়েই, ফার্স্ট টার্মিনাল সামনে। ও সুদামা, তুই বরং এটা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে আলোচনা করে দেখ। হি-হি করে হাসতে হাসতে বাসের জন্য ছুটল অর্চনা।

এইকরমই হবে। এ ছাড়া দুপুরে তো সুহাসের ফোন আসতে পারে। ফোন বেজেই যাবে, কেউ ধরবে না। তাই-বা কী করে হয়? সুদামা দুপুরের ভ্যাপসা গরমে ফোনের দিকে চেয়ে জেগে থাকে। ঘুরঘুর করে। ভাবে ডেকে আনে অনিন্দিতা আর মাধুরীকে। টিভি চালিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করতে বসে। গল্প করতে করতে জানিয়ে দেয় সুহাস বোস নামের যুবকটির কথা। আর তাই শুনে মাধুরী অবাক, সে কি গো, তলে তলে, একা একা এত! আমাদের জন্যও ওইরকম একটা জোগাড় করে দাও, দুপুরের প্রেম সারি। হি-হি করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে মাধুরী! খুব খোলামেলা! খুব ক্যাজুয়াল, কেমন দেখতে গো, শাহরুখ খানের মতো ইয়াং, টগবগে ঘোড়া, সানি দেওলের মতো মাসকুলার বডি, নাকি ওই যে কে এস-এর বিজ্ঞাপনে থাকে ছেলেটা, রাহুল না কী যেন নাম, তার মতো, উডল্যান্ড শ্যু-এর ছেলেটার মতো নাইস!

দেখলেই শরীর জ্বলে ওঠে, কী গো সুদামা, বলছ না কেন, বাঙালির ওইরকম চেহারা, ওইরকম ম্যাসকুলিনিটি থাকে! নাকি ওই গেঞ্জির বিজ্ঞাপনের নায়কের মতো ভ্যাদভেদে — বিজ্ঞাপন দেখতেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ...।

শুনে অনিন্দিতা বলে, তুমি কি সত্যি বলছ, সাচ। ঝুটা তো নেহি!

মাধুরী বলে, কিন্তু তোমার কবীর বেদির মতো স্বামীটাই-বা কী খারাপ, নাকি তিনিও জুটিয়েছেন আর কাউকে! হি হি হি, আমাদের বরের মাথায় পাকা চুল, কিছুতেই ডাই করবে না, তোমার উনি তো ডাই করেন, একদিন নতুন ঘোড়াটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না গো, দেখেই সুখ, তোমার কী মজা! কখন আসে, দেখতে পাই না তো, এই জন্য তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ সুন্দরী।

আবার অনিন্দিতা বলে, আহ। একত্রিশ বছরের ইয়াং, কেমন পুরুষ মানুষ সে বলো দেখি, তুমি তার শার্টের বোতাম ... ক্লিন শেভড ইয়াংম্যান — ডেনিম আফটার শেভের অ্যাডটা দেখেছ, ওইভাবে জামার বোতাম খুলতে পারো — হি হি হি, কী প্রভোকেটিভ — সেনসুয়াস ...

সুদামা তা হলে কী করে যায় ওদের কাছে? তা হলে এই দেওয়াল, টেলিফোনই ভরসা। টেলিফোন তো সব জানে, দেওয়াও। সুদামা অপেক্ষা করে টেলিফোন বেজে ওঠার। যত সময় টেলিফোন না বাজে সে টিভি চালিয়ে দেয়। বিজ্ঞাপন চিত্র দেখতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, উডল্যান্ড শ্যু, ডেনিম আফটার শেভ, কে-এস-রেমন্ড শ্যুটিং দেখতে দেখতে টেলিফোনের দিকে কান রাখে। টেলিফোন ঘুমিয়ে থাকে। তারপর আচমকা সে দুঃস্বপ্ন না সুখস্বপ্নের ঘোরে জেগে ওঠে। বাজে। ছুটে ফোন ধরতে যায় সুদামা। সুদামা ছিল ও ঘরে। ডাইনিং কাম লিভিং-এর লাইনটা, না বেডরুমের লাইন, কোনটা ধরবে সে? বেডরুম অনেক নির্জন। অনেক গোপনীয়তাযুক্ত। ফোন ডেকে যাচ্ছে যেন অনেক সময় ধরে। দূর থেকে ডাকছে, যে ভাবে হারিয়ে যাওয়া মানুষ ডাকে, সেইভাবে হয়তো-বা। ছুটে ফোন ধরতে গিয়ে চুল এলো হয়ে যায়, গায়ের আঁচল পড়ে যায়।

সুদামা ডাক দেয়, হ্যাঁ বলছি, আমি সুদামা।

কোথায় ছিলেন এত সময়? ওপারে ঠিক সুহাসের কণ্ঠস্বর।

তুমি কবে ফিরলে?

ফিরেছি তিনদিন। খুব জরুরি একটা ব্যাপার ছিল। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলাম। তুমি কেমন আছ?

টেলিফোনে সুদামার কান। দুচোখ শব্দহীন টেলিভিশনের চিত্রময়তায়। সে যেন বিজ্ঞাপনের পুরুষকে দেখছে না, দেখছে সুহাসকে। স্বাস্থ্যবান পুরুষ তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। ভালোবাসায় হাত ধরেছে। সুহাস

বলল, পরামর্শটা নেওয়া খুব জরুরি ছিল, তোমার কাছেও তো নিতে হবে।

পরামর্শ! কী পরামর্শ? সুদামার বুক ধকধক করে, ও কি তার কথা বলতে গিয়েছিল বীরভূমে। হা ঈশ্বর! কোথা থেকে রে কী হয়ে যায়, যাচ্ছে। এবার নীল ফেরেনি গরমের ছুটিতে। ইস্কুল থেকে ওদের নিয়ে গেছে উটকামন্ড। নীল একদিন ফোন করেছিল অতদূর থেকে।

সুহাস বলল, খুব জরুরি ব্যাপার। ডিসিশন নিতে হবে।

কী ডিসিশন? সুদামা থরথর করে কাঁপে।

তোমাকেও বলছি, শোনো আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

তাই! লিখবে বলে, আহ! আনন্দে রিসিভার কানে চেপে ধরে সুদামা, সত্যিই ছাড়ছ, এই ডিসিশন নিতে বীরভূম গিয়েছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো সিদ্ধান্ত। সুদামা নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলে। যে ভয় পেয়েছিল সে! এ যে আগুনের সঙ্গে খেলা! এত তাড়াতাড়ি তো তেমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তার যে ভয় করে! নীল রয়েছে উটিতে। তাকেও তো বলতে হয়। বাঁচল যেন সুদামা, বলল, ভালো করছ, এখন থেকে তোমার পেশা হবে লেখা, কংসাবতী তীরে বর্ষা, বাজির গ্রাম, চিনেম্যানতলা ...। নীল নীল ... আচমকা নীলের জন্য চোখে জল আসতে শুরু করে, আবেগে চোখ ভিজে যায়। সময় যন্ত্রে সে ফিরে যাচ্ছে চোদ্দ বছর আগের প্রেমে।

শোনো ম্যাডাম, তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওসব আমার হবে না। আমি মিঃ মেটা, এল পি জি সংস্থায় এদেশি ডিরেক্টরের কাছ থেকে অফার পেয়েছিলাম, অ্যাকসেপ্ট করছি। এখনই জয়েন করতে বলছে ওরা, ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি তো আছেই আমার — দারুণ অফার, স্যালারি প্রায় ডাবল। এ ব্যতীত অন্য সুযোগ, যাকে পার্কস বলো তোমরা তা অনেক। বাইরে পাঠাবে ট্রেনিং-এ, বোম্বেতে যেতে বলছে এখনই। কী, খুশি তো ম্যাডাম?

হাতের টেলিফোন ঠান্ডা হতে থাকে। কী ঠান্ডা, কঠিন, যেন বরফ চাপা হাত ধরেছে সে। তখনো সুহাস বর্ণনা করে যাচ্ছে অফারের বিবরণ, কীভাবে এটা হল, ওরা ইয়াং ম্যান খুঁজছে, সেদিন ভিজিটে গিয়ে আমার কাজ দেখে ...।

সুদামার কানে বরফ শীতল বাতাস, চোখে টিভির রঙিন ছবি। পুরুষটি যত দুর্দম, তার সঙ্গিনী ততই ক্ষীণায়ু। রূপটুকু নিয়ে সে পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে। কী শূন্য দৃষ্টি! রূপ ব্যতীত তার আর কোনো কিছুই নেই। পুরুষের স্পর্শের জন্য সে ঝুঁকে পড়ছে ক্রমশ। কী চমৎকার শ্যুটিং ... ইয়ে হা জে সি ...। টেলিফোন ছেড়ে দেয় সুদামা। কাটা হাতের মতো রিসিভারটি ক্রেডল ছাড়া হয়ে পড়ে থাকল। ঝুলতে লাগল তারে।

সেদিন বিকেলেই কৃষ্ণেন্দু ফেরে। ঈষৎ নুব্জ। ঝুঁকে আছে সে। একদিনেই বয়স যেন বেড়ে গেছে অনেক। ব্রিফ কেস রেখে নিজেকে সে নিক্ষেপ করল সোফার উপর। কালো মুখ থমথমে।

বিপন্ন সুদামা জিজ্ঞেস করে, তোমার হল না তো?

চমকায় না কৃষ্ণেন্দু। বলল, সুহাস তো ফোন করবে বলছিল, করেছিল?

হ্যাঁ।

ও রিজাইন করেছে।

জানি। সুদামার কণ্ঠস্বর কঠিন। বিপন্নতা অগ্রাহ্য করে সে।

তুমি পারলে না? সুদামার দিকে সরাসরি তাকায় কৃষ্ণেন্দু।

কী পারলাম না? সুদামা ফুঁসে ওঠে আচমকা, কী বলছ?

ওই হাউই, তুবড়ি, ঝুলঝুরির গ্রাম! সব বাজির মতো নিভে গেল! বিড়বিড় করে কৃষ্ণেন্দু, হাউই আকাশে উঠে ফেটে গিয়ে কতকগুলো তারা জ্বালিয়ে দিল, তাদের আয়ু কয়েক সেকেন্ড! তারপর অন্ধকার!

কী বলতে চাইছ তুমি? সুদামা গলায় জোর আনতে গিয়েও পারে না। কেমন নির্জীব হয়ে যাচ্ছে সে। বসে পড়েছে মেঝের কার্পেটে। চোখ দুটো ভার হয়ে যাচ্ছে, শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, এ কথা কে বলল?

কেন সুহাস বোস।

অবাক হয় না সুদামা। তার জীবনের শেষ বিস্ময় কেটে গেছে আজ দ্বিপ্রহরে, ঘোলাটে রোদের দিনে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি জানতে কী হতে যাচ্ছিল?

সব জানতাম, আন্দাজে ভুল ছিল না।

মুখ কালো হয়ে যায় অপমানে। সে মাথা নীচু করে, বলল, কী করে আন্দাজ করতে, আমি তো ওর সঙ্গে কোনোদিন পথেও বেরোইনি, দুপুরে এই ফ্ল্যাটে ওকে কোনোদিন আসতে বলিনি, ও আসেওনি। তবে কী জানতে?

তুমি ঠিকই বুঝেছ, কৃষ্ণেন্দু বলে, থাক এসব।

না, থাকবে কেন? বলো কী ভেবেছিলে?

তুমি তো নিজে ভালো জানো, ও তো বোম্বে চলে যাচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই তা জানো।

জানি, কিন্তু তুমি কী আন্দাজ করেছিলে, পরিষ্কার করে বলো।

কৃষ্ণেন্দুর মুখে ক্লিষ্ট হাসি, সে বলল, ভেবেছিলাম হাউই ফুলঝুরি, তুবড়ির আলোয় তুমি ওকে আটকে রাখবে, চিনেম্যানতলায় ওকে নিয়ে যাবে, পারলে না, ও খুব ধূর্ত!

তুমি সব জানো।

জানিই তো, এখন বুঝতে পারছি সুহাস যখন তোমার সঙ্গে হাউই-বাজির কী কথা হল তা বলতে লাগল আমাকে হাসতে হাসতে, তোমার কথা বলতে বলতে গলা আটকে যেতে লাগল, আমারই বোঝা উচিত ছিল সব ওর ধূর্তামি, আমাকে জানাচ্ছিল যে, স্যার ম্যাডামের প্রেমে পড়েছি আমি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সুদামার জন্য আমি আমার প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিচ্ছি। বড়ো চাকরিটায় আমার কোনো লোভ নেই, প্রেমে পড়লে ওসব দিকে মন থাকে না মানুষের। ও তো প্রায়ই বলতে তোমার কথা। বলত আর আমার চোখের দিকে তাকাত, আমি তখন ভাবিইনি, ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। পেশায় যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী না হয় তাই তো আমি মেনে নিয়েছিলাম ওকে।

তোমার ভয় করেনি, আমি নীলের মা।

মাথা নাড়ে কৃষ্ণেন্দু, না ভয় করবে কেন, টেলিফোন ব্যতীত তুমি আর কতটা এগোবে, আমি তো তোমাকে চিনি। চেনায় ভুল নেই। ওকে তো ফ্ল্যাটে ডাকোনি। হয়তো ডাকার দিকে এগোচ্ছিলে। তার আগে আমি তোমার কাছে চলে আসতাম, নিজের কথা বলতাম, তোমাকে আমি যতটা চিনি, ততটা কি ও চেনে? তুমি কেন মা হতে গিয়েছিলে তাও তো জানি। তোমার মন তো আমি চিনি, তোমার রোমান্স কীসে তা কি আমি জানি না? আসলে প্রথম থেকেই ওর কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছিলাম ও আমার গোপন প্রতিদ্বন্দ্বী। না এই ঘরে নয়, তোমাকে নিয়ে নয়, আমার চাকরিতে, পেশাতে, কোম্পানি আমাকে একটা আভাস দিয়েছিল মাত্র। সেটা আমি ওকে আচমকা একদিন বলে ফেলেছিলাম, না, না, বলিওনি, আন্দাজ দিয়েছিলাম। ও খুব চতুর, ধরে ফেলেছিল সব, তখন আমার আর উপায় ছিল না, ওরা তো টাকার বাজার খুলে বসেছে, সেই টাকা ছাড়ি কী করে। যখন টের পেলাম আটত্রিশ বছরের নারীও ওকে মুগ্ধ করতে পারে তখন আমি নিশ্চিন্ত —

সুদামার আর কিছু জানার নেই। সে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ভাঙা দেহ নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, দু-হাতে মুখ ঢাকে, তুমি আমাকে তোমাদের টাকার বাজারে তাই ঠেলে দিলে, আমাকে এইভাবে অপমান —। তুমি কি পুরুষ মানুষ!

কৃষ্ণেন্দু মাথা নামায়, বলল, আমি চেয়েছিলাম ঘরে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক। তাতে বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমবে, বাইরে আমি নিশ্চিন্ত থাকব, ও আমাকে আমার মতো করে নিশ্চিন্তও করেছিল যাতে আমি সতর্ক না

হই।

সুদামা টলতে টলতে আছড়ে পড়ে কৃষ্ণেন্দুর ঠাণ্ডা শরীরে, গলার কাছ থেকে জামার কলার টেনে ওর মাথা নামিয়ে দিল আবার, বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সুদামা, কৃষ্ণের সখা, পুরুষের নামে নাম, আমি যেন পুরুষ মানুষের মতো অধিকার করতে পারি সব, তুমি আমার প্রেমিক, সখা, বন্ধু। একটা প্রতারকের হাতে তুলে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত ছিলে হে প্রেমিক, আমার স্বামী, অগ্নিসাক্ষী রাখা পুরুষ মানুষ, নির্বোধ, তুমি কেন আমাকে আগে বলনি কথা যা হত আমার সঙ্গে তা সে সব আবার গল্পচ্ছলে জানায় তোমাকে, তুমি বসে বসে শুনতে আর ভাবতে তোমার বিশ্বাসী বউয়ের প্রেমে পড়ে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াবে। আসলে সরে দাঁড়িয়েছিলে তো তুমি, সরে দাঁড়িয়েছ, আমাকে দুজনে মিলে অপমান করেছ, দুজনে মিলে একটা মেয়ে মানুষকে তোমরা উলঙ্গ করে দিয়েছ। বড়ো কাজে একটা দুটো রেপ, থার্ড ডিগ্রি ... যা বলে ওই অনিলবরণ, তাই-ই করেছ তোমরা, আমি তো প্রতারকের প্রেমেই পড়েছিলাম, হয়তো ঘরও ছাড়তাম — ছিঃ, তুমি এই রকম।

কৃষ্ণেন্দু ধীরে ধীরে সুদামার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে সরে যায়, খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে তুমি ভুল করছ। এটা তেমন কোনো ব্যাপারই নয়। যদি আজ আমি জিতে ফিরতাম, আমাকে তুমিও জিজ্ঞেস করতে না কীভাবে কী করলাম আমি, বিজয়ীকে কেউ প্রশ্ন করে না সে যা করেছিল তা ন্যায়সঙ্গত কিনা। আমি জিতে গেলে ওকে পিঁপড়ের মতো টিপে মারতাম। ওর ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়ে চাকরি ছাড়তাম, খুব সামান্য ব্যাপার এটা। ও তো তোমার ঘরে আসেনি, ও তো প্রেমের ভান করেছে।

সুদামা শুনছিল না। সে আছড়ে পড়ে মেঝের কার্পেটে, বিড়বিড় করে, ওই জন্যই বাচ্চাটাকে রাখতে দাওনি, গর্ভবতী বউয়ের সঙ্গে তো প্রেম করতে পারবে না তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, টাকার বাজারে সওদা করতে আসা বেনিয়া, বাজারের মেয়ে-মানুষ পেটে ধরলে তো তার দাম কমে যায় —।

কৃষ্ণেন্দু চুপ।

উনিশ

বহুদিন বাদে কিছু একটা লিখতে ইচ্ছে করে সুদামার। ডায়েরির পাতায় জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার কী হয়েছিল, সে কেমন আছে, কেমন ছিল। কেউ না পড়ুক, নীল তো পড়বে। নীল — নীলাঞ্জন লিখেছিল কলকাতায় খুব গরম, তারা যাচ্ছে উটকামণ্ডে। কলকাতা তার আর ভালো লাগে না। অথচ এটা তো সবাই জানে, চোদ্দ বছরের নীলও জানে কলকাতার চেয়ে দক্ষিণ ভারত কম তপ্ত নয়।

নীল লিখেছিল, কলকাতায় গেলে প্রাণ হাসফাস করে, জ্যাম, ধুলো-ময়লা। আশ্চর্য মায়ের জন্যও মন কেমন করে না তার। কলকাতায় এসে না হয় বড়ো ব্যালকনিটাতে দূরবিন নিয়ে বসে থাকতিস, তোকে না

হয় নিয়েই যেতাম দার্জিলিং! সুদামা ছেলের চিঠির সম্পূর্ণ জবাব দেয়নি। দায়সারা হয়ে কী লিখেছিল মনেও নেই আজ। বাবা-মায়ের কাছে এলেও দমবন্ধ হয়ে যাবে তার। ওখানেই যত বাতাস!

তার কথা শুনে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, থাক না, বড়ো হচ্ছে তো। নিজের মতো বড়ো হোক।

নিজের মতো বড়ো হওয়া! নিজের মতো বড়ো হচ্ছে, না কৃষ্ণেন্দু তাকে তার নিজের মতো করে তুলছে। নীলের হোস্টেল বাস নিয়ে কম আপত্তি করেনি সুদামা। কলকাতায় কি স্কুল নেই। না, অমন কোনো স্কুল নেই এখানে, বলেছিল কৃষ্ণেন্দু।

ডায়েরিতে কী লিখবে ঠিক করতে পারছে না সুদামা। কার জন্য লিখবে? নীলের জন্য! ওখানেই তো একটু বাতাসের চিহ্ন এখনও। শো-কেসের উপর সাজানো নীলের ছবির হাসিটিতে সেই বাতাস।

কদিন বাদে কৃষ্ণেন্দু তাকে ডেকেছিল, ঠিক আছে, এতই যদি ইচ্ছে, তুমি আবার মা হও। আমার কোনো আপত্তি নেই, আবার আরম্ভ হোক।

ঘৃণায় সরে গিয়েছিল সুদামা। ঘৃণা এবং ভয়ে তার সর্বাঙ্গ শক্ত হচ্ছে ক্রমশ, হে বন্ধু, সখা, হে আমার প্রেমিক এইভাবে আর কত কাল! আবার যদি কোনো সুযোগ আসে তোমার কাছে?

বাজার তো বাড়ছে ক্রমশ। বাজার বাড়ছে টিভির বিজ্ঞাপনে, রাস্তার হোর্ডিং-এ, মানুষের মুখের ভাষায়। বাজারের উপযোগী হয়ে উঠতে চাইছে সকলে। হ্যাঁ, তার সন্তানও। বাজারের বড়ো বেনিয়া করে তুলতেই না তাকে অতদূর পাঠানো।

দীর্ঘ দুপুর কাটাতে কাটাতে, একদিন কী খেয়াল হল সুদামার, অনিলবরণকে ডেকে বসল। অফিসে বসে ফোন পেয়ে অনিলবরণ, কী ব্যাপার মিসেস চ্যাটার্জি?

আমি সুদামা।

হ্যাঁ সুদামা, হঠাৎ যে?

আপনি একটু আসবেন।

টেলিফোনে হবে না?

না, টেলিফোন বেশি সময় আমার ভালো লাগে না, এখনই আসুন না।

খুব দরকার?

হ্যাঁ, ওকে কিছু বলতে হবে না। সুদামা ফোন রেখে দিল।

এল অনিলবরণ। ডাকামাত্রই প্রায় ছুটে এল। অফিসের গাড়ি ছিল না, ট্যাক্সি নিয়েই চলে এসেছে হাচোড়-পাচোড় করতে করতে। জামা-কাপড় আধ-ময়লা, সাদা জামার বুক পকেটে কালির দাগ। দাঁড়ি কামানোও নেই।

হাঁপাতে বসল অনিলবরণ, হঠাৎ তলব, তাও ওকে না জানিয়ে।

সুদামা বলল, বিশ্রাম নিন, তারপর বলছি, স্কোয়াশ দিই। মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন তো, ভালো জলভরা সন্দেশ আছে।

অনিলবরণ বলল, না কিছুই লাগবে না, আমার সব রকম খাওয়াও এখন বন্ধ। সুগার হয়ে গেছে যে তলে তলে, তা টের পাইনি, ব্লাড কোলেস্টেরল তো আছেই, দেখুন এটাও একটা উপায়, যদি কারো হাই সুগার থাকে, মিষ্টি খাইয়ে খাইয়ে তাকে শেষ করে দেওয়া যায় —।

সুদামা বলল, থাক, আমি আপনাকে মারতে চাই না। আপনার মুখের ভাষা এত খারাপ।

অনিলবরণ বলে, খারাপটা কিন্তু সবাই শোনে, রেপ-মার্ডার এসব খুব খারাপ। কিন্তু কাগজে এই সব খবর বেশি পড়তে চায় মানুষ। রেপের বিবরণ পড়তে চায়। কেন বলুন দেখি, আসলে মানুষ নিজেই নিজের খোঁজ রাখতে পারে না, কী ভালোবাসে, কাকে ভালোবাসে তাই-ই জানে না।

সুদামা বসেছে দূরত্ব রেখে। ডাকল কেন অনিলবরণকে। ঠিক দুপুরবেলায় তার ফাঁকা ফ্ল্যাটে একটি অন্য পুরুষ যার মুখে খুন রেপ, এসব নিয়ে সর্বক্ষণই যে ভাবিত, খুঁজে খুঁজে বার করেছে ১৯৫ বা ১৯৮ রকমের খুনের পদ্ধতি, সুদামা তাকে ডেকে এনেছে কেন? খুন হতে? নাকি সুহাস বোসের খোঁজ নিতে?

সুহাস বোসের খোঁজ নিতেই ডাকা অনিলবরণকে। সে কি জানে সুহাসের কোনো খবর? দিন পনেরো কাটার পর এখন সুদামার মনে হচ্ছে কৃষ্ণেন্দু সব সত্যি বলেনি। সুহাস তার প্রেমের বিবরণ প্রেমিকার স্বামীর কাছে বলত, এই কথাটি হয়তো সত্যি নয়। হাউই বাজি, ফুলঝুরি, তুবড়ির কথা বলতে পারে, বাজির গ্রামের কথা কৃষ্ণেন্দুকে বলতেই পারে সুহাস, তাতে কল্পনা যোগ করেছে কৃষ্ণেন্দু। পরাজয়ের গ্লানি কাটানোর জন্য আর একজনকেও অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার ছিল তার। সুহাসকে তার অপরাধের সহযোগী করে তুলে নিজেকে কিছুটা আড়াল করতে চেয়েছে হয়তো কৃষ্ণেন্দু। সুদামা জানে, তার এই ভাবনাও সঠিক না হতে পারে। সুহাসকে নিরপরাধ সাজিয়ে সে মনে মনে কৃষ্ণেন্দুকে আরও অপরাধী করে তুলতে চায় যেন-বা। তাতে সে বাঁচে।

সুদামা বলল উপন্যাস লেখা হল?

না, এখন খুনি কীভাবে খুন করবে তা-ই ঠিক করে উঠতে পারেনি।

হাসতে থাকে সুদামা, তার মানে, খুন না হলে উপন্যাস এগোয় কোন পথে?

কোনো পথেই নয় ম্যাডাম। হাসে অনিলবরণ, আসলে খুনের তো বহু উপায় আছে, কোনটা অ্যাপ্লাই করলে সুবিধে হবে লেখকের তাই-ই লেখক ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাই বিষের মাত্রা কমে যাচ্ছে। ধরুন যদি চার মিলিগ্রাম স্ট্রিকনিন বিষের প্রয়োজন হয় মানুষ খুন করতে, খুনির হাতে আছে পয়েন্ট ফোর মিলিগ্রাম, কিছু বুঝলেন? স্ট্রিকনিন না ধুতুরা, কোনোটা ভালো, এ নিয়ে তার ধন্ধ আছে।

মাথা নাড়ে সুদামা, আপনি এত জটিল করেন। কেন ব্যাপারটা?

জটিল করতে তো চাই। পারছি না ম্যাডাম চ্যাটার্জি, ডাকলেন কেন?

কঙ্কনা ফিরল?

ফোন করুন না, না না এখন নয়, ও বোধহয় বাচ্চাদের ইস্কুল থেকে আনার জন্য বেরিয়েছে, ফিরেছে চুক্তি করে।

কী চুক্তি?

আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে আমার বউ, আসলে ও খুব তেজস্বিনী। ধীরে ধীরে বলে অনিলবরণ।

কী হয়েছে, ও কি নার্সিংহোমে গিয়ে ...?

না, না, তাতে তো ওর হার হত। এই রে আমার কী হচ্ছে, ঘরের কথা সব বলে দিচ্ছি। যাক গে, আমি আবার চেপে রাখতে পারি না। শুনুন দিদিমণি, ও বলেছে হ্যাঁ আবার বাচ্চার মা হতে পারে, পরিবর্তে আমাকে খুন করতে হবে তাদের।

কী বলছেন আপনি, দুজনেই কি পাগল হলেন?

হাসে অনিলবরণ, পাগল হইনি। মাথা বেশ ঠাণ্ডাই। ও বলছে খুনটা করতে হবে উপন্যাসে। বলতে বলতে অনিলবরণের মুখ কালো, তা কি সম্ভব? পারা যায়?

সুদামার বিস্ময় বাড়ে, সত্যি বলেছেন?

হ্যাঁ সত্যি, তাই ১৯৫-৯৮ রকম খুনের উপায় জেনেও আমি একটা খুনও করতে পারছি না আমার খুনিকে দিয়ে কঙ্কনা ওই কথা বলার পর, আমার মাথার ভেতরের খুনিটা ভয় পেয়ে গেছে, দেখুন সুদামা, আমার আবার বাচ্চা খুব পছন্দ, ছেলের ছুতোয় আরও কয়েকটা বাচ্চা, তাতে যদি ঘর ভরতি হয়ে যায় যাক না, আমি ব্যাকডেটেড, কৃষ্ণেন্দু বলে, সুহাসও বলত। আমি যেন নাইনটিনথ সেঞ্চুরির মানুষ, কী জানি এক

আনি দু-আনি চার আনি আধুলি, দশ-বিশ-পঞ্চাশ পয়সায় পকেট ঝনঝন করুক এ আমার খুব পছন্দ, ও বলে আমি ওকে খুন করতে চাই।

তাই তো, এত বাচ্চার ধকল কী করে নেবে একটা মা?

নিতে পারে, হলেই নেবে, মেয়ে হলে আমিও নিতাম। হাসে অনিলবরণ, কেউ চায় কেউ চায় না, আমাকে আমার বউ বলে আমি একটা খুনি, কী করে বলে ভাবুন দেখি, পাঁচটা বাচ্চা চাইলে খুনি!

সুদামা চুপ করে থাকে। তার আর ভালো লাগে না। এখন মনে হচ্ছে অনিলবরণ উঠে যাক। সে নিজে ওঠে। পায়চারি করে। অনিলবরণ কথা বলতে আরম্ভ করলে থামে না, বলছে, আমি নাকি ফিউডাল। মেয়েদের শুধু আঁতুড়ঘরে আর রান্নাঘরে দেখতে চাই। ওসব এখন আর চলে না। লোকে জানলে নাকি আমিই খুন হয়ে যাব, কী বুঝলেন কিছু?

সুদামা বলে, তা হলে আপনার খুনি খুন করতে পারবে না?

না, তাকে চিনে গেছে যে তার বউ, খুনিকে যদি আগেই চিনে ফেলে সবাই, সে খুনের মানে কী? খুনই-বা হবে কী করে? খুনি নিজেই তো ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেছে। বুঝতে পারছে ১৯৫-৯৮, তিনশো রকমের বিষ দিয়েও আর সম্ভব নয়, ভিকটিমটা কে?

তা হলে কীভাবে সম্ভব?

তা তো আমি জানি না, আমার জ্ঞানবুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা সব ধরা পড়ে গেছে আমার বউয়ের কাছে। আসলে কী জানেন, কঙ্কনা আমাকে ভালো তো বাসে, আর তাতেই হয়েছে তার বিপদ। আমারও বিপদ। কঙ্কনা আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ওইসব বস্তাপচা রহস্য উপন্যাস আর চলবে না, খুনই হবে না। শেষ পর্যন্ত মাথা ভার করে ঘুরে বেড়াবে খুনি, হয়েছেও ঠিক তাই। এক পাতাও লিখে উঠতে পারছি না। আমার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়েছে ভিকটিম খুঁজে বের করা।

আশ্চর্য! সুদামা অবাক হয়ে দেখছে মানুষটাকে। চোখ দিয়ে আলো গলে পড়ছে যেন। মুখখানিতে জেগে উঠছে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের একটি শিশু। এ যেন হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর অন্ধকার থেকে বের করে আনা কোনো শিলাখণ্ড, তার গায়ে গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে জীবনের ইতিহাস।

অনিলবরণ বলে, বাচ্চাকে খুন তো করাতে পারব না, ইমপসিবল। হ্যাঁ এজেড ম্যান কাউকে যে গ্যাসে ডুবিয়ে, বিষ দিয়ে, গলা টিপে, গুলি করে, লোক লেলিয়ে দিয়ে মারব, তাও হয়ে উঠছে না। রেপ মার্ডার যে করবে আমার খুনি, সে তো খুনের আগেই দেখতে পাচ্ছে ভিকটিমের চাইল্ডহুড, হতভাগ্যের তো বাল্যকাল ছিল। আমার খুনি বিষ তৈরি করতে করতে, বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে, ছুরিতে শান দিতে দিতে,

পরমাণু বোমা, গ্যাস চেম্বার থার্ড ডিগ্রির কথা ভাবতে ভাবতে বিমনা হয়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে যাকে খুন করবে তার শৈশবের কথা, হতভাগ্য তখন বালক বা বালিকা হয়ে যাচ্ছে, আকাশে গ্যাস বেলুন ওড়াচ্ছে, মাঠ দিয়ে দৌড়চ্ছে, হাততালি দিচ্ছে মাদারি খেল দেখে। তারপর সে আরও ছোটো হয়ে যাচ্ছে, আরও ছোটো হয়ে সে হাত-পা নাড়ছে, ফোকলা গালে হাসছে, চোখ ফুটেছে সবে, আলো দেখছে আকাশ দেখছে, পাখির উড়াল দেখছে, খসে পড়া পালক দেখছে — আরও পিছিয়ে তো অন্ধকারে গুটি-সুটি মেরে, মায়ের শরীরের অভ্যন্তরে লুকিয়ে — তারপর ভ্রূণ হয়ে যাচ্ছে। তাকে কী করে খুন করানো যাবে বলুন দেখি। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, একটা বয়সের পিঠে আর একটা বয়স, চাঁদের গায়ে চাঁদ ...।

শুনতে শুনতে সুদামার মুখ-চোখ বদলে যায়। সে কাঁপতে থাকে। বাক্যগুলি আশ্চর্য এক ধ্বনির মতো তার কানের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। বাইরে মেঘ ঘন হয়েছে। সেই মেঘের ওপর থেকে, কোনো এক সীমাহীনতা থেকে ধ্বনিপুঞ্জযেন বিলম্বিত লয়ে প্রবেশ করছে এই পৃথিবীতে, এই শহরে, এই স্থলভূমিতে, ফ্ল্যাটের ভেতরে — বিপ বিপ বিপ! সে দুহাতে মুখ ঢাকে। হতভাগ্য মাতৃগর্ভে, ভ্রূণ হয়ে আছে, শুধু তার প্রাণ জেগেছে মাত্র। তাকে কী করে হত্যা করতে পারে অনিলবরণ। তার কলমের নিব ভেঙে যাচ্ছে।

সুদামা ধরা গলায় বলে, আপনি বলে যান।

বললে আপনি কষ্ট পাবেন, কেন ডেকেছিলেন আমাকে, একটি খুনের কাহিনি শুনতে, নাকি সুহাস বোসের কথা শুনতে?

সুদামা ভেঙে যায়, বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করে, জানেন?

জানব না কেন, ওই ছোঁড়াটা তো বলত, এমনভাবে বলত যেন আমরা যথেষ্ট ভাবতে পারি, কল্পনা করতে পারি, এক ঘন্টা ধরে ফোন করেছে বসের স্ত্রীকে, অত সময় ধরে গল্প করেছে, করছে — এইসব শুনলে, দেখলে সন্দেহ হবে না? ও তো চাইত যেন কৃষ্ণেন্দু ভালো করে টের পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকে — এইভাবে মানুষের প্রেম ভালোবাসা, অনুভূতিকে কেউ হত্যা করে? আমার খুনির চেহারাটা কিন্তু, না থাক, কিছু বলব না। আমি উঠি এবার, আচমকা বাড়ি ফিরলে আমার বউ চমকে যাবে, দেখুন দিদিমণি, খুন করা খুব সোজা, করে দিলেই হল, ভালোবাসা খুব কঠিন, আপনি তা মানেন?

বলতে বলতে চলল অনিলবরণ। ঘরে এখন মেঘের গায়ে মেঘ লেগেছে, ছায়ার ভেতরে ছায়া। একা সুদামা সেই ছায়ার ভিতরে লুকিয়ে আছে। মনে হয় যাচাই করা শেষ। কিন্তু সত্যিই শেষ কি? ভালোবাসা বড়ো কঠিন। তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয় ভালোবাসা। সন্তানের মতো লালন করতে হয় রক্তের ভেতরে। তাকে হারাতে চায় না সে।

কুড়ি

মনে পড়ে কৃষ্ণেন্দু, বৈশাখ থেকে ভালোবাসার কাঙাল হয়েছিলাম আমরা। তারপর যখন মেঘ ঢুকল শহরে, ফ্ল্যাটে আমরা দুজন, সবচেয়ে ভালো ঘরটা আমাদের। খোলা জানালার ওপারে পামট্রির সার, জৈন মন্দির, আকাশ আকাশ, কত দূরে কাছিমের পিঠের মতো ধূসর ব্রিজ, তুমি ভোরবেলায় বর্ষার ভিতরে বেরিয়েই নিয়ে আসতে কদম্ব, "আরও চাই তোমার? আরও, আরও!"

হ্যাঁ চাই-ই তো। ফিসফিস করে বলতাম তোমার কানে কানে, চাই, আরও প্রেম চাই, চাই আরও ভালোবাসা। মেঘ বর্ষা ভেজা বাতাস, ছায়াঘন সকাল, কদম্ব পুষ্পে প্রেম যেন সীমাহীন হয়ে উঠেছিল ওই সাতদিন। মনে পড়ে তা?

এই বালির মাঠ, লবণ হ্রদেও তো গাছ-গাছালি বড়ো হয়ে উঠেছে এখন। ঘাস হয়েছে পিচ ঢাকা পথের ধারে, কাঠগোলাপ ফোটে প্রচুর। কদিন আগেও দেখেছি পরপর কৃষ্ণচূড়ার রং আকাশের গায়ে লেপ্টে আছে। এখানে তো আকাশ অনেক অনেক বেশি উদার। এখানে মেঘ আসে বেশি। একটু পুবে গেলেই যেন মেঘের জন্মভূমি, বাইপাস ধরে গেলে তেমনই মনে হয়। কিন্তু কোথাও কি কদম্ব ফোটে না এদিকে? জানো তুমি কৃষ্ণেন্দু?

মনে মনে জিজ্ঞেস করতে করতেই বেলা গড়ায়, সকাল থেকে দুপুর। সুদামা বিছানায় উপুড় হয়ে শোয়। কদম্বের গন্ধ কী রকম? ভুলেই গেছে সে। আজ হঠাৎ যে কেন বার বার মনে পড়ছে সেই দিনগুলোর কথা। সুদামা উঠে বসে। নাকে যেন কী রকম একটা গন্ধ আসছে। সে চট করে বিছানা থেকে নামল। গ্যাসের। কাঁচা পেট্রোলিয়াম গ্যাসের। বিমলা-বিমলা? কোথায় সে? কখন কাজ করে চলে গেছে। তারপর তো নিজের জন্য চা করল সুদামা। দৌড়ে কিচেনে ঢোকে সে। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সিলিন্ডারের নব পুরো ঘুরিয়ে বন্ধ করা নেই, কিন্তু ওভেনের নব আধাআধি, বন্ধ বা খোলা। হ্যাঁ ছোটো ওভেনটা। সেখান থেকেই অল্প অল্প গ্যাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিচেনে গন্ধটা আরও গভীর। সুদামা পা বাড়িয়ে ঝপ করে দুটো নব বন্ধ করে একজস্ট ফ্যান চালিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে থমথম করে। কখন মনের ভুলে সে গ্যাস খুলে রেখে মেঘ দেখতে চলে গেল ব্যালকনিতে? তা হলে কি সেই যে সেদিন, যেদিন রাজারামপুরে জমির দখল নিয়ে ফিরল তিনজন, এমন হয়েছিল। অনিলবরণকে সন্দেহ করেছিল কেননা সন্দেহ করার তো ওই একজনই ছিল। তবে হতেও তো পারে। তখন অনিলবরণের বউ কঙ্কনা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। লোকটা শুধুই খুনের কথা ভাবত। কে জানে কী হয়েছিল সেদিন। এখন আর পারবে না অনিলবরণ। মনে পড়ে যাবে একটি নারীর শৈশব, তার ভ্রূণাবস্থার কথা। সুদামা বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। কী যে হয়েছে আজ, কৃষ্ণেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই কদম্বের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কদম্ব-শিহরিত হয়ে উঠছে সে।

ব্যালকনিতে দাঁড়াতে পারল না সে বেশি সময়। জানালাগুলো সব খুলে দেবে নাকি। কাঁচা গ্যাসের গন্ধটা গিওে যেন রয়ে গেছে একটু একটু, ভাসছে হয়তো ঘরের আনাচে-কানাচে, লিভিং স্পেসে, অন্য ঘরটিতে,

আর একটি ঘরে। সুদামা ঘুরে ঘুরে জানালা খুলে দিতে থাকে। ফ্ল্যাটের সব জানালা। বেশ লাগছে জানালা খুলতে। মনে হচ্ছে ভোর হয়েছে বোধহয়। ডালিমতলার বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ল সুদামার। ওদিকে চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব খুব। তাই ভরা গ্রীষ্মেও জানালা খুলে ঘুমোতে ভয় হত। ভোর হতে না হতেই সুদামা উঠে সব জানালা ধাক্কা মেরে মেরে খুলত। যেন গুমোট অন্ধকারকে ঠেলে বাইরে পাঠাত। আহ। কী চমৎকার ভিজে বাতাস! সুদামার মুখে বাতাসের গাঢ় ছোঁয়া। কী মেঘ না এসেছে আকাশে।

জানালা সব খুলে সুদামা লিভিং স্পেসে অ্যাকোরিয়ামের পাশে এসে বসে। মাছের জল বদলানো দরকার ছিল। হয়নি। অ্যাকোরিয়ামের আলো জ্বালিয়ে দেয় সে। প্রবাল দ্বীপ, লতাগুল্মের ভেতরে সমুদ্রের অতলে রঙিন মাছেরা নিঃশব্দে ঘোরে। নিশ্চুপ চেয়েই থাকে সুদামা। আচ্ছা সে যদি টের না পেত? গ্যাসে ভরতি হয়ে যেত এই ফ্ল্যাট। একটা সিলিন্ডারে কত গ্যাস ধরে যেন। সে গ্যাসের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকত। সুদামার বুক ধকধক করে। অ্যাকোরিয়ামের কাচের গায়ে কালো বিন্দুর মতো মাছের চোখ তার দিকে স্থির।

সুদামা উঠে এল অ্যাকোরিয়ামের কাছ থেকে। ধীর পায়ে টেলিফোনের কাছে যায়। ডাকবে নাকি কৃষ্ণেন্দুকে। যা হয়েছে তা ভুলে যাক। কৃষ্ণেন্দু, ভুলতে চাইলে কদিনই-বা লাগে ভুলে যেতে। এই তো আমি ভুলে যাচ্ছি সুহাস বোসকে। ভুলেই গেছি। অবাক লাগে তোমার কথা ভুলে ওর কথা ভাবতে আরম্ভ করলাম কীভাবে, কবে, কোন মুহূর্তে? কেন? এই তো আমি এখন আর কষ্ট পাই না নীল কাছে নেই বলে, এই ভ্যাকেশনে আসেনি বলে।

সুদামা দাঁড়িয়েছে ব্যালকনিতে। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। তার মানে বৃষ্টি নেমেছে এই শহরে কোথাও না কোথাও। কৃষ্ণেন্দু বসে আটতলায়। তার ডানদিকে মস্ত জানালা, কাচ দিয়ে ঢাকা। চেয়ারে বসেই কৃষ্ণেন্দু শহর দেখতে পায়। গঙ্গা দেখা যায়, এমনকী খিদিরপুর ডকে দাঁড়ানো জাহাজের মাস্তুলও, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জাল। কৃষ্ণেন্দুর ঘরের জানালা বোধহয় মেঘের প্রলেপে অন্ধকার হয়ে গেছে। এত মেঘ, এখনও কি কদম্ব ফোটেনি?

কৃষ্ণেন্দুর কি মনে আছে সেই কদম্ব-শিহরিত দিনগুলির কথা? ভাগ্যিস সকলে পুরী গেল, আমরা গেলাম না। তিনটে ঘরে কেউ নেই, তবু আমরা দরজা বন্ধ না করে শুতে পারতাম না। মনে হত কেউ যেন আছে। রান্নাঘরে ঢুকে চুম্বন করতে চাইলে তুমি, আমি সরিয়ে দিলাম, কেউ আছে, দৌড়ে চলে এলাম ঘরে। মনে আছে তোমার কৃষ্ণেন্দু? এখন এই দেড় হাজার স্কোয়ার ফুটে কিন্তু কখনওই মনে হয় না কেউ আছে। কেউ না!

সুদামা ঘরে ঢুকে টেলিফোন তুলে ডাক দিল কৃষ্ণেন্দুকে। রিং হয়ে যেতে থাকে। অনেক বাদে ধরল একজন, হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দুই, কোথায় ছিলে তুমি? ফোনটা ধরছেই না কেউ?

কে বলছেন?

আমি গো আমি। সুদামার গলার স্বর গাঢ়, গাঢ়তর হয়ে ওঠে।

আমি মানে কে? কৃষ্ণেন্দু যেন খেলা করছে।

আমিই-ই। টেলিফোনে মেঘের গুরু গুরু শুনতে পায় সুদামা। মেঘ এসে ডাক দিচ্ছে যেন কৃষ্ণেন্দুকে তার জানালার কাচের গায়ে মুখ লাগিয়ে।

কী হল, তোমার ঘরের জানালা কি খুলে রেখেছ? শুনছ তোমার ঘরের বাইরে মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি শুরু হল ওখানে? আমি সুদামা।

কৃষ্ণেন্দু বলল, তোমার গলার স্বর এত ভারি লাগছে যে চেনাই যাচ্ছে না।

তুমি এখনই চলে এসো, এক্ষুণি।

কেন কী হয়েছে?

এসে শুনবে, খুব দরকার, না এলে হবেই না।

কী হয়েছে বলবে তো।

ফোনে বলা যাবে না, তুমি চলে এসো গো, ডাকল সুদামা। মেঘের মতো ডাকল তার স্বামীকে। মেঘ হয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইল প্রিয় পুরুষটিকে। ডাকতে ডাকতে আবার শুনল মেঘের গর্জন, গুরু গরু ধ্বনি। টেলিফোন কোনোক্রমে রেখে দিয়ে গেল জানালার ধারে।

এর পর ঘড়ির কাঁটা সরতে থাকে। বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে আসে। আকাশ ঘোর কালো, শূন্যতায় কোথাও কোথাও গভীর রুপোলি উজ্জ্বলতা, বৃষ্টির বিন্দু মুক্তোর মতো ঝরে পড়তে লাগল নীচে। তার ব্যালকনি গেল ভেসে। সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকে। রাস্তার দিকে চোখ। গাড়ি এল কি? কতটুকু সময় লাগে বাইপাস ধরে আসতে।

ভিজতে ভিজতে ভিজেই গেল সে সম্পূর্ণ। ঘরে এসে শাড়ি-ব্লাউজ বদল করল। কচিপাতার রঙে সাজল। বৃষ্টিতে ধোয়া নতুন পাতার মতো রং ধরল তার গায়ে। ঘর আবছা আঁধারে ছাওয়া। কতকাল বাদে সে ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করল। এমনভাবে ঘড়ি দেখত সেই কতদিন আগে, কৃষ্ণেন্দুর জন্য দাঁড়িয়ে আছে সে হয়তো কোনো পথের মোড়ে, অথবা কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। সে এক লজঝড়ে বাসে চেপে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বাস চলছে ঘড়ির কাঁটার অনেক পিছনে। অথবা কৃষ্ণেন্দু ফেরেনি অফিস

থেকে। সে বেলগাছিয়ার পুরোনো ঘরে বসে উদ্বিগ্ন হয়েই যাচ্ছে। ঘড়িটা ফার্স্ট আছে কিনা খোঁজ নিচ্ছে বড়ো জা-র কাছে।

এতক্ষণ তো কৃষ্ণেন্দুর এসে যাওয়ার কথা। কৃষ্ণেন্দু যদি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তো এত সময় লাগার কথা নয়। তা হলে কি ঘুরে আসছে। ঘুরে আসবে কেন? পথে কি গাড়ি বিগড়োল বৃষ্টির ভেতরে। খোলামেলা ই এম বাইপাসে তো হাওয়া আর মেঘের দাপট অনেক বেশি। কৃষ্ণেন্দু কি ভিজছে, গাড়ির কী হল তা দেখতে বেরিয়ে এসে।

বেলা যায়, সন্ধে হয়। কচিপাতার রং ঢেকে যায় অন্ধকারে। কৃষ্ণেন্দু এল সন্ধের পর, তখন সওয়া সাতটার মতো হবে। সুদামা ঘুম অন্ধকারে গুটিয়ে শুয়েছিল সোফার উপরে। ডোর বেল বাজলে তাকে উঠতে হয়। ঢুকতে ঢুকতে কৃষ্ণেন্দু বলল, বার পাঁচেক চেষ্টা করেছি তারপর, এনগেজড ফোনটা বোধহয় ঠিক করে রাখনি ক্রেডলে? এ কি আলো জ্বালোনি কেন?

আসতে পারলে না? সুদামার মুখ থমথমে।

বললেই আসা যায়, দায়িত্ব নেই? কৃষ্ণেন্দু যেন বিরক্ত।

দায়িত্ব আর কিসের, সে চাকরি তো আর একজন কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। যত কাজ তো ছিল ওইটার জন্যই।

কৃষ্ণেন্দু আলো জ্বালিয়ে সোফায় বসে, অন্ধকার ভূত করে রেখেছ বাড়িটা, কোম্পানি একটা নাকি, পর পর তো আসছে, এবার আসছে কম্পিউটার-সফটওয়্যার নিয়ে এক জাপানি কোম্পানি। ওই ব্যাপারে দিল্লি থেকে ফ্যাক্স এসেছিল। আরও কত অর্গানাইজেশন যে আসছে। বলতে বলতে হাসতে চেষ্টা করে কৃষ্ণেন্দু।

তাতে তোমার কী?

বাহ, প্রাথমিক দায়িত্ব তো আমার, প্রজেক্ট অফিসারকেই তো সব দেখতে হয়।

দায়িত্ব নিয়েই-বা কী হবে, তুমি কিছু গুছোতে পারবে এবার, কমিউনিটির কেউ নেই এখন?

কৃষ্ণেন্দু নিশ্চুপ। সুদামার কথায় আহত হয়েছে, কিন্তু মুখের ভাবে তা প্রকাশ করে না, সে হালকা করে দিতে চায় বিষয়টিকে, ডাকে সুদামাকে, কী জন্য ডেকেছিলে?

সুদামা কিচেনে গিয়ে ঢুকেছে। জবাব দেয় না।

কৃষ্ণেন্দু বলে, যখন তখন ডাকলে হয়, আমি কেরানি, পিয়নের চাকরি করি না, অবশ্য কেরানি পিয়নের চাকরিই সবচেয়ে আরামের, বউ ডাকলেই স্যারকে বলে চলে আসতাম, স্যার বউয়ের জ্বর, বাড়ি যেতে

হবে। স্যার রান্না করতে গিয়ে বউয়ের হাত পুড়ে গেছে। স্যার কাল জামাই ষষ্ঠী, শালির ছেলের মুখে ভাত, বউয়ের হাঁচি হয়েছে ছুটি চাই, থিয়েটারের পাশ পেয়েছি স্যার, দুজনে যাব, বাঁকুড়া যাব ভায়রার বাড়িতে — কৃষ্ণেন্দু হা হা করে হাসতে থাকে, ডাকলেই আসা যায়?

সুদামা জবাব দেয় না। গ্যাসে চায়ের জল চাপায়। কৃষ্ণেন্দু জামা-কাপড় ছাড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে কিচেনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, বলল ফোনটা ঠিক করে রাখবে তো?

রাখলে কী হত?

আমি জানতে পারতাম ব্যাপারটা কী। তুমিও খবর পেতে আসছি না কেন, কথা বলার সময়ই তো দিলে না, লাইন কেটে দিলে।

সুদামা বলল, আমি তো কিছু জিজ্ঞেস করছি না।

জিজ্ঞেস করবে কেন, আমিই বলছি। ফোনটা ঠিক করে রাখবে তো, কখন কী প্রয়োজন পড়ে, যতবার ডায়াল করি, এনগেজড।

যাক, আসনি, মিটে গেছে, চা নাও। গ্যাস বন্ধ করে সুদামা। একবার ওভেনের নব, আর একবার সিলিন্ডারের। বন্ধ করে খোলে, আবার বন্ধ করে। মুখে ভক করে গ্যাসের গন্ধ এসে লাগে। সে বেরিয়ে আসে কিচেন থেকে।

কৃষ্ণেন্দু তার পিছনে আসে, আরে বলবে তো কী হয়েছিল, সারাদিন অত ব্যস্ততা। তার ভেতরে ওই ফোন, রিং ব্যাক করছি, এনগেজড। কী টেনশন বলো দেখি, খামোকা ডাকলে কেন?

সুদামা একটা কথাও বলে না?

একবার ভাবলাম কাউকে পাঠাই, তো অর্ডারলি পিয়ন গোপালও দিন কয় আসছে না, পুরী গেছে নাকি রথ দেখতে, পারেও বটে।

সুদামা ধীরে ধীরে ঘুরে তাকায়, পাঠাতে পারলে না?

না, তেমন কেউ ছিল না।

পাঠাতেই পারতে। সুদামার চোখের তারা জ্বলজ্বল করে ওঠে, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির রেখা, পাঠালে না কেন, সে এসে দেখে যেত তোমার বউ মরল কিনা, নাকি আর একটা সুহাস বোস জুটেছে। হিসহিস করতে থাকে সুদামা, তার জন্য ওয়েট করেছিলে?

কৃষ্ণেন্দু অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, শেষে কেমন কুণ্ঠিত গলায় বলল, আ য়াম স্যরি, সত্যিই দুঃখিত। তবে গোপাল থাকলে নিশ্চয়ই আসত, কিন্তু সে এত কামাই করছে ইদানীং, আমার অর্ডারলি পিয়নের কথা বলছি, নতুন বিয়ে করেছে তো। কিন্তু তোমার কী হয়েছিল?

সে তো অনেক আগের ব্যাপার, এখন শুনে কী করবে?

উদ্বিগ্ন হল কৃষ্ণেন্দু, কী ব্যাপার বলো দেখি, কেউ এসেছিল?

কে আসবে?

আজকাল দিন দুপুরে ফ্ল্যাটগুলোয় যে রকম কাণ্ড ঘটছে, এই তো গত সপ্তাহে নিউ আলিপুরে খুন হয়ে গেল একটা।

খুন তো হইনি, দেখতে পাচ্ছ তো।

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

সুস্থই তো আছি, বেঁচে আছি। বিড়বিড় করে সুদামা।

আর একবার চা খাওয়াবে? কৃষ্ণেন্দু কণ্ঠস্বরে ঘনিষ্ঠতা আনে।

সুদামা কিচেনে যায়। চায়ের সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নেয় ছোটো ওভেনে। গ্যাসে দেশলাই ঠুকতে গিয়ে দ্যাখে নেই। আছে কিন্তু কোথায় রেখেছে? এই একটু আগেই তো চা করল, রাখল কোথায় দেশলাই মনে পড়ছে না। তার এক হাত সিলিন্ডারের নবে নেমে আসছিল। কেন যেন মনে হল অন্য হাতে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি। আচমকা সিলিন্ডারের নব ঘুরিয়ে অন করে দিল। এবার তার হাত ওভেনের নবে। বাঁ হাত ওভেনে, ডান হাতে দেশলাই কাঠি জ্বলছে। যে ওভেনে চায়ের সরঞ্জাম চাপিয়েছে সে, সেই ছোটো ওভেনে তো আগুন কম হয়। সে বড়ো ওভেনেই হাত রেখেছে। ওভেনের নব ঘুরিয়েই দিল সুদামা। দ্রুত গ্যাস বেরোতে থাকে। নাকে কাঁচা গ্যাসের গন্ধ পায় সুদামা। তখন খেয়াল হয় আগুন নেই কাছে। ওভেন বন্ধ করে। কাঁচা গ্যাস ইতিমধ্যেই বাতাসে বাতাসে কিছুটা ছড়িয়েছে। সে নাকে গ্যাসের গন্ধ নিতে থাকে। খারাপ লাগে না। আস্তে আস্তে গন্ধটা মিলিয়েও যায়। কী যে হল সুদামার, মনে হল আবার নাকে নেয় গ্যাসের গন্ধ। হাত বাড়াল ওভেনের দিকে। গ্যাস বেরিয়ে আসতে থাকে। সুদামার হাতে নবটি সম্পূর্ণ ঘুরে আরও যায় বাঁদিকে। অগ্নিশিখা কমিয়ে আনতে চায় যেন সে। দুজনের চায়ে আর কত আগুন লাগবে। ধীরে ধীরে গ্যাস বেরোতে থাকে। সুদামা তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের গন্ধে ডোবে।

গন্ধটা কৃষ্ণেন্দুও পেয়েছে, হয়তো পায়ওনি, পেল কিচেনের মুখে এসে, নাক টেনে বলল, গ্যাস লিক করছে যেন।

সুদামা কিছু বলল না। দেশলাইয়ের জন্য বেরিয়ে এল অপরিসর কিচেন থেকে। তখনই কৃষ্ণেন্দুর খেয়াল হল, ওভেন অন করা, সে খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। চট করে ওভেন অফ করতে ঢুকে পড়ল ভেতরে। চিৎকার করল, এ কী! গ্যাস বেরোচ্ছে, সিলিন্ডার ওভেন দুই-ই খোলা — বলতে বলতে কৃষ্ণেন্দু ওভেনের নবে হাত দিয়ে গ্যাস নির্গমন বন্ধ করতে থাকে। তাতে কয়েক পলের জন্য গ্যাস বেরিয়ে এল আরও অনেকটা বেশি। ওভেন অফ করে কৃষ্ণেন্দু ঝপ করে বেরিয়ে আসে বাইরে, কী করেছ তুমি, গ্যাসে যে ভরতি হয়ে যাচ্ছিল সব। বলতে বলতে কৃষ্ণেন্দু আবার ভেতর ঢুকে একজস্ট ফানের সুইচ অন করে, কিচেনের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সুদামার প্রবেশপথ বন্ধ করে চাপা গলায় ধমকে ওঠে, তুমি এত ভুলো মনের!

সুদামা বলল, কী হয়েছে?

গ্যাস বেরোচ্ছিল, টের পাওনি?

সুদামা হাসে, গন্ধটা বেশ লাগে।

বেশ লাগে মানে?

সুদামা বলে, ভালোই লাগে। সরো।

কৃষ্ণেন্দু সরে না, বলল, তোমাকে নিয়ে তো বিপদ। এর আগে আর একদিন এই রকম হয়েছিল, মনে আছে?

সুদামা বলল, প্রায়ই তো হয়।

হয় মানে?

হয় মানে হয়। সুদামা কিচেনে ঢোকে, কৃষ্ণেন্দুকে সরিয়ে সামনে যায়, বিড়বিড় করে, গন্ধটা বেশ ভালো, কদম ফুল কদম ফুল! বলতে বলতে সে দেশলাই কাঠি ঠুকে ওভেন অন করে আগুন জ্বালায়। গ্যাস জ্বলে ওঠে। নীল শিখা বৃত্তাকারে জ্বলতে থাকে। জ্বলতেই থাকে। ছোটো ওভেন থেকে সসপ্যান এনে সে বড়ো ওভেনে চাপায়। কৃষ্ণেন্দু সরে গেছে কিচেনের বাইরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সুদামা ঘুরল। কৃষ্ণেন্দুর মুখে উদ্বেগ দেখল সুদামা, বলল, তুমি গিয়ে বসো।

গ্যাস লিক করছে না তো?

সুদামা জবাব দেয় না। ঘুরে আবার জ্বলন্ত গ্যাস উনুনের দিকে দৃষ্টি স্থির করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীল শিখার তাপ নিতে থাকে। কৃষ্ণেন্দু সরেনি কিচেনের কাছ থেকে। সুদামা কঠিন হয়, মনে মনে বলে, তবুও মনে পড়েনি!

কৃষ্ণেন্দু বলল, এ ভাবে তুমি গ্যাস জ্বালবে না।

কীভাবে?

কোনোদিন কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

সুদামা বলল, আমার তো গন্ধটা খুউউব ভালো লাগে।

আশ্চর্য! কৃষ্ণেন্দু ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু সরে না তার জায়গা থেকে। বলল, কেন ডেকেছিলে বললে না তো।

এলে জানতে পারতে।

কী জানতাম?

গ্যাসের গন্ধ। বিড়বিড় করে সুদামা।

জল ফুটছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। দূরে মেঘের ডাক। কৃষ্ণেন্দু সরে যায় আস্তে আস্তে। সুদামা অনেকটা সময় নিয়ে চা তৈরি করে। চা এনে টিপয়ে রেখে জানালার সামনে যায়। বন্ধ শার্সির ওপারে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা, বৃষ্টির একটানা শব্দ। সেই শব্দে কান পেতে সুদামা বলল, গ্যাসের গন্ধটা কিন্তু বেশ। আমার তো বাসের পোড়া পেট্রল, ডিজেলের গন্ধও দারুণ লাগে। তোমার লাগে না কৃষ্ণেন্দু? কোনো কোনো বাস যখন খুব ধোঁয়া ছাড়ে, ভরতি করে দেয় চারপাশ, চোখ জ্বলে যায়, কী আরাম, মনে হয় ধোঁয়ার ভিতরে ঢুকে যাই, তোমার মনে হয় না?

কৃষ্ণেন্দু চমকে উঠে দাঁড়ায়। তার হাতের চায়ের কাপ উলটে পড়ল কার্পেটের উপর, গরম চা ভিজিয়ে দিল পাঞ্জাবির কিছুটা, খোলা পায়ের পাতা। জ্বলছে পা। কৃষ্ণেন্দুর খুব রাগ হয়। ক্রোধটা গিয়ে পড়ে সুদামার উপর, যত্ত আবোল-তাবোল কথা, তুমি থামবে?

সুদামা তো থামেই না, ফিসফিস করে, গ্যাসের গন্ধ চমৎকার, ঘরে যখন আরশোলা-টিকটিকি মারার জন্য স্প্রে করা হয়, আমার কিন্তু খুউব ভালো লাগে। তুমি আনবে একটা স্প্রেয়ার? আচ্ছা, কাঁচা কয়লা পোড়ার গন্ধ, কালো ধোঁয়া কেমন লাগে? আমার কী ভালোই না লাগে, তোমার সিগারেটের গ্যাস লাইটারও জ্বালিয়ে দেখেছি, কী চমৎকার গন্ধ বেরোয় গ্যাসের, মনে হয় গ্যাসের ভেতর ঘুমিয়ে থাকি, মরে যাই সুখে, ভোপালে যা হয়েছিল।

কৃষ্ণেন্দুর পা জ্বলছে। সে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে টয়লেটে গিয়ে জলে পা ভেজায়। ভিজে পা নিয়ে ফেরে। কেমন যেন উদভ্রান্ত লাগছে। ধরতে পারছে না কী হয়েছে সুদামার, কেন ডেকেছিল।

তাকে দেখে সুদামা বলল, যাই বলো তুমি, গ্যাসের গন্ধ কী সুন্দর। বর্ষায় যেন তা আরও চমৎকার, ভিজে বাতাস, আকাশে মেঘ, কদম্ব-কদম্ব লাগে না?

কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হল, নাটক করছ কেন? কী হয়েছিল দুপুরে?

হাসে সুদামা, আমি মরে যাচ্ছিলাম ভেবে নাও।

বাজে কথা বোলো না তো, ডেকেছিলে কেন?

সুদামা জবাব দেয় না। সে নাক টানতে থাকে। তার মনে হতে থাকে সে হয়তো ডেকেছিল ওই জন্যই। দুপুরে কী এক ভুলে পুরো ফ্ল্যাট ধীরে ধীরে ভরে উঠল পেট্রোলিয়াম গ্যাসে। হ্যাঁ যেন তাই হয়েছিল। কী চমৎকার গন্ধ। সে ডাকল কৃষ্ণেন্দুকে ওই গন্ধটা টের পাওয়ার জন্য। তাই কী ওই আচ্ছা এই গ্যাস যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেয় মানুষ, মরে যায়! একি সেই ৎসুইক্লোন বেন নামের গ্যাস যা নাৎসিরা ব্যবহার করত গ্যাস চেম্বারে। ফসজিন, মাস্টার্ড গ্যাস, লেথালে গ্যাস, কার্বন মনোক্সাইড, মিক গ্যাস, লিউসাইট — সব গ্যাসের গন্ধ কি একরকম? হাত পারে তা? সব ফুলের গন্ধ কি এক রকম? কিন্তু ফুলের গন্ধ তো সুন্দর। কাঠ গোলাপ-কদম্ব-জুঁই-গন্ধরাজ —!

তোমার কী হয়েছে? কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে এল সুদামার কাছে।

সুদামা তা কচিপাতা রঙের শাড়ির আঁচল ওড়াতে চাইল পাখার হাওয়ায়। উড়ল না। খুবই ঢিমেতালে কোনোক্রমে ঘুরছে পাখা। দেখে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে, কিন্তু থামছে না।

সুদামা বলল, আমি মরে যাচ্ছিলাম, তুমি এলে না। মরছিলাম না হয়তো, কিন্তু সত্যি যদি এমন হত, গ্যাসে ভরতি হয়ে গেছে ঘর, আমি আগুন জ্বালিয়ে দিলাম তার ভেতরে।

কৃষ্ণেন্দু সুদামার কাঁধে হাত দেয়, ওরকম বলে না, আচ্ছা সত্যিই কী হয়েছিল বলবে? ওভাবে টেলিফোন এনগেজড করে?

আমার তো কিছু একটা হয়েছিল, না হলে ডাকলাম কেন?

কিন্তু কী হয়েছিল তা বলবে তো। কৃষ্ণেন্দুর ধৈর্য শেষ সীমানায়।

মনে মনে কথা বলে সুদামা, তুমি আমার কৃষ্ণ সখা। আমি সুদামা। তুমি আমায় পরিপূর্ণ করতে গিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছ।

সুদামা চুপ করে থাকে। সে বলবে না। কেননা একটু আগে তো বলেই দিয়েছে প্রায়। এখন গ্যাসের গন্ধ নিচ্ছে সে কদম্বের পরিবর্তে। গ্যাসের গন্ধে শিহরিত হচ্ছে কদম্বের পরিবর্তে। কদম্বের গন্ধ তো ভুলেই গেছে

সুদামা। ভুলে গেছে বলেই আবার তা যেন টের পেতে চেয়েছিল। তা কি গ্যাসের গন্ধের ভেতরে লুকিয়ে আছে? কৃষ্ণেন্দুর কি একটা কথাও মনে নেই? গত ন-মাসে যা হয়েছে তা তো ভুলছে সুদামা। না ভুললে বাঁচা যাবে না, তাই ভুলতে চাইছে। কৃষ্ণেন্দুও ভুলুক তার কৃতকর্মের কথা। সেই বিস্মরণের জন্যই তো কদম্ব শিহরণ চেয়েছে সুদামা এই বর্ষায়... একটা তোমার, আর একটা তোমার ...।

সুদামার মনে হচ্ছিল সে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ে এই মেঘ বর্ষার রাতে। হাঁটতে হাঁটতে ভিজতে ভিজতে কোথাও, কোনো কদম্ব বনে। আজ দুপুরে সে খুন যয়ে যেতে পারত, যে কোনো দুপুরেই সে খুন হয়ে যেতে পারে। ধর্ষিতা হতে পারত, আজ দুপুরে প্রজ্বলন্ত গ্যাসের ভিতরে দগ্ধ হতে পারত, খুব জ্বরে বিছানায় পড়ে থাকতে পারত, অজ্ঞান হয়ে দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত — ছ-সাত ঘন্টার পড়ে থাকতে পারত। আজ দুপুরে আচমকা চলে আসতে পারত সুহাস বোস নামের সেই প্রেমিক প্রতারক। কানের কাছে আলোর বাজি, হাউই তুবড়ির কথা ধীরে ধীরে বলতে পারত আবার। বলে তাকে কয়েক ঘন্টার জন্য দখল করে ফেলত। সম্পূর্ণ হত প্রতারণা। এসব হয়নি, হতেই পারত। তখন তো সে ফোনেই সাহায্য চাইতে পারত, যদি তার পক্ষে সম্ভব হত। আশ্চর্য! কৃষ্ণেন্দু একটুও বিচলিত হয়নি সারা দুপুর ধরে। পিওন ছুটি না নিলে তাকে খোঁজ নিতে পাঠাত। কেন? কৃষ্ণেন্দু কি ভেবেছিল, যা হয় হোক। তার কি এতটুকুও বুক কাঁপেনি, হৃদপিণ্ড ধকধক করে ওঠেনি। তাহলে কি কৃষ্ণেন্দু এখন তার মৃত্যু চায়? না চাইলেও তার কিছু হলে চঞ্চল হয় না সে তো আর আগের মতো। সুদামা তো হয়। সেই সুহাস বোস যখন তার সঙ্গে গোপনে কথা বলত, তখনো তো হত। ভয় হত তার। নীল আর কৃষ্ণেন্দুর জন্য বিচলিত হত। ঘরের মানুষ বাইরে থাকলে যেমন উদ্বিগ্ন হয় সকলে, তেমনই তো হত।

এল না কেন কৃষ্ণেন্দু? সুদামার মনে পড়ল অনিলবরণের কথা। সে তার বউয়ের মৃত্যু কামনা করত কখনও কখনও, এখন আর করে না। সে বলেছিল আমাদের প্রত্যেকের পিছনে রয়েছে এক একজন খুনি। কৃষ্ণেন্দু কি সেই জন?

ভয় করে সুদামার। না এসে পারল কী করে কৃষ্ণেন্দু? সে কি আশা করেছিল সন্ধ্যেয় ফিরে দেখবে তার বউ আগুনে পুড়ে মরেছে, কিংবা বিষ খেয়েছে। সুদামার শরীর শক্ত হতে থাকে। সে তো এমনিই ডেকেছিল। ভেবেছিল যাচাই করে নেবে প্রেমের কতটুকু এখনও বেঁচে আছে। বাড়ি ফিরলে কৃষ্ণেন্দুকে দুপুরেই পাঠাবে কদম্ব সংগ্রহে। সুহাস বোস লুকিয়ে এসেছিল না কৃষ্ণেন্দুই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল গোপনে, তা জানাও হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। সে তো শুধু খোঁজ পেতে চেয়েছিল প্রেম নিঃশেষ হয়েছে কিনা। যদি একটুও পড়ে থাকে তো সে বাঁচে। বাঁচে এই ভেবে যে সুহাস বোসের আসা সম্পূর্ণই দুর্ঘটনা, আর কিছু নয়। না হলে সব ওলটপালট, তাকে সামনে রেখে পাশা খেলতে বসেছিল যেন তার প্রেমিক স্বামী। পাশায় রাজা

জিতে নেবে। সঞ্চিত সম্পত্তির মতো, চেক বই, ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ের মতো থেকে যাবে রক্তমাংসের নারীটি। আবার যখন প্রয়োজন হবে ব্যবহার করবে।

কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে না। রিমোট কন্ট্রোলে টেলিভিশন চালিয়েছে। জোর করে দিয়েছে শব্দ। উদ্দাম র‍্যাপ মিউজিক আর শরীরী নৃত্যে সব কেঁপে উঠছে। ছায়ার ছবিরা যেন নেমে এসেছে ফ্ল্যাটের ভিতরে।

সুদামা জানালা থেকে সরে এল, চাপা গলায় বলল, গ্যাসের গন্ধটা অনেকটা কদম ফুলের মতো, তাই না! বাদল দিনের কদম ফুল!

কৃষ্ণেন্দু শুনতে পায় না। না শোনার জন্যই যেন টেলিভিশনের উৎকট উল্লাস ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে দিতে চাইছে সে।

সুদামা বলল, মনে নেই তোমার?

কৃষ্ণেন্দু শুনতে পায় না।

সুদামা গ্যাসের গন্ধ পেতে থাকে। একটু একটু করে বাড়ছে গন্ধটা। প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন। কাঁচা গ্যাসের গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে। নির্জন নিঝুম ফ্ল্যাটের ভেতরে সে আর মারণ গ্যাস পাশাপাশি থেকে একে অন্যকে ছুঁয়ে যায় ক্রমাগত। সুদামা টেরও পায় না গ্যাসের গন্ধটি যেন কদম ফুলের সুবাসের মতো হয়ে গেছে। এই রকমই হয়তো হয়েছিল এক সময়। আরও বছর আগে ভোপাল শহরে — তখন গ্যাসটিকে চেনা গিয়েছিল। আরও অনেক বছর আগে ভিয়েতনাম নামে একটি দেশে — তখনও টের পেয়েছিল সব হতভাগ্য। আরও আরও অনেক বছর আগে জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড — এইরকম অনেক অনেক দেশে, বাথ হাউসের ভিতরে স্নান-সুখের স্বপ্নে মদির নগ্ন নারী-পুরুষ টের পেয়েছিল গ্যাসের গন্ধ। যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিল নীল রক্তের মানুষ। বার বার প্রয়োগ-পদ্ধতি একটু একটু করে বদলেছে — বদলাতে হয়েছে অপরাধীকে, অথবা পৃথিবীর নিয়মানুযায়ী তা বদলায়। অপরাধীর আয়ু যেখানে হতভাগ্য নারী-পুরুষের চেয়ে বেশি, সেখানেই এমন হয়। আর অপরাধীর আয়ু তো বাড়ছেই ক্রমাগত। অনিলবরণের কথা মতো হত্যাকারী হত্যার আগে মরে না। সুদামা গ্যাসের গন্ধ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়তে থাকে মেঝের কার্পেটের উপর। অর্ধেক আকাশ, কদম্বের সুবাস এখন ধূসর মরুভূমি, তরল পেট্রোলিয়াম গন্ধ — এ জীবন এমন হয়। হয়েছে।